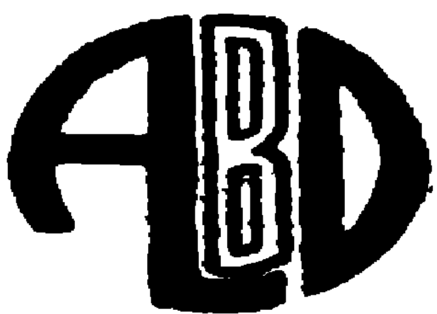
কবিতাসংগ্রহ



অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ১৯৮০

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ ঃ
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থন ঃ
দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৮০, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

সতীনাথ ভাদুড়ীর সম্মানে
এই কবিতাসংগ্রহ
উৎসর্গ করা হল।

উপদেশ

নীলফামারির খামারঘরে
বাহির সূর্য বিরাজ করে।

বাতাস ওঠে, বৃষ্টি নামে,
আকাশ-জোড়া মেঘলা খামে

পত্র আসে সুসমীচীন
'এবার আমায় ছুটি করে দিন।'

হাতের লেখা ঈষৎ ভীত,
কে পাঠাল? অপ্রত্যাশিত

কবিতা যেন, কাব্যাবলী,
শোনো তোমায় গোপনে বলি:

যে-ই পাঠাক, প্রেরক যে হোক,
অতি কাছের বয়স্ক লোক,

ঐ সে-মানুষ, ঐ জলছবি,
অপটুত্বের সর্দারকবি,

আকাশবিহারী, শুধু ছুটি চায়,
হেথা-হোথা যাবে, যেন নিরুপায়

সারাদিনভর বহু তার কাজ,
নীলফামারির বরকন্দাজ,

এখনি ওনাকে বিদায় কর হে,
কর্ম চুরির ঘোর সন্দেহে,

রৌদ্রে পুড়ুক, জলে যাক ভেসে
সাগরের দিকে, পাহাড়ের দেশে।

সূচি

চৈত্রে রচিত কবিতা

উৎসর্গ

দয়িতা, তোমার প্রেম আমাদের সাক্ষ্য মানে নাকি?
সূর্য ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর।
নক্ষত্র ফোটার আগে আমি একা মৃত্তিকার পরিত্যক্ত, বাকি
আঙুর, ফলের ঘ্রাণ, গম, যব, তরল মধু-র

রৌদ্রসমুজ্জ্বল স্নান শেষ করি। এখন আকাশতলে সিন্ধুসমাজের
ভাঙা উতরোল স্বর শোনা যায় গুঞ্জনের মতো—
দয়িতা, তোমার প্রেম অন্ধকারে শুধু প্রবাসের
আরেক সমাজযাত্রা। আমাদেরই বাহুমূলে বিচূর্ণ, আহত

সেই সব সাক্ষ্যগুলি জেগে ওঠে। মনে হল
প্রতিশ্রুত দিন হতে ক্রমাগত, ধীরে ধীরে, গোধূলিনির্ভর
সূর্যের যাত্রার পথ। তবু কেন ষোলো

অথবা সতের—এই খেতের উৎসবশেষে, ফল হাতে, শস্যের বাজারে
আমাদের ডেকেছিলে সাক্ষ্য দিতে? তুমুল, সত্বর,
পরম্পরাহীন সাক্ষ্য সমাপন হতে হতে ক্রমান্বয়ে বাড়ে।

চৈত্রে রচিত কবিতা

১
নিঃসঙ্গ দাঁড়ের শব্দে চলে যায় তিনটি তরণী।

শিরিষের রাজ্য ছিল কূলে কূলে অপ্রতিহত
যেদিন অস্ফুট শব্দে তারা যাবে দূর লোকালয়ে
আমি পাবো অনুপম, জনহীন, উর্বর মৃত্তিকা

তখন অদেখা ঋতু বলে দেবে এই সংসার
দুঃখ বয় কৃষকের। যদিও সফল
প্রতিটি মানুষ জানে তন্দ্রাহীনতায়
কেন বা এসেছো সব নিষ্ফলতা, কবিতা তুমিও,

নাহয় দীর্ঘ দিন কেটেছিল তোমার অপ্রেমে—

তবুও ফোটে না ফুল। বুঝি সূর্য
যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়। বুঝি চিরজাগরূক
আকাশশিখরে আমি ধাতুফলকের শব্দ শুনে—
সূর্যের ঘড়ির দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছি

এখনি বিমুক্ত হবে মেঘে মেঘে বসন্ত-আলোর
নির্ভার কৃপাকণা। সমস্তই ঝরেছিল—ঝরে যাবে—
যদি না আমার
যদি না আমার মৃত্যু ফুটে থাকো অসংখ্য কাঁটায়।

২
আসলে মৃত্যুও নয় প্রাকৃতিক, দৈব অনুরোধ।
যাদের সঙ্কেতে আমি যথাযথ সব কাজ ফেলে
যাবো দূর শূন্যপথে—তারা কেমন বান্ধব বলো
কোন্ ঘড়ি? কোন্ সূর্যরথ?

হয়ত প্রকৃত ঐ নগ্ন জলধারা—
যখন দুপুর কাঁপে গ্রীষ্মের নতুন সাবানে।

ওদের দৈবতা বলে আমি মানি। ওদের ঘড়ির
সমস্ত খঞ্জনপাখা লক্ষবার শোনায় অস্ফুটে—
আমার বন্ধু কি তুমি?
আমি কি তোমার?

কেন যে এখনো নই প্রাকৃতিক দুঃখজটাজাল?
আমার নিয়তি তুমি ঈর্ষা করো—আমার স্মরণে
যাও দূর তীর্থপথে, ভুল পথে—রক্তিম কাঁটায়
নিজেকে বিক্ষত করো। রোমিও—রোমিও—

কেন শূন্যে মেঘলীন কম্পিত চাদর উড়ে গেলে-
অনির্বাণ, স্থির নাটকের যারা ছিল চারিত্রিক,
নেপথ্যে কুশল, প্রেম চেয়েছিল, দুঃখ,
তারা একে একে অম্লান ঝরে যায়?

তবে কি আমিও নই তেমন প্রেমিকা?

৩
বহুদিন ছুঁয়ে যায় বর্তুল, বিস্মৃত পৃথিবী
লাটিম সূর্যের তাপে নানা দেশ—বিপুল শূন্যতা—
সে যেন বিচিত্র আলো দিয়েছিল আমার ঘরের
গবাক্ষবিহীন কোনো অন্ধকারে—একদিন—শুধু একদিন।

তখন, প্রবল মুহূর্তে আমি জেনেছি অনেক—
সমুদ্র কেমন হয়। কাকে বলে দুর্নিরীক্ষ্য তরু।
আমি কেন রুগ্ন হই। তুমি দূর স্খলিত তারার
কেন বা সমাধি গড়ো বনে বনে।

অথচ আঁধারে ফিরি আমি ক্লান্ত প্রদর্শক আলো,
যারা আসে সহচর রক্ত-লাল, গমের সবুজ,
তারা কেউ ধূর্ত নয়—দয়াশীল, বিনীত ভাষায়
বলে, 'তুমি ভুলে যাও সমস্ত জ্ঞানের ভার—সমস্ত অক্ষর।'

৪

এখনি বৃষ্টির পর আমি পাবো জ্যোৎস্না-ভালোবাসা।
কেননা মেনেছি আমি শোকাকুল তুমিও বন্দিনী
অজেয় শকটে তার। কোনো কোনো রথ
একা যায় ভ্রান্ত পথে—অন্ধকারে—চালকবিহীন—

যেখানে সুদীর্ঘ রাত ওড়ে নীল গন্ধের রুমালে
যেখানে জলের মতো পরিসর, অফুরন্ত বায়ু
ধুয়ে দেয় বনস্থলী, বালুতট—দীর্ণ হাহাকার

তুলেছিলে শূন্যতায় পাহাড়ের উর্বর মৃত্তিকা, তুমি দুঃখ, তুমি প্রেম,
শোনোনি সতর্কবাণী। যেন স্রোত সহসা পাথরে
রুদ্ধ হল। এবং স্খলিত
বহু রথ, পদাতিক দেখে আমি মেনেছি এখন

প্রতিটি বৃষ্টির পর ছিন্ন হও তুমি, ভালোবাসা।

৫

পৃথিবীর সব তরু প্রতিচ্ছায়া খুলে দেয় বসন্তের দিনে।
যখনি তোমাকে ডাকে 'এসো এসো বিদেহ কলুষ',
কেন যে লুণ্ঠিত, নীল পরিধান খুলে তুমি
বালিকার স্পষ্টতায় কাঁদো—
বসন্তই জানে।

তবুও আমার স্বপ্ন দুপুরের—ঘুমন্ত রাতের—
প্রবল নদীর জলে ধরে রাখে নীল যবনিকা—
সে তোমার পরিচ্ছদ, অন্তরাল, হয়ত বা
যেটুকু রহস্য আমি ভালোবাসি বালিকার কিশোর শরীরে—

এখন বিনিদ্র রাতে পুড়ে যায় সব মোমবাতি!
এবং অলেখা গান নিষ্ফলতা বয়েছিল কত দীর্ঘ দিন
সে নয় প্রেমের দুঃখ? তবু সতর্কতা
ভেঙে ফেলে সুন্দরের প্রিয় পুষ্পাধার
বলেছিল, 'এই প্রেম অন্তিমের, সমস্ত ফুলের'

৬

যেন দূর অদেখা বিদ্যুতে তুমি পুড়ে যাও
তুমি সুন্দর নিয়তি
যেন জল, ঝোড়ো রাতে জ্বলে একা বজ্রাহত তরু
তুমি সুন্দর নিয়তি
মৃতেরা নিষ্পাপ থাকে। কারা নামে—অচ্ছোদসরসী-
তুমি বিরূপ নিয়তি
রাখো দূর মেঘপটে যত ক্রোধ, অকাম কামনা
তুমি সুন্দর নিয়তি
ফিরে দাও দীর্ঘ ঝড় মদিরায় প্রাচীন কুঞ্জের
তুমি সুন্দর নিয়তি।

গত পূর্ণিমায়

জ্যোৎস্না এখানে নেই। তাকে কাল হাই-ইস্কুলের
পোড়ো বারান্দার পাশে দেখা গেছে। সে তার পুরনো
আধোনীল শাড়িটি বিছিয়ে ঐখানে শুয়েছিল।

'তুমি কোন্ ঘর ছেড়ে এলে? কোন দুঃখে? কোথায় চলেছ?'
কে যেন শুধালো তাকে। তার অস্ফুট উত্তর
হাজার ডানার শব্দে, নামতা-পড়ার শব্দে, নিরুত্তরে
চাপা পড়ে গেল—

ইস্কুলের বুড়ো ঘন্টি পাগল-ঘন্টির মতো বারবার আমাকে জানালো
'এখন সময় নয়। এত আগে কেউ কি এসেছে?'

প্রান্তর থেকে

রূপনগরেতে চলো।
সে-দেশে ধুলোয় সবার নিভৃত নাম লেখা আছে।
যে-নামে তোমায় পুরনো বন্ধুরা চেনে এখনি বাতাস
সেই নাম ডেকে গেল। রূপনগরের পাঁচিলে না হয় বোসো
কিছুক্ষণ—দুটি পায়রার পাশাপাশি। গতবার এত বৃষ্টি হল,

এত রক্তপাত—আমাদের ক্রমশ বয়স হল তারই সঙ্গে।
আমাদের প্রতিটি বসন্ত আজ আধোলীন, সূর্যে মাথা রেখে
স্বপ্নরত। গতবার বনভোজনের শেষে অগণ্য পালক পড়েছিল চতুর্দিকে।
'তোমাদের মজার গল্প এক বলি শোনো'—কে যেন বললো ডেকে,
কোন গল্প, কাকে নিয়ে, সমস্ত ভুলেছি। শুধু শালবনে—দূরে—
জলার মতন এক স্বচ্ছ জল অন্তিম গোধূলি নিয়ে
আলো হয়ে ছিল—

রূপনগরের পাঁচিলে না হয় বোসো কিছুক্ষণ—অন্যমনে।

ভোর সাড়ে ছ-টা

এক একদিন কলকাতা অনুপম উড়ন্ত মেঘের
পালিতা পাখির মতো উড়ে যায়।
যারা ফিরবে বলেছিলে আজ, কাল অথবা আগামী
যে-কোনো সপ্তাহে, মাসে, বছরের ক্লান্ত শেষ দিকে—
তারা মিথ্যে বলেছিলে।

কলকাতা এক একদিন তোমাদের পুরনো প্রলাপে, লঘু
কিশোর মিথ্যেয় ভরে ওঠে—

এখনি সমস্ত নৌকো ভোরবেলা গঙ্গায়
দু'তীরের পাশাপাশি অন্য শত চোখের কুয়াশা
কতো তুচ্ছ জেনে যাবে—

দিন আরো স্পষ্ট হলে যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী।

হে প্রিয়

তোমার গান প্রিয়তমা ধ্বনিবিহীন।
তোমার গান প্রিয়তমা প্রতিধ্বনি।
কোথায় ভাঙে পুরুষোত্তম দুর্গচূড়া
সন্ধানীদের সোনার খনি।

এখনো ঘোরে পরিশ্রম মৌমাছির।
এখনো জ্বলে দুপুরবেলা বসন্তে।
আমি কি যাবো তৃষ্ণাতুর যাত্রীদলে
দূরের ঐ দগ্ধবনদিগন্তে
যেখানে সব প্রতিধ্বনি ধ্বনিবিহীন।

আসলে বহু দীপ্ত ঋতু আমায় গড়ে।
আমি তাদের প্রহরী ব'লে—বকুল
ঝরায় শত জীর্ণ পাতা, ফুলগুলি,
যেন তাদের প্রেমাবরণ, উড়ন্তচুল

ছায়াতরুর তন্ময়তা ভঙ্গ করে।
ধ্বনিজালের দুঃখে তুমি রাত্রিদিন
এখনো কাঁপো অস্ফুটিত হৃদয়ভার
আপন গানে কে রয় বলো ধ্বনিবিহীন।

চন্দ্রাতপ

বিরহনাটকে গ্রীস আমার চোখের কাছে সমুজ্জ্বল তারা।
আমি এই পৃথিবীকে রক্তমাংসের ধ্রুব বাসনা জেনেছি
যে-দর্পণে সন্ধ্যাবেলা প্রেয়সীর বিকীর্ণ শরীর
জ্বলে ওঠে—অন্য পিঠে ব্যাপ্ত তার রক্তাক্ত পারদ।

বিরহনাটকে গ্রীস আমার চোখের কাছে সমুজ্জ্বল তারা।
রজতফেনার মতো দিকে দিকে সমুদ্র-প্রসারে
হয়ত পর্বতচূড়া ধরে আছে কোনো বাজপাখি
তরঙ্গের আন্দোলন—অনিকাম দু'টি মুক্ত ডানা।

বিরহনাটকে গ্রীস আমার চোখের কাছে সমুজ্জ্বল তারা।
হে পৃথিবী, তবুও জননী তুমি। বারংবার দয়িতের রূপে
যখন দুয়ার হতে প্রত্যাহত ফিরে যাবো—শুধু বাজপাখি
তমসার পরপারে খুঁজে পাবে রক্ত, মাংস, চুল।

শিল্পীদলে

অনন্ত জলের নীচে প্রস্তুতি আমারও, প্রেমিকা।

তুমি উন্মোচিত হও। তুমি জাগো আন্দোলিত বঙ্কিম সাঁতারে।
তরঙ্গশিলায় দূর শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ যেন লেগে আছে।
ফোটে ফুল বসন্তের—আশ্বিনের প্রথম শেফালি—
তুমি উন্মোচিত হও—তুমি বলো জলের গভীরে

যারা থাকে নিরুত্তাপ, চিরদিন—রক্তের হাঙরে
তারা দেয় ব্যভিচার, গুপ্ত রোগ, যত প্রেম।
আমি তবু অপর্যাপ্ত সাগরের বিপুল বয়ায়
ভেসে উঠি চিরন্তন। গৃহপালিতকে এত কী করুণা তুমি করেছিলে?

অনন্ত জলের নীচে ডুবে যায় ওদের শরীর।

এই বেলাভূমি

সুন্দরী আধেকলীনা, তুমি দেহভার
কিছু রাখো দুপুরের হলুদ বেলায়
কিছু রাখো অন্ধকার জলের গভীর দেশে—প্রমত্ত আশার
লক্ষ ঢেউ মুছে যায় একাকার সাগরে, সকালে,

অথচ তোমার কোলে অগ্রন্থির মালা ছেঁড়ে এখনো বাতাস।
এখনো দুর্লভ যত সংগ্রহে ভরে আছে পর্বত তোমার।
প্রাকৃত জনের মতো আমি ভাবি সহসা নিশ্বাস
তোমারই বুকের কাছে বেজেছিল, সহসা মর্মরে

দিগন্তের তালবন যেন দূর পূর্ণিমাসন্ধ্যার
অন্তরালে তোমাকেও নিয়ে যায়—তুমি নামো
আসন্ন জোয়ারে, প্রথম সাগরস্নানে। অতি দীর্ঘ বালুতট
শূন্য পড়ে থাকে—যদি না ওদের সম্রাট ফিরে আসে
গুপ্তচর, অভিশাপ, যদি না সভ্যতা।

জন্মদিন

মায়াবী লণ্ঠন ঘিরে বহু কাচ অতসীর মেলা।
হয়ত ধুলোর রেখা মুছে দিলে, তুমি ভাবো,
কোনো ভ্রান্ত কবি একদা জানাবে ঐ প্রত্যেক অতসী
মিথ্যে নয়।

অতসী দুর্বল। তবু লোক-অপবাদে
পথের দুপাশে কেন চেঁচায় স্বৈরিণী?
আমি নিস্পৃহ চলে যাই। অন্য সকলেও।
কোনো ভ্রান্ত কবি দূর থেকে দ্যাখে সব।

অগ্নিরেখা আমাদের সমর্পিত কোল ঘেঁষে।
তুমি উৎসব ফুরোলে ঐ কাচপাত্র ধুয়ে রাখো।
আবর্জনা অতীতের বলে নাকি, 'হায় রে মায়াবী—
লণ্ঠন জ্বালালে কেন? সকলেই অন্য নিমন্ত্রণে চলে গেছে।'

চতুর্দশী

তোমার বয়েস আমি ভালোবাসি।
তুমি কোন পাথরে দাঁড়াও মনে থাকে।
যত গান প্রিয় বলো আমি লিখে রাখি মলিন খাতায়।
প্রতিদিন পুরনো সূর্যের রথ ভেঙে পড়ে সন্ধেবেলা।
দূরে—উপকূলে—
ক্রীড়ারত তোমার বয়সী—ওরা কেমন প্রেমিক?

কুহক

ওরা চলে যায়—ঋতু, বসন্ত ফুলের শোভা, অন্তিম তুষার।
রাজহংসটির শেষ অস্থিরতা উড়ে যায় কমল-সাগরে—
এখনো মর্ত্যের থেকে নীলাঞ্জন একটি সোনার রেখা
যাকে দেবে বলেছিলে সে-ও দ্যাখো অমর্ত্য ফুলের
সৌরভে মগ্ন আছে। যারা চলে যায় তারা ব্যবহৃত, পুরনো সংসার।

শিউলিবনের তলে স্ফুট চলাচল সব আমাদের—হে পথিক, আমাদের
সহসা তোমার গায়ে উড়ন্ত নিশ্বাস লাগে তা-ও আমাদের
তুমি ভুলে যাও ঋতু, বসন্ত ফুলের শোভা, অন্তিম তুষার,
বৎসল পুরুষ তুমি। তুমি শ্বেতহংসটির চঞ্চলতা বুকে নাও
বুঝি জানো কোথায় তোমার মুক্তি। অস্তভূমি। কোথায় সাগর।

ব্যাকুল, উন্মাদ রক্ত কাকে দেব? তিনি কি সম্রাট?
অথবা ঈশ্বর কোনো—ঈশ্বরীর? তেঁতুলবীথির মগ্নগ্রাম আমাদের,
হে পথিক। ঐ পুষ্করিণী দ্যাখো যাতে তুমি অমর্ত্য ফুলের
আকাঙ্ক্ষায় ডুবেছিলে। তবু কি জেনেছ পুরনো স্মৃতির ভার
দুর্বল পাষাণ—নক্ষত্র-ছায়ায় কাঁপে, জোনাকির কল্পিত গাথায়?

আশ্বিন, ১৩৬৫

তুমি স্মৃতি, অপূর্ণ বাসর
ভীত, ত্রস্ত বনতল—ভোরবেলা কাঁপো
বাতাসে, আলোয়—যেন করবীর সকল শাখার
মৃত্যু লাগে তোমার মরণে।

গুপ্তচর

স্নিগ্ধ তুমি, প্রথম রাত্রির চাঁদ অস্তে ভ্রমাকুল।

তুমি আরেক সিন্ধুর পারে জেগে ওঠো, আরেক নগরে
হলুদ পূর্ণিমা কাঁপে, ম্লান প্রবাসের জল
ছুঁয়ে যায় নৌকোগুলি, আধোজাগা, অর্ধেক ডুবন্ত,
আজো দীর্ঘ মাস্তুলের হাহাকারে শালবন জেগে ওঠে—
যেন লাগে পূর্ণিমা তোমার

কম্পিত ঘুমের পাশে। ওরা যায় দেশান্তরী। কোথায় আমার দেশ?
কোন ঘরে? কোন প্রিয়জনে? আমি কি সাইরেন, শব্দ?
অন্ধকার ঝোড়ো রাত্রে ছুঁয়ে যাই মর্মতল?

জন্মভূমি—কোথায় কোথায় ফোটে অগ্নিরেখা, সিন্ধুর কামান!

২
কখন মোরগ ডাকবে—আমি ঘরে ফিরে যাবো।

কান্তারে সমস্ত রাত শস্য-পাহারার ছলে জেগে আছি
এবং অলৌকিক জ্যোৎস্নায় এই রণভূমি ফসলে, সংগ্রামে, গানে
ভরে গেছে—বুঝি মনে হল
সুদূর আলোর পথে তোমাদের অপস্রিয়মাণ ছায়া
আবার উঠেছে জেগে। দীপ্ত নখর মেলে, হা হা শব্দে,
রক্তের তৃষ্ণায় যারা উড়ছ—বুঝি ভেবেছ সহসা
প্রান্তরে একাকী আমি বধ্য আছি। বুঝি জেনেছ গোপনে
এ-কাহিনী সকালের রৌদ্রের পালক দিয়ে ঢাকা যাবে।

পরিলিখন

যেখানে ঝরে চিরতুষার সৌগতের সমাধিমন্দিরে
ঘন নিবিড় মেঘের মতো হংসদল চলেছ সেইখানে
কাননময় উন্মীলিতা ফুলে ফুলে আলোর সমারোহ

হে ফুলদল, তোমরা আজো কুয়োতলার রক্তে-ভেজা মাটি
ভরে রেখেছ আনন্দিত। আমি ভিন্ন জলের উচ্ছ্বাসে
সমব্যাকুল ফিরে এলাম। শ্বেতপাথরের কঠিন মায়াডোরে
একটি পাখি বেঁধেছ তুমি, সৌগত—চিরতুষার—চিরতুষার।

প্রবাসিনী

প্রবাসিনী, তুমি আজ এমন দরিদ্র এক প্রবাসে এসেছ!
আমার ঘরের পাশে, এক রৌদ্রে, একই আকাঙ্ক্ষায়—
আমি সারাদিন তোমাকে রুগ্নের মতো অনৃতভাষণে
আপাতত স্বাস্থ্যে রাখি। আমি বলি—'ও শুধু ডানার শব্দ

—যাত্রী যায় লোকান্তরে।' অথচ বাগান এদিকে নির্মূল হল।
সারারাত দুঃস্বপ্নে আমার অসংখ্য শোকের ডাল ওরা কেটে ফ্যালে।

অবেলায় এখন আমার কান্ত রৌদ্রে যেন বেলা যায়।
একদিন দৈর্ঘ্য দেখে, ছায়া দেখে তুমিও গুনেছ ঋতু—প্রথম শীতের শস্য-
আগন্তুক বসন্তপূর্ণিমা ক'লক্ষ কোকিলে ভরে।

প্রবাসিনী, এখন দম্ভের মতো আমার বিশ্বাসে সকলই শোনায় ভালো,
আজো দীপ্ত, উজ্জ্বল, অমল—যখন জলের কাছে তুমি যাও,
আমি যাই, যতক্ষণ জল ধরে প্রতিচ্ছবি স্মরণের—স্মরণাতীতের।

রাজার মতো রাজা

রাজার মতো রাজা
ভিনগ্রামেতে চলে গেলেন। কালোমহিষ বাহন।
পরনে সেই পরিচ্ছদ
যা আমরা জন্মকালে পরে থাকি।

মস্ত বড়ো চাষের ঢালু জমি।
অন্যদিকে নীল পাহাড়, বাদাম ক্ষেত—রাজ্যে তাঁর
একটি নদী, কয়েক ঘর
প্রজা এবং আত্মজন।

সন্ধেবেলা বুনোশুয়োর আগুনে ঝলসায়।
রাজা প্রকাণ্ড এই মহাদেশের গল্প বলেন
এবং কোন্ স্রোতস্বতী পেরিয়ে গেলে প্রতি মানুষ
আকাশে যত নতুন তারা ওঠে—

দিন-ফুরানো কাঠের সাঁকো নানান লোকে ভারী।
রাজার মতো রাজা
কালোমহিষ এ-পারে রেখে ঐ পারেতে গেলেন।

নবধারাজলে

১

মন মানে না বৃষ্টি হলো এত
সমস্ত রাত ডুবো-নদীর পারে
আমি তোমার স্বপ্নে-পাওয়া আঙুল
স্পর্শ করি জলের অধিকারে।

এখন এক ঢেউ দোলানো ফুলে
ভাবনাহীন বৃন্ত ঘিরে বাখে—
স্রোতের মতো স্রোতস্বিনী তুমি
যা-কিছু টানো প্রবল দুর্বিপাকে

তাদের জয় শঙ্কাহীন এত,
মন মানে না সহজ কোনো জলে
চিরদিনের নদী চলুক, পাখি।
একটি নৌকো পারাপারের ছলে

স্পর্শ করে অন্য নানা ফুল
অন্য দেশ, অন্য কোনো রাজার,
তোমার গ্রামে, রেলব্রিজের তলে,
ভোরবেলার রৌদ্রে বসে বাজার।

২

সেদিন ঝড়ের রাতে তুমি চাঁদ ডুবন্ত, একাকী
দেখেছিলে লক্ষ ঢেউ জলে ভাঙে প্রতিচ্ছায়া—মেঘজটাজাল
খুলে যায় অন্যমনে। এত অলৌকিক অন্ধকার ঘিরেছিল চতুর্দিকে,
এত অলৌকিক বাতাসে মত্ততা যেন বলে গেল 'কে খোলে কপাট?
কে যায় বনের যাত্রী—ঝটিকায়—তুমি কোথাকার।'
আমি তখনও নির্বাক থাকি। চন্দ্রাহত—তোমার পূর্ণিমা
কখন দিগন্তে ডোবে আমি ততদিনে স্পষ্ট জেনে গেছি।

৩

এখনি যাবে কি তুমি? ফিরে এল বৃষ্টি দুপুরের
মাঠের ওপার থেকে, দু'টি শান্ত গৃহকোণে কিছু জল দিয়ে—
উত্তরে, ধানের ক্ষেতে, যেখানে অদেখা
গতরাত্রির সব ভালোবাসাবাসি—জলে মিশে আছে।
যেখানেই থাকো তুমি একটি পথের রেখা ধ্রুব, কূট, নিশ্চিত শ্রাবণে
তোমাকে সহজ কোনো আলে আলে নিয়ে যায়, যখন সহসা
দু'ধারে চঞ্চল স্রোত, জল, নদী, কম্পিত ডাহুক,
একটি মুহূর্তে শুধু তুলে নেয় প্রতিচ্ছবি, তোমার ভঙ্গিমা—
আবার সহজে ভাঙে—যেন খেলা কেবলই মেঘের
প্লাবিত ধানের ক্ষেতে বারবার বৃষ্টি দিয়ে যাওয়া—যেন মত্ত
কখনো আঙুল অন্যের করতলে বিঁধেছিল—অন্য করতল

রাখে না প্রেমের ভার, সে প্রাচীন, সে চিরন্তন!
অথচ বর্ষা আসে। আদিগন্ত একাকী মাঠের দৈর্ঘ্য কত—
ভয় কত—এখনি যাবে কি তুমি?

৪

অমন কালো মেঘের দিনে জন্মেছিলেন আমার প্রিয় কবি।
অন্য সকল দিনের মত বৃষ্টি নামল—রোদ উঠল কত
উনি আমায় রক্তে লীন দেবায়তন দেখিয়েছিলেন।

যদিও ঐ সিংহাসনে কুয়াশাময় সম্রাটের অস্থিরতা ছিল,
তবু আমি ক্ষমাই চেয়েছিলাম—
যা আমাকে ধন্য করে, প্রিয় কবিকে, মহিষটিকে।

নিষ্করুণ মাতাল হাতে ছড়িয়ে থাকা শত বধ্যভূমি।
ভীষণ শব্দে বেজে উঠল মহিষটির দীপ্ত গলা 'ক্ষমা করুন',
'ক্ষমা করুন' আমি শান্ত, অনুচ্চারিত শব্দে বলেছিলাম।

স্তম্ভের গান

১

পাহাড়ে মুক্তর বাড়ি। গম্ভীর অনন্ত শব্দে মুক্ত সারা রাত
আমাকে দুয়ারে ডাকে। সে কী চায় আমার কাছে?
দীপ্ত ধনু? কমণ্ডলু? অথবা বজ্রের
শাখাপ্রশাখায় দূরে জ্বলে ওঠা পর্বতশিখর কোনো?

আমি তার নির্মম পায়ের তলে মাথা রেখে বলি,
'তুমি আমাদের আদিম বসুধা, মাতা
নক্ষত্রে তোমার মুক্তি, প্রতিটি তৃণের জন্মের আগে
তুমি উন্মুক্ত প্রান্তর কোনো। তাহলে ঝর্নার ধ্বনি

তোমাতেই স্তব্ধ হোক—নগর ধ্বংসের 'পরে
আমি অনাদি, অনন্ত কাল, রৌদ্রে, তাপে, বৃষ্টিধারাজলে
এমনই অমৃত থাকি—

পাহাড়ে রিক্তর বাড়ি। আমি যদিও ঝর্না নই, স্রোত নই,
তবু সারা রাত সে কেন আমাকে ডাকে?
সে কী চায় আমার কাছে?

২

প্রহবী—ও প্রহরী—এই কি তোমার স্বর ধ্বনিজাল—প্রতিধ্বনিজাল
পাতায় শিশিরবিন্দু মুছে যায়—মুছে যায় যত পলাতক
কিশোরের ভীরু কণ্ঠ, সমস্ত দুপুর ভরে শরবন ক্ষয়ে যায়,
আলো, তাপ, রক্ত, মাটি, বনের আগুন,

তবু কি তোমার স্বর ডুবোজলে, ফাঁসিকাঠে,
প্রবল বিদ্যুৎশব্দে ধসে যাওয়া অরণ্যে পাখির—

এই কি তোমার গান, নিঃশব্দ, ইশারাময়, গ্রীষ্মরজনীর শেষে
হঠাৎ দিগন্ত পারে উঠে আসা ক্লান্ত চাঁদে
আমি যত গান উৎসারিত করে দিই—
সবই কি তোমার?

৩

তাই আমার কল্পনা নেই। তবু দূত আমাকে গোপনে
পাঠাও দুরূহ বার্তা। বোঝো, পড়ো—আমাকে বলেছ
বলেছ সৃষ্টির আগে স্বপ্ন ছিল পরিদৃশ্যমান।
যেদিন ছিল না তারা, ঘাস, ফুল, পতঙ্গ, প্রকৃতি,
যেদিন ছিল না ঢেউ, উপকূল, নক্ষত্র, মাস্তুল,

সমস্ত উদাস স্বপ্নে উড়ে যেতে হাওয়ায়—আকাশে—
নক্ষত্র ছিল না তবু নক্ষত্রের স্বপ্ন ছিল মনে
ছিল না মানুষ তবু কণ্ঠ তার নিয়ত আশায়
বলেছিল, 'রুদ্ধ করো আমাদের—রুদ্ধ করো প্রেমে কি বিরহে'

তুমিই আমার তন্দ্রা। জাগরণ ভালোবাসে অনুবর্তিতার
যে-সব হরিণ কাল কুয়াশালুপ্তির পথে ছুটেছিল।

৪

যত প্রতিচ্ছবি আজ মূল তরুটির দিকে দৃষ্টি তুলে আছে

৫

এবং নগরপ্রান্তে ভাঙা দেয়ালের 'পরে আশ্রয়জটিল
হৃতশূন্যতায় তুমি কোন্ অন্ধ কবি প্রাচীনতার গান গাইছ?
অথবা ধুলোর 'পরে নত হয়ে শুয়েছ কোথাও
—যেখানে অস্থিমালা, করোটি, কঙ্কাল, যেখানে তোমার বার্তা
ধ্বনিপ্রতিধ্বনিময় নিদারুণ খেলায় মেতেছে।

এসো আমাদের দীর্ঘ তাপে, এসো সূর্যাস্তবেলায়।
এসো পাহাড়ে ঝর্নার পথে, রিক্ত পথে, রিক্তের বাড়ির
দুয়ারে দাঁড়াও এসে।

আবিষ্কার

১

অসংখ্য চুমোয় আমি একটিই তনু শুধু জীবনে ফোটাব।

কেননা তোমার দৃষ্টি উদ্ভিদের। চেতনা তোমার
মহাবনস্পতিতলে এক ম্লান বিপুল গ্রন্থের
হলুদ অধীর পাতা—এখানে সমস্তবেলা অনর্থে কাটানো গেল।

এখন মাঠের 'পরে নত হয়ে তোমাদের চলাচল দেখি।
তোমরা মোরগ কোনো শিমুলতুলায় আজ ছেয়ে আছ—
না হয় মানুষ কোনো দুপুরে হাটের দিকে চলেছ কোথাও—
সূর্য এক অদ্ভুত উচ্চতা থেকে আলো দেয় তোমাদের মুখে।

এখন আমার কাছে প্রত্যেকেই নবআবিষ্কৃত।
কেননা বনের তলে আমার সমস্ত পাঠ আজই শেষ হল।
এখানে প্রতিটি গাছ, ডালপালা অথবা বল্কল

সবই যেন লাইব্রেরি, থামের আড়াল রেখে প্রসারিত ভূমি—
যতদূর দৃষ্টি যায়—যতদূর হলুদ, বাদামী পাতা
চৈত্রের বাতাস লেগে ছুটোছুটি করে

তোমাকে এখন নিষ্পত্র, বিরল দেখি!

২

সমস্ত উঠোন জুড়ে রৌদ্র আজ পড়ে আছে অনুজ্জ্বল নখের মতন।
অনেক মালিন্য তার, দীর্ঘ পথের ক্লেদ। আমিও একদা
অমন বর্ষার রাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবো বলে আরেক গ্রামের
ভগ্ন নদীর কূলে পৌঁছালাম। 'তুমি পথচারিণীর ক্লান্তি নিয়ে এসেছো কি'

যখনই বলেছি—সেই খণ্ড, নিষ্প্রভ রোদ্দুর
আরেক প্রাঙ্গণ 'পরে সরে গেল। সেই থেকে প্রতিবেশী
রাত্রিদিন আমারই বিষয় হয়ে আছে। আমি তার
শান্তি দেখি জানালায়—অলক্ষ্য লতার মতো যা-কিছু নতুন

ফুলে নত, বেগবান অথবা শিথিল—
যা-কিছু পার্থিব তার, নৈসর্গিক, স্বপ্নবিজড়িত,
সমস্ত দেখার শেষে গতকাল, অন্ধকারে, আমি কৌতূহলী
প্রতিবেশিনীর দুয়ারে গিয়েছি যেন—আমার পায়ের কাছে মাথা রেখে

নতজানু অস্ফুট আলোয় সে বলেছে, 'এ সকলই তোমার বিচার।'

৩
যে-কোনো মৃণালে তারা ফুটে থাকে, যে-কোনো পুকুরে।
প্রথম মৌমাছিদলে তারা ত্রস্ত হল—নত হল।
তখন ভোরের বেলা।
কুয়াশায়, মলিন দীঘির প্রান্তে তুমি বসেছিলে।

হায় রূপ, হায় কান্তি, অকূল পদ্মের জালে বাঁধা পড়ো তুমিও তেমনই,
প্রতিটি কীটের কাছে—যারা টানে দূর গুঞ্জরণে
স্বপ্নের উদ্ধত পাল। যে-তুমি নির্বেদ

সহসা লুপ্তির তীরে কেঁপে ওঠো। সহসা ধ্বংসের তীরে
প্রতিটি তন্দ্রা তবু ভেঙে যায় কখন পাখির ডাকে—
এমন মর্ত্যলোক, এমন তৃণের রাজ্য, এতগুলি ক্লান্ত ভোর,
সমস্ত মূল্যের মতো শোধ করে অপরিমিতের কোটি ঋণ।

আমিও তেমনই। আমাকে নির্ভার রাখো, তুমি রূপ, কান্তি তুমি,
তোমার হৃদয়ে শুধু। আমি কাঁপি জলের কাঁপনে—

যখন সূর্যের বেলা। অসংখ্য মৃণাল 'পরে ওরা ফুটে ওঠে।

৪
কোনো দিন, কোনোখানে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলে।
এখন কপাল তার ভরে গেছে চন্দনে, চুমোয়,

এখন নিদ্রা তার ভরে গেছে অদেখা বাগানে,
তুমি সমস্তই দেখেছিলে পথে যেতে, দূরের প্রবাসে,

নতুন বাঁধের দিকে, অক্টোবরে, সেবার প্রথম কুর্চিফুল ফুটেছিল-
তারো আগে বহু শ্রম লেগেছিল ঐ বাঁধে, ঐ লোকালয়ে।

সকলই শ্রমের অন্ত। সৃষ্টি শুধু রাত্রিজাগরণে
প্রেমিকের, পণ্ডিতের, বিজ্ঞানীর তাপসিক কাজে,

অথচ মুক্তি তার অকল্পিত, অনির্দিষ্ট নামে—একদিন ভোরবেলা—
রাস্তা তখনও ভিজে, ট্রাম ছিল, দু'একটি মানুষ—

ঘুমের প্রান্তে তুমি কুয়াশায় তাকে ডেকেছিলে।

৫
যমুনা ব্রিজের 'পরে গোধূলির সূর্য ডুবে যায়।

এখনি রাতের ট্রেন চলে গেল। দূর কিনারায়
তিসিক্ষেত, বালুচর, শৈলচূড়া সবই
যেন এই নদীকূলে উৎসারিত, আকূল পূরবী—
এই নদী অশ্রুনদী তবে?

শূন্যে আকাশ জুড়ে, অন্তিম আলোর কাছে, পতঙ্গের রবে
বিদেশী নৌকো যায়—যেন কোন্ দিগন্তে যমুনা
শেষ হল। যেখানে স্বপ্নের দেশে স্রোত বিনা, জল বিনা
অগণ্য নৌকো ভাসে। বিস্মৃতির ঘাটে ঘাটে তত দূর

খেয়া-পারাপার করো চিরকাল তুমি পূরবীর সুর।

অবকাশ

যেদিন নীরব হবো আমাকে কোরো না তুমি ক্ষমা।

কেননা অনন্ত কাল ব্যাপ্ত করে আয়ুর আঁধার
উপরে এসেছে নেমে—বৎসরে বৎসর যায়, ডুবে যায় দীনা
শ্বেত-সূর্যের রাত্রি। অবসন্ন বাঁধের ওপার

দিয়ে সে শুধু গড়ায়। ধূসর জলের তীরে
তাকে দাও খুলে।
আজো কি বিকেল নয় তত দূর অশ্রুজলপ্লাবী?
অথবা অগ্নিকুণ্ড আজো নয় আগুনে বিশাল?
যেখানে চলেছে রাত্রি, অর্ধদগ্ধ পাণ্ডুলিপি, কিছু বা সন্তাপ,
অথবা, জেনেছে অগ্নি তুমি শুধু দরিদ্র একাকী
যে তার মার্জনা চায়।

আমি চাই শবের উত্থান
দুর্গের প্রাকারতলে, শোনো দূরে গোধূলির ধ্বনি,
শোনো উঁচু শিখরে শিখরে হারা পর্বতের গান—
পশ্চিমদুয়ার খুলে নেমে এসো এই জনপদে।

যেদিন নীরব হবো নিজেকে বোলো না তুমি 'ক্ষমা
অভিসম্পাতের মতো'—কেননা আগুন জানে ভস্মের বার্তা সব
সে কি জানে দিতে আমার শঠতাগুলি ইন্দ্রিয়প্রহত?

নিশাজাগরূক ঘণ্টা কেন বাজে এই অবেলায়?

দুঃসময়

আমার চেতনা শুধু শব্দের করস্পর্শে ভেঙে যায়।
অথবা তাকেই আমি খুঁড়ে ফেলি যেন উদ্বেলিত
ছায়া-গন্ধ-ঝরা গাছ খুঁড়ে ফেলে বীজের আশায়
সূর্যের আন্দোলনে মাঠে মাঠে যা-কিছু নিহিত।

এ-শ্রমের অন্ত কবে? শুরু বা কোথায়? পূর্বপুরুষের
মতো প্রেমে অবরোহ কবে বা গিয়েছে জানা
অর্ধেক উদর তার—বাকি সব লজ্জারুণ ঘের,
যৌনপ্রহারের শব্দ নিশীথের অন্ধকারে টানা!

না হয় জালের ফাঁকে জেগে ওঠো কালো স্থপতির
বিষাদকরুণামাখা ভাঙা হাতিয়ার আর লোহার তর্জনী,
না হয় জালের ফাঁকে জেগে ওঠো গতি-অগতির

আত্মশাসনমুক্ত লোভে ছেঁড়া দ্রৌপদীর বেণী।
ধৈর্যই আমার নাম—চতুর্দিকে তুলেছি দেয়াল,
যখন আঘাত এসে পড়ে শুধু শব্দের, ক্ষতির।

২
তবুও সময় হল। বৎসর টলে পড়ে যায়
আরেক ঋতুর গর্তে। এসো ছুঁড়ে ফেলি
সূর্যঘড়ির 'পরে আমাদের আজানুপ্রভায়
অপরাহ্ণের ছায়া। আত্মার মুখোমুখি সেই খেলা খেলি।

অথবা অন্ধের সাথে বসি আজ অন্ধতাবপনে।
ক্ষেতের ঊষর প্রান্তে—পত্রহীন ডুমুরের তলে
যখন উড়েছে কাক। ওড়ে কালো, স্তব্ধ ছায়া নিদ্রা-আরোহণে।
জেনেছ শস্যের জন্ম কত গূঢ় আশঙ্কার ফলে?

যেন-বা লুপ্তির কাছে পৌঁছে যাই—সিঁড়ি শেষ হল।
এ-যাত্রার অন্ত কবে? কবে শুরু? বীজের আঁধারে
ঢেকে রাখি শ্বেত রৌদ্রে আমরণ অন্তঃসার
—আমার চেতনা, তাকে বোলো!

যদি না সমস্ত ভাঙে তারই আগে—শব্দের আঘাতে
যদি না বাতাস ভাঙে, রশ্মিপাতে, একই কেন্দ্রে, উৎসারণে,
যদি বারে বারে
জেনে যাই অজ্ঞানতিমিরতলে তারা কি সফলও!

৩
নির্জন বালির বুকে পড়ে থাকা নৌকোগুলি তোমাদের জানে
তাদের ছায়ায় বসে গান করো সারাদিন হৃদয়পণ্যের
কখনও নেমেছ ঢেউ-এ, নীলিমায়, স্নানে,
উঠেছে শীর্ণ ধোঁয়া তোমাদের দারিদ্র্যঅন্নের।

বালি তত উষ্ণ নয় যত তাপ আমাকে অসুখ দিয়েছিল,
আমি নই ক্ষুধা, প্রেম, পিপাসাকাতর,
এসেছি ভূর্জবনে, অংশত আরো কিছু ছিল,
তারই আগে এসেছে প্রহর—

উটের ঘন্টার শব্দে, দিগন্তের অদ্ভুত সম্বলে
তারা যায়—জলের কিনার ঘেঁষে পুব হতে পুবে
আমার চোখের 'পরে পৌরুষের-নারীত্বের মহান কৌশলে

জেগে ওঠে সেই জাল ক্রান্তিহীন, অবলম্বহীন।
ভাঙা হাতিয়ারে তাঁর রোষাগ্নির আলো পড়ে—শুভ ও অশুভে
এনে দিলে ভয়ঙ্কর প্রলয়ের, দুর্যোগের দিন।

ক্ষয়

বকুল, তোমাকে শুধু ঈর্ষা করি, কতো না সহজে
তুমি তার মত্ত কেশে ডুবে যাও অনির্বাণ,
তোমার অতীতে নেই প্রবচন, ছায়া, শান্তি, গ্রন্থের বীজাণু,

আমার অনন্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে।
কেননা ফসল কাটা শেষ হলে এত বেশি অবিচ্ছিন্ন খড
মানুষ টানে নি যেন, আমিও দেখি নি যেন
কোনো কেশে এ-হেন সম্পদ।

খেলাঘর

কথা ছিল, পুকুরের কাছাকাছি খেলা শুরু হবে।
সেদিন ঢেউএর নীচে, কচুরিপানার জালে, নিস্তব্ধ সবুজে
যত দূর ডুবে যায় পিতলের থালা-বাটি, বুদ্বুদ, সাবান,
তারো চেয়ে অন্ধকারে

সূর্যহীন, শব্দহীন বিস্ফোরণের মতো আমি অলৌকিক
খেলাঘর বেঁধে দেব।

তাই তারা ডুবে গেল প্রয়োজনে যাদের এনেছ।

আজ, অপরাহ্নকালে, আমি একা জলের আঁধার ছেড়ে উঠে যাব
সেই ক্ষমতা, বিচার, সমস্তই ভুলে গেছি,
মনে হয় উঠে এলে বাহিরের স্থল জুড়ে এমন
অন্ধকার—এত গাঢ়, এত স্তব্ধতার,
আর বুঝি পাবো না জীবনে।

কেবল পাতার শব্দে

কেবল পাতার শব্দে আমি আজ জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন
তার পিছে কোটি কোটি উদ্বেল কাচের শিখরে
উঠেছে গীর্জার সারি—ধ্বনিরোল—মাতৃকা মেরীর মতন।

আজ আছি চিরন্তন রৌদ্র ও হিম-সকালের
আবরণ উদ্ভাবনে—যে-প্রহর বাজে না চকিতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায়, অজ্ঞান, অলক্ষ্য যাত্রায়,
পুরনো পাতার শব্দে, ঝরে পড়া অঘ্রানে, শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি—খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না, বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এত দূর গ্রাস করে—দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন—
ভয়ে, দুঃখে, অকস্মাৎ কোনো শব্দে, দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন।

আবাস

পথ হতে সরে যাও। শোনা যায় পাতার মর্মর।
ফেরার সময় হল শিশুদের। হে ধর্মতস্কর,
আর কেন বিষাদপ্রতীক্ষাম্লান হরীতকী ডালে
বসেছে পাখির মতো, পৌষের এ-হেন সকালে!

আমি বাতায়নতলে শুয়ে আছি—বেশি দূর যাই না কোথাও
কেননা শূন্যতা হতে ঝরে সব—আকাশ কুসুমরাশি,
বার্ষিক ক্ষুধাও,
অফুরান অনুপ্রেরণার মতো মনে হয় সূর্যে এসেছিলে
মনে হয়, নিয়মনিষ্ঠার মতো আরো কিছু আছে কি নিখিলে?

পরিমাপে দিন গেল। যে-কোনো গার্হস্থ্য হতে
যাত্রীবদলের ঘণ্টা বাজে। দেখা হবে ফের—
একদিন মূঢ়, অন্ধ পাতালতিমিরে তুমি পেতে বেখো কান,
হে ধর্মতস্কর, হায় বোঝা যাবে নাকি সেই
কবিদের শৈশবের গান!

ময়ূর

ময়ূর, বুঝি-বা কোনো সূর্যাস্তে জন্মেছ?
এবং মেঘের তলে উল্লাসে নতুন ডানাটিকে মেলে ধরে
যখন প্রথম খেলা শুরু হবে--সেই স্থির পরকালে
আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি, ময়ূর।

সমুদ্রসৈকত ধরে এত দূর, এত গাঢ় স্তব্ধতার কাছে এসে
তোমার প্রবল দৌড় দেখা গেল, যেন
আরো শব্দহীনতার প্রতি—অন্ধকার ঝাউবনে—অস্তিত্ব-জটিল
আমাদের আর্তরবে ডেকেছ সহসা

সেদিন বনের শেষে নির্বসন যৌবনের চোখে
বিদ্যুৎচমক বলে মনে হল তোমার প্রতিভা
মনে হল নবীন নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি
এইভাবে ক্রমাগত অন্তহীনতার বুকে মিশে যায়।

ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
অস্তিত্বকে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
আমি তার ভেঙে পড়া দেখেছি গর্জনে। দেখেছি আছাড়
ডুবন্ত জাহাজ থেকে ভেঙে নেয় পাটাতন, জয়ের মাস্তুল।

তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষে, অন্ধকার বনে,
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব—
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছ বিশাল,
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ?

সমুদ্রগামী

সেই মাল্লাদের রক্তে আমি জন্মিয়েছি
যাদের জীবনে সূর্য হৃদয়, বিস্ময়,
বুঝেছি সমস্ত নৌকো একই দিকে চলে
যদিও বিভিন্ন চলা, বহু দ্বীপের আশ্রয়।

এখন লবণজলে, আগুনে ও ঘামে,
সূর্যকে দেখেছি ফিরে মাথার উপর—
যাবো দূর অস্তাচলে. সূর্যাস্তের পানে,
যদি শুনি তোমাদের আর্ত কণ্ঠস্বর।

এই স্রোত সামুদ্রিক—সমুদ্র কি জানে?
পিতৃপিতামহ আজ তোমরা কি জেনেছ?
জানাবে কি আমাদের শত অপমানে
গ্লানি নেই। তবু তরঙ্গ রয়েছে
রয়েছে সিন্ধুর ডাক—সিন্ধুশকুনের—
ধাতু-সমুজ্জ্বল সেই বেশ্যাদের স্নানে।

কবির উত্থান

যদি না জাগাও গান খরশব্দে, ইস্পাতনিক্বণে
তবু আজ খোলা তরঙ্গের মতো ভয়াবহ, চেতনাসম্ভব
ফেনপুঞ্জে সেই কবি যাঁর জন্ম দ্রাক্ষা ও পাথরে
অথবা বিপথগামী কোনো মূর্তির শ্বেত, সবুজ অন্তর
ফেটে শৈবালের সন্তানের মতো যাঁর জন্ম ছিল—
তাঁরই বার্তা উন্মার্গের গোধূলিতে এখন উঠেছে

এ কোন্ নক্ষত্র?

যদি না জাগাও গান ভোরবেলা গাভীর স্বননে
তবুও তোমার পক্ষ্ম চিরকাল এমনই কি কলঙ্কলাঞ্ছন?
ভোরবেলাকার ক্লান্ত জ্যোতির্মণ্ডলতলে গত রজনীর
শেষ চুম্বনের মতো তাঁর নিশ্বাস ফুরালে—

চেতনাউদ্ভূত কবি তাঁকে কি শায়িত রেখে চলে যাব যে-দিকে সম্ভব?

যাত্রাপথ

সমুদ্র এখন আর সমুদ্রের কোনো রূপে নয়
স্তম্ভিত তারার মতো আলো দেয় কূলে, উপকূলে,
জানো নাকি এই জল লঙ্ঘনের—বিজয়শঙ্খের—

হঠাৎ আগুন হয়ে ফেটে-পড়া দূর আরাকানে
হেমন্ত রাত্রির বুক ভরে আছে কর্কট, মিথুন,
এ যেন চূর্ণতা আজ পৃথিবীর, সুরমণ্ডলের—

একটি তরঙ্গ হতে দিগন্তের তরঙ্গনিক্ষেপে
যেতে যেতে শোনা গেল সেই রোল, অর্গ্যানবিধুর—

'তুমি আজ ব্যবহার—ব্যবহার শুধু।'
সোনালি বালির তলে অব্যবহৃত
রক্ত নারিকেল একি আমার হৃদয়?
এ কি তার অন্তিম বিস্ফার?

কার্নিভাল

বেলুন ছেঁড়ার শব্দ, করতালি, ঐ নীল দ্যুতি,
জলের বুকের মাঝে হাউই উঠেছে—চলো কার্নিভালে,
চলো সেই উৎসবের, সৌরভের, নিষেধের, লোহার কাঁপনে,
আবার প্রবল টানে মিশে যাই দ্রুত ঘূর্ণি-চালে

মুছে যাবো যেন ঊর্ধ্বে বাষ্প ক্ষণিকের
পাশাপাশি অনুজ্জ্বল ছোট বড় রথে ও ঘোড়ায়
বিস্মিত ব্যাকুল রেখে—আমি জানি ফুর্তি ও পিপাসা
আমাবই প্রতাপ আজ, বাকি সব মৃত, হতকায়

চিকিৎসকের মতো ক্লান্তিহীন, সর্বজ্ঞ, মেধাবী।
আমি দূর নক্ষত্রের উন্মীলনে খুলে ঝরে পড়ি—
এই রাতে, স্ফুলিঙ্গ-ওড়ানো শব্দে, শত বহ্ন্যুৎসবে,

আমার ক্ষমতা চাই--চিরদিন ক্ষমতা, শর্বরী।
আমার ঘূর্ণি চাই, প্রবল বাহুর টান, এ কি নয় নাচ?
এ কি নয় লজ্জাহীন, নষ্টবুদ্ধি, উলঙ্গের সেই আকর্ষণ?

সেবাস্টিয়ান বাখ্

একদিন বড়ো মূর্খ হবো। বসন্তে ব্যাপক কোনো লতার আড়াল থেকে
গোপন পল্লবজাল সরিয়ে নির্ভয়ে একদিন ডাক দেব 'কুহু'
অথবা সবুজ আলো গম্ভীর, পত্রবিরহিত,
আমাকে ফলের মতো শূন্যে দেবে দোলা—দেবে সঞ্চালন—

অথবা সূর্যের তাপে, শতমারীবীজে আমি একদিন উন্মূল বনানী
নীল পাহাড়ের তলে চলে গেছি—স্তব্ধ এভিন্যুএ
যত দূর ধ্বনিপল্লববীথি আন্দোলিত—অপস্রিয়মাণ—
তত দূর। সহসা কবির কণ্ঠে কোকিলের মূর্ছা ভেঙে ওঠে।

একটি সুরের জন্ম শত-শতাব্দীর আবহমানতার বুকে দাঁড় ফেলে,
নৌকো বেয়ে যাওয়া
এ যেন উৎসবশেষে, নিরালোক ক্লান্ত ঝড়ে, চূর্ণবিচূর্ণিত
রৌদ্ররশ্মিকণা! আজো নই সুর—নই গান—

নই উত্থানপতনে কোনো ভ্রষ্ট রাজা, গীর্জার আঁধার।
তবুও আঙুল কেন উন্মাদক? কেন আঙুলে অক্ষর?
কেন আমার ক্ষমতা নেই বিশাল ধ্বংস হয়ে জন্মিয়ে ওঠার
—কেন নেই ভয়?

পুরী সিরিজ

পুরী সিরিজ

প্রচ্ছদ : লেখক

By the rivers of Babylon, there we sat down, yea,
we wept, when we remembered Zion.

Psalm 137

উৎসর্গ

হস্তচালিত প্রাণ তাঁত সেই আধোজাগ্রত মেশিনলুম আমাদের হুর রে
'বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি'
ছিল ভালোবাসা
ছিল অনিশ্চিত রেলডাক ছিল মেঘের তর্জন
ছিল আঠারো/উনিশ মাইল টিকিট অথচ বেড়ালাম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হল
হস্তচালিত প্রাণ তাঁত সেই আধোজাগ্রত মেশিনলুম আমাদের হুর রে
ছিল উচাটন উট ছিল তানপ্রধান রেডিও আমার শুনেছিলাম
চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারবো না লো তখনই তোমার চিঠি এল
পেলাম অনিশ্চিত ডাক পেলাম উপহার সেবার জন্মদিনে রিবনেবাঁধা রবীন্দ্রনাথ
পড়ি নি এখনো সময় কোথায় বাবা

যতদিন কালুবাবু জীবিত আছেন চিন্তা নেই বুঝে নেব রক্তকরবী
কখনো না কখনো নিচু গলায় ওঁকেই বলতে শুনবো ধন্যবাদ আজ
হস্তচালিত প্রাণ তাঁত সেই আধোজাগ্রত মেশিনলুম আমাদের হুর রে
আজ গন্ধক মেশানো জলে স্নান করে জেলঘুঘুদের আত্মা

আর কি চাইতে পারো কলকাতায় তাঁতকল ছাড়া তুমি চেয়েছ কবিতা

পুরী সিরিজ

১

এখন আকাশ নীল। অর্জুনগাছের মতো সমুদ্রছায়ায়
বসে আছি। বহু সিগারেট টিন নিয়ে উড়োপাতা, বালি
ছেঁড়া খবরকাগজ সমেত তোমাদের হৃদয়বত্তা নেড়ে
লাখো লাখো গুণ্ঠনমিছিল এই নীল ঢেউ।
ও শ্বেত বৈধব্য, পাখি, তুমি কারাগার
রৌদ্র থেকে ফেলে দাও গরাদের ক্রমপরম্পরা
গরাদের মধ্যে থেকে মাল্যবান পাহাড়ের ব্যাকুল লাক্ষাবনে
আমারো মস্তিষ্ক, নেশা, চৈতন্য, সমাধি
পাদ্রীদের, সন্ন্যাসিনীদের হাতে চলে গেছে।

আফিম! জলের শব্দ! দেবী তুমি! ন্যুব্জতা সবার!
মৃতের করুণ বাহু আপনার মাথায় রেখেছ
মৃত্যুই তোমার ঘরে শব্দময়, কোলাহলরত
মৃত্যুই তোমার ঘরে বসন্তের অদ্ভুত স্ফুলিঙ্গ
জ্বালায় বারংবার। আতসবাজির মর্মে উড্ডীন আঁধার
হে শ্বেত ব্যাকুল পাখি—বর্তুল জলের
প্রবল কিনারে বসে দেখি এই সারিবদ্ধ নৌকো, দাঁড়ি, ক্রমপরম্পর
জলের সীমানা ছেড়ে একে একে শূন্যে উঠে যায়।
আমারো চতুর্দিকে গরাদের স্তব্ধ ছায়া পড়েছে এখন।

এখন তোমার মুখ চামচের মতন উজ্জ্বল
তোমার বিনষ্ট মুখে রুধিদের বিসম্বাদী ঢৌল
টলায় নাবিক, পণ্য, কফি, নুন, কস্তুরী, গন্ধক,
নাকছাবিটির হীরা—এত বস্তুগত সবই!

অপার আমার স্বপ্নে অসম্ভব বাণিজ্য চলেছে!
জানু তুমি! তুমিই জানালা! অনুসন্ধিৎসায় তুমি খুলে যাও
পুরুষের প্রেমের খেয়ালে। তরঙ্গের বিপুল চাপড়ে সমস্ত সৈকত ছেয়ে
শুধু খুলে যাওয়া, পুরুষের ব্যক্তিত্বমোচন
পুরুষের অশ্রুপাত, পুরুষেরই ক্রমাগত লীন শাদা অশ্রুচিহ্ন মুছে ফেলে
বালির গহ্বর খুঁড়ে, দীর্ঘ ব্যাপ্ত শীতের আকুতি।

এ কি ঘুম? এ কি আত্মবিস্মরণ?
এ কি অকস্মাৎ মর্মরের ফুলে অধ্যুষিত হয়ে ওঠা?
এ কি বীরের ক্ষমতাজাল? নাকি সফলতা নামে কোনো
সামুদ্রিক জাতি? নাকি দেবদারু নামী তীর, জেলীমাছ, নৌ-অভিজ্ঞতা, ঢেউ,
আপন মুঠোর মাঝে পৃথিবীরই কীর্ণ হয়ে যাওয়া?

দূরবীক্ষণ তুমি, চেয়ে আছ, ঝঞ্ঝার মেঘে, ঐ নিলীমাবিথারে
সমস্ত সন্ধ্যা ভরে লুব্ধকের পিছু পিছু আরো বহু তারা—
বনকুকুরের সারি জঙ্গলের মর্মে ছুটে চলে—
সমস্ত সন্ধ্যা ভরে লুব্ধকের পিছু পিছু দেখা যায় সমুদ্রমন্দির
টানো তুমি, এখন সন্ধ্যা ভরে অদ্ভুত জোয়ার এল, বসন্তও সমাগত ঐ
তোমার বিশাল বাড়ি ভেঙে ফেলে লাখো লাখো জানালা উঠেছে
বসন্তকর্ণিক হাতে কারিগর পুরুষ এনেছি।

২
বাঁশি তুমি ভেঙে ফ্যালো, সে আমাকে বলে না কিছুই
তারো চেয়ে ছিদ্রময় এই ছোটো নৌকো আমার
ঝাউয়ের শাখার নীচে অপারগ, ভাই শুধু জানে
শিরীষ, গাবের আঠা, শ্রমসাধ্য বাণিজ্যের পাড়ি
অথবা কুয়োর জলে শিশু জানে গহ্বর অতল
অথবা অরণ্যে যেতে ভয় পায় আমাদের বোন
সবাই সমস্ত জানে, আঙুর বাঁচায় ফলে শৃগালের লোভ
নির্বাক বাঁশিও জানে দেবতার কেশবদ্ধ কেশ
সেই দিন খুলে দেব, ভাঙা নৌকোয় তারা যেদিন প্রস্তুত।

৩
দূর থেকে হাত তোলো। যদি পারো জানাও সম্মতি।
নইলে সঙ্কেত আজো বৃথা যায়। চলে যায় নৈশ ট্রেন দূরে
অর্ধেক জাগ্রত রেখে আমাদের। অবিরত যাত্রা কি কাঠের?
লোহার কোরক থেকে আজো দীর্ঘ প্রতিধ্বনিময়
স্টেশনে স্ফুলিঙ্গ পড়ে। দরজায়, উজ্জীবিত নীড়ে
ভাঙা হাত, নষ্ট চোখ, মনে রেখো সেই দুর্ঘটনা।
চলেছি নির্বাণহীন, ক্রাচে বাহু, অন্ধের বিত্ত নিয়ে খেলা
আমাদের প্রস্তাবে কোনোদিন দিলে না সম্মতি।

৪

এ-সব সমুদ্রতীর বারবার ব্যবহৃত হয়ে গেছে, লক্ষ্য করো।
লোহার মসৃণ খাঁচা বালি লেগে অহেতু কর্কশ হয়ে উঠেছে এখন, লক্ষ্য করো।
একদা খাঁচাই ছিল কাকাতুয়াটির চেয়ে অনেক শৌখিন।
দ্বিবিধ অর্থময় রায়গুণাকর ছিল অনেক বাচাল—
অতি-আধুনিক বলে ভুল হয় তাকে আর এ-সমুদ্রতীরে
প্রত্যেক বাড়িই যেন বসবাসযোগ্য বলে মনে হয়—
গজদন্তের মতো সৈকতে আরূঢ় হয়ে বালি নিয়ে শিশুরা খ্যালে না আর
তারা আজ বড়োসড়ো। আপন শিশুর কাছে রাখে না প্রত্যাশা।
পাটিগণিতের পাতা ছিঁড়ে খায় উই। তবু যা কিছু তরঙ্গে ফ্যালো
সমস্তই ফিরে আসে—সমুদ্রের অহেতু মর্যাদাবোধ, এই সব।

৫

একদা স্বপ্নে ঐ জটায়ুর, পাখপাখালির অসম্ভব তূর্য শুনে
হে বীণাবাদিনি, আমি ভেবেছি তুমিও
কার্পেট-ঝাড়ার মতো ফুলে ওঠো, কেননা প্রেরণা
অসম্ভব গলাবাজি, তম্বুরার, মালিন্যমুক্তির—
অথচ শ্মশান থেকে ভেসে আসে শান্ত সাদা চোখ
কালো কাঠে, ধোঁয়ার উৎসারণে নিয়ে চলো,
নিয়ে চলো, তুমি দুটি চোখ।

৬

হারার মাটির কেল্লা শূন্য থেকে ফেলে দাও শাদা কালো বাতাসতাড়িত কুকুর ক্রমশ খাঁচা খুলে ফেলে একে একে নিষ্ক্রান্ত তাদের গূঢ় যোগসাজসের চিৎকার অকস্মাৎ খাঁচা ভেঙে প্রাকারের উঁচু দেয়ালের 'পরে আলোড়ন কুকুরের হারার তোমারই ঐ বন্য নানা অগ্ন্যুৎপাটিত হিংস্র কুকুর ছেড়ে সারারাত আবিসিনিয়ার রূঢ় অব্যয় মাটি দিয়ে গড়া এক চকবাজারের হৃদয় স্পন্দমান তাকে রক্ষা করো বন্দুকের চোরাচালানের মতো মনে হয় নিজেকে আমার এবং আকাশ থেকে সৌরমাকড়সার মতো ধাবমান তুমি দিন তুমি রাত্রি উটে বা গাধার পিঠে পণ্য নিয়ে বহুকাল অপেক্ষা করেছ এই হারারের ফটক খোলার ক্রমাগত লোহার তামার শব্দে পৃথিবীতে বাদামখোসার মতো ভেঙে পড়ে অন্তর্নিহিত মানুষের উল্লুকের পরিবার দেখাচ্ছ বক্তাকে উঁচু পাটাতন থেকে বক্তাকে বিহ্বল ভূতে পাওয়া কিশোরীর মতো টেনে নিয়ে যাও মানুষের কনুইবন্ধনে সরু সৈকতের বালুর উপর কিন্নরের পদচারণার মতো প্রাথমিক এই সব অভিজ্ঞতা ফলের সোপান ভেঙে সূর্যে উঠে যাওয়া পাতার মর্মর ভেঙে শাখাপ্রশাখার গূঢ় রঙ্গীন ক্ষুব্ধ রস নিষিক্তের

অধৈর্যের নদীর এপার থেকে ওপারের যাত্রীবদলের প্রকাণ্ড পাখির রক্তনখরে-ধরা নারিকেলপুঞ্জ তুমি এই ফলবান গাছ আমার মাথার 'পরে অবিশ্বাসিনীর মতো নুয়ে আছো বুঝি পথে ঘূর্ণিপথে চোরাচালানের বার্তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেয় আগুনবিধ্বস্ত পথী তোমাদেরই কেননা অকস্মাৎ গাছ থেকে ফল খসে পড়ে কেননা সমুদ্রেও অনিয়ন্ত্রিত জোয়ারভাটার দ্যুতি ক্রীড়ারত কেননা বাৎসল্য ভেঙে পৌরুষের/নারীত্বের হলাহল আমিও করেছি পান।

৭

যুদ্ধের কথা ভাবি, কেবলই যুদ্ধের কথা, কেবলই যুদ্ধের।
অথচ যুদ্ধ সেই কোন্ কালে থেমে গেছে উনিশশো কত'য়
শুনেছি আবার যদি শুরু হয় তাহলে ব্যাপক
সভ্যতার কান ধরে টানাটানি শুরু হবে। খাঁচার ক্যানারি পাখি
খবরকাগজ পড়ে আমাকে অযথা হৃদয়দৌর্বল্যকর সংবাদ জানায়।
ফোয়ারার জলে আর নামো না তুমিও, পাথরে শৈবাল।
কীটের উড্ডীন দলে মিশে গিয়ে আমি বলি, 'যুদ্ধ কোথা, যুদ্ধ তোমাদের।'
নিষিদ্ধ তামাসা আমি পেয়ে গেছি—আমার মার্জনা নেই।
ক্যানারি পাখির কাছে, আত্মসম্মানবোধে, বলি নি সেসব।

৮

সামুদ্রিক মফস্বলে ফিরে চলো। সস্তা ও কোমল
তরিতরকারিময় ঐ দেশে। গাছের ছায়ায় বসে ভেবো এই।
তোমার তর্জনী ধরে এরো বেশি যাওয়া যাবে, শিশুর তর্জনী
আরো দূরে টেনে নাও, এমন-কি যে-দেশে এবার
অনাবৃষ্টি, অসম্ভব মহামারী, বেকারবিপ্লব,
চাষীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাদ্যরত রাজনীতিজ্ঞের দলে
ভিড়ে যাই, চলো, সময় বড়ই অল্প, তা'ছাড়া, যত দিন যায়
সময় ক্ষুদ্রতর, সে বামন, লাফিয়ে পিঠের
উপরে আরূঢ় হই, চলো, নইলে অনেক ছোট, মূর্খ ম্লান হয়ে
যাবে সে-ও। বামন ঘোড়ার পিঠে ন্যস্ত হয়ে কবিতার ব্যাখ্যা চেয়ো না
সস্তা ও কোমল তরিতরকারিময় দেশে ভালমন্দ খাও দাও
তোমার পিছনে কোনো গোয়েন্দার চোখ নেই। শুধু কবিতার
যে-কোনো ব্যবস্থা তুমি করে যাও। অন্তত এসব লেখা
ব্যবহারযোগ্য কিনা, বসবাসযোগ্য কিনা, না জানালে

কৌতূহল থেকে যায়। না হয় মফস্বলে সামুদ্রিক
মাছের সম্পাদনা তুমি.কোরো। আম'র ঘোড়াটি চাই।

৯

অখিল শুশ্রূষা এই লাবণি লাবণ্যরাশি এই জল, এই প্রতিকার,
পৌত্তলিকতা ছাড়া আমি আর জানি নে কিছুই
সিন্ধুজলে এই সব উপকূলবর্তী আগুন
নেভে কি নেভে না তাও পৌত্তলিকতা এসে বলে দেয়
তাদের গ্রহণ করো, অভিজ্ঞতা, তাদের জাগাও
মাছের ভিখারি করে ভিখারির দুয়ারে বসাও
এত বড় বেসরকারি আতুরালয়ের নীল ভানুসিন্ধুজলে
লুকোচুরি খেলা ভালো, আতুরালয়ের পশ্চিমে জামের বনে
তোমাদের ও' খেলায়, খেলার সাথি, নিমন্ত্রণ।

প্রকৃতির ছবি

নিরক্ষর বেশ্যাদের চিঠিগুলি লিখে দিচ্ছি এই ফাঁকা তেষট্টিতে, মরিয়ম তোমার বাগানে, তোমাদের কার্পাসবাগানে, ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে একাই, নিরক্ষর বেশ্যাদের চিঠিগুলি আমি লিখে দিচ্ছি অতিপুরাতন বাবু ও দালাল ছাড়া এই ফাঁকা তেষট্টির খেতজাঙালের পাশে আমার হাস্যকর পাঠপ্রচেষ্টার খেলা আর কেউ দেখছে কি আমার দ্বিধাবিভক্তির টান আর কেউ বুঝে ফেলছে না তো, মরিয়ম, ভোরবেলা জানালার পাশে শুনি রাজহাঁস ডাকছে নালায়, শাদা আমার চাদর দেখে রাজহাঁস খুঁটে দেখছে নিজের পালক, কার্পাসবাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে অমনই, আমার দু'খানি পা ক্রমশই বিদ্যুৎলতায় জড়িয়ে পড়ছে এবং চকিতে আমি দেখে নিচ্ছি ঐ অধিদেবতার মল পড়ে আছে বনে, পুরুষেরই মতো ওরা পুনর্জন্মভীরু তবু পুনর্জন্ম নয় আমি ব্যক্তিগত প্রেত দেখে কেঁপে উঠি স্বপ্নে, নালায়, এ-বছর মরিয়ম গভীর পচনশীল নিচু ডালে লেখা হল 'বন প্রদর্শক', কাঁটাগাছ তুলে দেওয়া হল, বন থেকে বনে বনে টানা বিদ্যুতের তারগুলি মেলে দেওয়া হল, 'মদ' বলে আমি বারবার পুরুষের স্ত্রীলোকের রক্তমোচন শুধু বোঝাতে চাইলাম তবু স্ত্রীলোকে বা পুরুষেও তাৎক্ষণিক খেদ দেখা দিল না যদিও পশ্চিমদেশে ধান ভালো হল, ভালো হল পাট, পুবদেশে পাট ভালো হল, আখ নিয়ে গবেষণা হল বহু, মরিয়ম হাওয়াঅফিসের কাছে আমরা কি কালকের পরশুর বৃষ্টিবাতাসের কথা জানতে চাইছি,

আমরা কি উদ্ভিদের জীবনমরণজন্ম মৃত্যু আর বেড়ে ওঠা নুয়ে পড়া জানতে চাইছি, আমরা কি লিখছি না কিছুই, বেশ্যাদের ফেলে দেওয়া চিঠিগুলি লিখছি না আবার

আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি আমার আত্মার কোনো ভঙ্গি নেই আমার আত্মার কোনো বেশবাস নেই শুধু তোমার যাবার পথ চেয়ে থাকা ছাড়া তুমি বেশি দূর না গেলে এবার আমি রেলব্রিজে উঠে দেখি ঐ দিকে পেট্রোলঢালা গোল হেমন্তের বাতাস স্তম্ভিত হয়ে লেগে আছে উঁচু সদৃশ গাছের ডালে আমি লক্ষ্য করি তবু আমার আত্মায় কোনো ভঙ্গিমা জাগে না ইউকালিপটাস থেকে অমাবস্যা অন্ধকারে পাখি উড়ে যায় আমার নিরুজ্জ্বল ভবিতব্যতার কথা ভাবি তুমি আমার সন্তান নও তাই আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি তোমার যাবার পথে আমি নেশাতুর চোখ মেলে দেখে নিই উলঙ্গ মেয়েরা ক্রমাগত গ্রাম আক্রমণ করে এবং প্রকাশ্য মাঠে রামধুন গী'ত হয় এবং স্বল্পমূল্যে পুংমহিষের পুরুষত্ব নষ্ট করা চলে তবু বেদনা জাগে না আজ কিছুতেই

অথচ শাসন জাগে নড়ে ওঠে চাষি ও ক্ষত্রিয় নিজেদের টুকরো-ভাঙা বেলোয়ারী নিকট নিশ্বাসে যৌথ বিছানায় স্বীয় আত্মীয় পুলিশ থেকে কেউ দূর নয় আতুরালয়ের পাশে ঘাসবনে ডুবে যায় পুরুষের রক্তমোচনের স্তূপাকার তুলা আর বীজাণুনাশক

আর তোমার যাবার পথে প্রবাসের শীত নেমে আসে দ্রুত ওড়ে বিদায়বেলার রাত্রে শাদা বাষ্প তোমাকে অমনই অল্প জানা রেলইস্টিশন থেকে হেমন্তকালীন ট্রেনে তুলে দিই কারণ আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি তুমি বেশি দূর না গেলে এবার

[আগের পৃষ্ঠায় যে কবিতাটি আছে তারই পুনর্লিখন]

সার্বভৌম বেশ্যাদের প্রকৃতির জীবজগতের আর দারুপুতুলের ছবিগুলি মনে পড়ে আজ ভোরে দামোদর বাঁধের উপর দিয়ে আমি ওদেরই বা চলে যেতে দেখেছি তোমার ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা বিদ্যুতের তারের রেখার মতো বিদ্যুতের তারের রেখার খেলার মতো বনবিভাগের অফিসের ঢালু মাঠে ওদেরই বা নেমে যেতে দেখেছি তোমার ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা কিন্নরছাগল তোমার ঘরেপোষা চিতা আর ধনেশের যৌথ ঘোরাঘুরি আমি স্বাধীনতা পেয়েছি এবং বিদ্যুৎ তাঁতের কল হাতঘড়ি সোডাকারখানা পেয়েছি এবং অতিরিক্ত মুনাফায় যারা শ্রমিকের বাড়িগুলি তৈরি করে দেয় তারা আংশিক বশ্যতা মেনেছে এ-কথা সরকার ক্রমাগত বলে যায় আমি যথোচিত নেশাতুর তাই সার্বভৌম বেশ্যাদের

প্রকৃতির জীবজগতের আর দারুপুতুলের ছবিগুলি মনে পড়ে আজ ভোরে নিজেই উল্টে দেখছি অব্যবহৃত পুরনো দিনের অস্ত্র আমার ব্যক্তিগত চর্বিমাখানো আত্মা ভেবে দেখছে পদ্মিনী ও রাজপুতজীবনপ্রভাত তারই কথা অন্ধকার ভোরে আজ পয়ঃপ্রণালীর কাছে সুন্দর বেজিটি নিয়ে আমি একা বেড়াতে গিয়েছি ও' বেজির আত্মবোধ ততখানি ঠিক রাজপুত মেয়েদের মনে পড়ে অব্যবহৃত পুরনো দিনেব অস্ত্র বাঘনখ এবং তাৎপর্যহীন লোহার জালের কোমরবন্ধের কথা মনে পড়ে বৃষ্টি-বাতাসে আমি আধোজাগরূক ছাতাখানি চেপে ধরছি অথচ বৃষ্টি নেই আলো নেই আজ কুয়াশা পড়েছে খুব স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আমি বাংলার বাইরে এসে মাঠের আলোড়নের মধ্যে শুয়ে আছি কুয়াশার ঐ পারে সূর্যের ওঠানামা দেখছি এবং দামোদর বাঁধের জলের কিনার দিয়ে হেঁটে আসছে ব্যক্তিগত প্রণয়িনী একা আমি তারই মুখ আধোজাগরূক ছাতাপাথরের মতো মেলে ধরছি মুছে নিচ্ছি শ্যাওলা ও চোখের জলের দাগ

স্মৃতি

যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার পানীয় ছিল সারাৎসার—পৃথিবীকে ভরাট লেবুর মতো মনে হয়েছিল—ব্যথা-বেদনার দূর মাস্তুল, কুম্ভীপাক ঘুরে গিয়েছিল দেখে আমারই মুঠোর মধ্যে ঐ গোল অর্থহীনতা—ফাঁপা, নিষিক্ত ও সহিষ্ণু জীবন ও জীবনব্যাপী কলরোল—আমার পানীয় ছিল বাঁদরত্রাসিত কোনো তীর্থভূমি—আবিষ্কার, অনটন, আপন বিবেক নিয়ে কুমারীরও এত লজ্জা হয় না আমার যত হয়েছিল—যথেষ্ট বিদ্যা শেখা হয়েছিল প্রদোষের অন্ধকারে পিঁড়ির আড়াল থেকে সতর্ক ও' ইঁদুরের চলাফেরা দেখে

যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার গ্রন্থ ছিল জটিল ও দুর্বিষহ অথচ মলাট ছিল রঙ্গীন, আত্মপরান্মুখ, তাতে আমি ক্রমাগত খোজা এই শব্দটির আধিক্য দেখেছি অথচ যে-সব লোল বহুরূপী এসেছিল তাদের সঙ্গীত হল না কারণ ঐ বাড়িটির গৃহকর্ত্রীদের হারমনিয়াম বলে যন্ত্রখানি অযৌক্তিক মনে হয়েছিল ঐ বাড়িটির যৌক্তিকতা আছে?

যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল মোটামুটি স্বার্থপর—আজ তাকে নিখিলগণ্ডুষ বলে মনে হয় আজ তাকে লিখনভঙ্গিমা বলে মনে হয় যদিও কয়েক শ' ক্রোশ দূর দিয়ে সিংভূমে দু' হাত তিন হাত মাটি খুঁড়ে ফেলে একই সঙ্গে মদ ও কঙ্কাল নিষ্কাশিত হচ্ছে আজ—মৃতের লাস্য তাই

যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার পৌরুষ ছিল বাস্তুসাপ, মৃত তবু পালনীয়, তাকে বারবার খুঁজে পাওয়া আনারস ঝোপের আড়ালে কখনো সন্তানবতী কখনো বা নিস্তরঙ্গ উজ্জ্বল দু'টি টানা চোখ হীনমন্য গরীব কবির, কখনো কাঁধের ভাঁজে ফেলে রাখা গত কার্তিকের লেপ, আমার পৌরুষ ছিল ঐ মতো, আমার পৌরুষ ছিল দোলাচল

যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার সৌভাগ্য ছিল অরুন্তুদ ভাগ্যবিপর্যয়, অল্প আগুনে সেঁকা কালো জিরে, গন্ধবহ—অথবা বাবার চটি—আমার সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়শাসন—ভুল বিদ্যাশেখা—ভুল আবিষ্কার—ভুল প্রজনন—ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড—ভুল ধূপাধার—ভুল পুষ্করিণী--ভুল দেবদারু—ততোধিক ভুল স্মৃতি, মিথ্যাবাদ, খেলাধুলা, বলের লাফানো আর মেঘের ভিতর থেকে আবির্ভূত জীবনের প্রথম এয়ারোপ্লেন—তা'ও সত্য নয়!

হ্যাঁ, তোমার কবিতাগুলি
পড়েছিলাম
পাগল প্যান
লাফিয়ে নামে
জলে
বনের ভিতর শুনেছিলাম শিস
বনের ভিতর রৌদ্রে খসে পড়ে
কাঁচুলি
আর শান্তিবেগম জামা
কবিতাগুলি বাংলা অক্ষরে
পাগল প্যান, আমাকে করো লাজুক।

আরো প্রকৃতির ছবি

বাতাস শাসন করে ঢেউগুলি। অনন্ত প্রাকার
শুষ্ক তৃণে, ঝাউশাখে। নগর পিছনে ফেলে চলে আসে সহস্র ভিখারি,
অন্ধ লোল ভিখারিনী, ভিক্ষাদাতা ইত্যাদির সার
কেননা ওষ্ঠে দুই করতল স্ফীত করে হাঁক দেয় মুক্তার শিকারি

যেখানে জলের রেখা ধাপে ধাপে দিগন্তে ছড়ায়
যেখানে সৈকত জুড়ে উড়ে চলে ছায়াপত্ররাশি
আমার হোটেল থেকে দেখা গেল—যতখানি তোমাকে দেখায়
কিছু কি গোপন রাখো? কোনো প্রেমবৈষম্যের হাসি?

প্রতি ধর্ম বলে দেয় : আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ।
ঐ মতো মুক্তা বলে। জলের প্লাবনে তব মুক্তার শিকার।
তরঙ্গে নেমেই আজ বোঝা গেল সমুদ্রকপাট

আরো দূরে। যেখানে জলের রঙ লৌহমরিচার
শিকলের মতো লাল। ভিখারির দলে মিশে আমি কি শুনি নি
জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি?

●

রাত্রির জোয়ার লেগে নুয়ে পড়ে সৈকততৃণ
এখন রেখেছি মদ নৃত্যপর মদের গেলাসে
উঠেছি নক্ষত্রহীন গম্বুজে ও সমুদ্রবাতাসে
দূর হতে দেখা যায় অপসর হেমন্তের দিনও

তোমাকে অনেক কথা বলা হল। কিছু নেই বাকি।
হেমন্তের দিনে আর ফাঁক নেই। পাতা হতে পাতার তরল
উচ্ছ্বাস ধাবিত দেখে, হে জীবপালিনি, ঐ অনন্ত শীতল
বাহুবন্ধে ছিঁড়ে পড়ে দেখেছি একাকী

চূর্ণ সবিতার দিন ক্রমাগত দূরে সরে যায়।
যেখানে সৈকততৃণ অর্ধেক আলোকগ্রস্ত অর্ধেক ঢাকা
যেখানে রুপোয়-গড়া সুবর্ণের, তরঙ্গের অতীন্দ্রিয় চাকা

আগুন উড়ায় দ্রুত। মৌমাছি কি গতিদিব্যতায়
আবার বসন্তদিনে খুলে ফ্যালে রান্নার হাঁড়ি।
যখন প্রস্তুত সব, ধোঁয়া ওঠে, ক্ষুধা, কাড়াকাড়ি।

●

লাল টালি
ঢেউ ওঠে
শাদা বালি
দুপুরের আলো
শাদা সূর্য ও বালি
টানে ঢেউ পড়ো পড়ো
জ্বলে লাল টালি

শাদা বাড়ি
ঢেউ পড়ো পড়ো
শাদা বাড়ি
ধূ ধূ সূর্যের আলো
শাদা ফেনা ও ফেনার
জাগে বালিয়াড়ি
তোমাদের বাড়ি।

বিদায়, বিষণ্ন সন্ধ্যা

হেমন্তে আগুন জ্বলে। এবারের শীত দ্রুতগামী
বসেছি অগ্নিকুণ্ডে, আমাদের লৌকিক গ্রাম
তোমারই পায়ের কাছে, ও আগুন, ওগো গৃহস্বামী,
বিপর্যস্ত হয়ে আছে, ঝরছে বাদাম—

আমাকে দিয়েছ শাস্তি—শাস্তি ফিরাবার
লক্ষ কৌতুক জানি, জানি এ-আঘাত
কোন্ মর্মে ব্যথা দিলে অশ্রুর নীল পারাবার
কেঁপে ওঠে। ঐখানে উজ্জ্বল ধর্মে গড়া হাত

আমার কাঁধের 'পরে আধেক ন্যস্ত হয়ে পড়ে আছে তারই
বসেছি দু'জনে একা, পদতলে লুণ্ঠিত শাল
হলুদ রেশমে গাঁথা. অন্যমনা হেমন্তে মার্জারী

নৈশ আগুনে বোঝে এবারের শীত আসে দ্রুত
আমিও বুঝেছি সব—ওরই মতো অগ্নির কাঙাল
তোমার চাদর হতে দেখে ঐ ছেঁড়া, ম্লান সুতো।

আকাশযান

তুমি সম্রাট, প্রভু ও যাতায়াতকারী পথিকের দেবতা
তুমি এক কাঠা মদ দাও আর আমাদের
দাই-মাকে ফিরে দাও
দু'চারবার আলোছায়া মেলে ধরো পথে তুমি
তোমারই প্রস্তাব
কুরুক্ষেত্র গ্রাম থেকে সিপাহীর হাঁক শোনা যায়
'সাধ ছিল' বলে আজ কাগজসন্ন্যাসী
তার মানে এই নয় বৃষ ও মানুষ
দু'চার বছর শুধু স্তন ও স্তন্য নিয়ে খেলেছিল
তাকে ফিরে পেতে হয়েছিল 'মদ' যাকে বলে
অর্থাৎ আদর তাকে পেতে হয়েছিল
কুকুরের ল্যাজ নাড়া দেখে তাকে প্রীত হতে হয়েছিল
বনের ভিতরে গিয়ে মনিব হারায় আর
নিশ্চেতন পড়ে থাকে বৃষ ও মানুষ
তুমি সম্রাট, প্রভু ও যাতায়াতকারী পথিকের দেবতা
ঝুড়ি থেকে তুলে নাও শুষ্ক ঠিক
তুলে নাও বজ্রসেগুন পাতা
মুখে বলো 'দেখহ বিচারি'

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম

যা ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্রব্যবহার লিখতে হবে বা আপনার উচিত ঠিক শব্দ ব্যবহার কি আবশ্যকতা যদি না হয় তবে বিচারে ফল নাই এই গ্রন্থে হিন্দী এবং ইংরাজি উভয় পদ্ধতিই অনুসার হল কিন্তু আপনাদের উচিত নিজেকে প্রস্তুত করা তা-ছাড়া এ ত জানাই কথা যে আমাদের জীবন ক্রমশই হয়ে আসছে মাটো এবং নাটা বা মহিলার মৃত্যুতে অনপনেয় শোক হয়েছিল আমি মেট্রিক পাশ ট্রান্সলেশন মোক্তার প্রয়োগ নাই এমনই ডাকবাংলার টানা পাখা চাই শীঘ্র আবেদন করুন

আমরা খরিদ করি তামাক মূলত আমাদিগের পিতা ৺মুরারী সাহা তাং...মৃত ও ঐ ব্যবসায়িক উদ্দেশে দোকান ও প্রেস বন্ধকী রেখে আমরা সন...এই দেশে আসি অনুপায়

যদি না সরকারি/বেসরকারি খাসদখলের জন্য উক্ত জমি-চাষ ও বীজবপনের শর্তে জলসেচ পরিকল্পনা তেমন সুষ্ঠু হয় না কারণ ভাগচাষিদের মধ্যে পরস্পর বিবেচনার অভাব আমাদিগের ভাই-বোনের ভিতরও তেমন বিচার নাই দ্বিতীয় ভগ্নীপতি কৃপণ ও অসদাচারী

নিরুপায় বনের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম শারদ মধুপুরে দেখেছিলাম মানুষ কী ভাবে সম্প্রসারিত করে তুষ দেখেছিলাম হাতে গড়া রুটি শুনেছিলাম মোহনানন্দ গান গাইছে মোহনানন্দ চিৎকার করে বলছে ও কেঁ ও এবং স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চারপাই ঘুরছে আর ঘুরছে প্রেতটেবিল শুনেছিলাম গান সে আজ অনেক দিন হল তাই স্মৃতি ভরসা বেদনা ভরসা

এবং আমাদের এই প্রয়াস গ্রন্থরচনার আড়াআড়ি দপ্তরীদের দোকান অধিকাংশ মুসলমান তা হোক পদ্ধতি অনুসার হয় ইলাহি যেমন দুরভিগ্রহ ও দেহাতী ভূষণ ও ব্রজচামর রক্ত ও তেল কিন্তু বিচার নাই আমরা চাই পরিবার চাই রেশনের বাইরে ঘর পিছু সম্বৎসর চাল ও জ্বালানি ও সরিষা মাথা পিছু দুই কেজি উক্ত দরখাস্তে আমাদিগের সই ছিল সাতজন অনুপস্থিত অর্থাৎ মৃত বা রুগ্ন আমাদের তিনজনের সই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হোক এই আবেদন

শাদা ঘোড়া

শাদা ঘোড়া, তোমার কেশরে আমি হাত দিয়ে আজ
বুঝেছি কেমন শ্বেত কবুতর, স্বাস্থ্য, দুধ, সূর্যের পাহারা,
বুঝিনি গোপন পথে, কী ভাবে বা চলে যায় ছিন্নবাহু তারা
অজস্র পণ্য নিয়ে—বালি ভেঙে—ক্রমাগত সূর্যহীনতায়

পশ্চিমে, ঢালুর দিকে। পিতৃহীন রণক্লান্ত মহাদেশ জানে
প্রবল হাতুড়ি গড়ে ধর্ম শুধু। পড়ে গেছে সাড়া।
অদ্ভুত বাতাস—তাকি দোলা দেয় খেজুরমর্মরে।

নীল তাঁবু স্ফীতমান, হায় ক্রেতা, হায় রে মার্জার

মৃত ঘোড়াদের অস্ত্র ফুলে ওঠে ক্ষুধার্তের হাতে।

ফেরীঘাট

হে সূর্য, ককুদবৃষ, সাবলীল সোনার গাছের
প্রচ্ছায়ায, অন্ধকারে সমস্ত তৃণের রোমে একই সঙ্গে
ক্ষুধা ও চুম্বন
রেখেছ স্তম্ভিত করে। হে সূর্য, উদ্ভিন্ন বাহু, তুমি পরাঙ্মুখ
আমাকে দাও নি ধান, গোলাঘর, বীজের উত্থান
আমাকে দাও নি সার, বৃষ্টিজল, কূপের বিন্যাস
আমাকে দাও নি শেষ জলসিঞ্চনের মতো জননীপ্রতিভা

ওখানে দিনের শেষে অপরাহ্ণের ফুল ঝরে যায় দ্রুত।
ওখানে প্রার্থনারত কঙ্কালের বাহুবদ্ধ ছায়া
খুলে ফ্যালে একে একে কৌতূহলহীন ত্বক, মাংসের জটিল
উপশিরাগ্রস্ত পাতা। একে একে অরণ্যের গাছ মরে যায়।
কেননা দিগন্তে তুমি
কীর্ণ হয়ে উঠে এলে এইমাত্র—কেননা সোনার গাছ
গ্রাস করে বেড়ে ওঠে—বেড়ে ওঠে উন্মাদ হাওয়ায়
অন্য সব ফুল, ফল, জীবের বিজ্ঞান
সাম্যতার, প্রতিসাম্যতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে

এখনো ডুমুর গাছে পৌষের লিপ্ত কুয়াশায়
মরা পালকের পুঞ্জে শুয়ে আছে পাখি—
মাটির গর্ভ খুঁড়ে আমরা অর্জন করি লোহার আকর
এত লোহা কাদের মঙ্গলে পরস্পর প্রতিবন্ধে গড়ে তোলে
এঞ্জিন, স্তব্ধ রেল, সাঁকো, বাড়ি, কলোনি, বাজার—
ক্ষীরের আর্শি থেকে স্বাস্থ্য ভিক্ষা করেছিল যক্ষ্মা-রোগিনীরা
ফলের আর্শি থেকে একবাটি স্বচ্ছন্দ রসের
ফেনায়, তারল্যে, প্রেমে
ডুবে যেতে চেয়েছিল দিল্লীর বাসিন্দা
দুধের আর্শি থেকে মৃত্যুপথগামী ওরা চেয়েছিল দীর্ঘ পরমায়ু

হে সূর্য, নাক্ষত্রতন্তু ছিঁড়ে তুমি বারবার
ক্ষীরে, ফলে, দুধের প্রবাহে
পৌষে, শীতের রাতে, মাংসে, ত্বকে, উচ্ছ্বসিত রোমে

একই সঙ্গে হাহাকার, করতালি, ইন্দ্রিয়ের বাঁশি
কুকুরের দীর্ণ ডাক, ভাঙা ঘণ্টা, জলের গর্জন
সোনার গাছের তলে উৎসারিত করে দিলে—
সোনার গাছের তলে এই কি চুম্বন?

কুয়াশায় রাজহংসের ফৌজ দৌড়ে চলে যায়।
হায় সূর্য, তোমাকেও আবিষ্কার তৎক্ষণাৎ
পূর্বঘাটে, বঙ্গোপসাগরজলে, সিন্ধুর আপ্ত-তরঙ্গের 'পরে
অশ্বারূঢ় ম্লান অক্ষৌহিণী—

তোমাকেও আবিষ্কার তৎক্ষণাৎ
কাঞ্চীকাবেরীর জঙ্গলের মর্ম ছিঁড়ে চন্দনবনের করাতকলের পাশে,
তোমাকেও আবিষ্কার তৎক্ষণাৎ গতরজনীর আলেয়ায়, খাজুরাহে
নৈকষ্যকুলীন, শূদ্র, ব্রাহ্মণের শোভাযাত্রাময় ঐ
ভাঙা স্তম্ভে, মিথুনবিপ্লবে—
হিমালয়ে, ডালহৌসী পাহাড়ে এক চিঠির অক্ষরে,
বস্তুত, ধূলির খেলা ফেলে দিয়ে আমি বারবার
অন্য সকলেরই মতো ধ্রুব তত্ত্বে, আত্মজিজ্ঞাসায়
ফিরে যেতে চেয়েছি যৌবনে
তবু আত্মরতিহীন কোন্ সৌরময়দানে আধিপত্য মানুষের?
তবু ব্যথাহীন কোন্ বিচ্ছেদের নীল?
কোন্ মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন?

এতগুলি বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ, ইচ্ছা, পরস্পর সারে সারে
মাথার এ-পাশ থেকে ঐ পাশে উড়ে চলে যায়—
জ্যোৎস্নায় এখনি উৎসব শুরু হবে।
কেননা সমস্ত হাঁস যুদ্ধের সন্তান।
কেননা উৎসব এক জাগতিক, বাঁকা উপত্যকা
চাঁদের প্লাবন, শিরা, রক্ত, বুদ্ধি, তীব্রতা ডিমের
ফুল-ফোটানোর আগে। এতগুলি বিপরীত, প্রতিদ্বন্দ্বী
উচ্চকিত থালা।
সহসা ঘোরাও তুমি যুদ্ধে, জন্মে, যোনির শিখরে ;
কেননা জন্মও তত কষ্টকর—বিচ্ছেদের মতো।
রক্তপাত ভয়ঙ্কর ততখানি গম্বুজের ভাঙা দেয়ালের মতো।

স্বাধীনতা! অকস্মাৎ তোমাকেও মনে হয় নির্নিমেষ করুণ অঙ্গার
সভ্যতার নাভির ভিতরে—
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আছো, ক্রেমলিনে, যুক্তরাষ্ট্রে
হয়তো বা বৈকুণ্ঠের যৌনমখমলে,
হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়। শুধু কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক
অন্য সকলের প্রতি—যেহেতু বিভেদ
'আন্তর্জাতিক' বলে উদ্যত মুষল—যেহেতু মানুষ
রেডিওর মতো এক অর্বাচীন বক্তার সম্মানে
পরিবারসহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে
নিত্যই সম্পাদক ছাপার কলের সঙ্গে কী ভাবে সঙ্গম করে—
তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ

স্বাধীনতা! তোমাকেই দেখা হল বংশপরম্পরা
নির্মল বীজের থেকে ক্রমাগত পূর্ণ মহিলায়
কেবলই উঠেছে জেগে—কূট পাণ্ডুলিপি থেকে বাৎস্যায়নের
স্বপ্নদূতীর মতো, নিতম্বের বিপুল আঘাতে
ঠেলে ফেলে দাও দূরে পূর্বএশিয়ার চুক্তি পশ্চিমের সাথে
আমাকেও খদ্যোৎ হিন্দুর মতো উড়ে যেতে বলো কালো নাভির ভিতরে
যেখানে অঙ্গার

হে সত্তা, হেমন্তলীন, পাতার ঔরসে
নির্বেদ শূন্যতায় ঝরে যাওয়া ত্যক্ত বিপুলতা,
পাটল খড়ের স্তূপ, অপরাহ্ণ হতে টানা মেদুর কম্বল,
হে সত্তা, কুয়াশালীন, খিন্ন প্রাণীর মর্মে পৌঁছে দাও ভাষা—
উদ্বেল আখের বনে, বার্লিক্ষেতে, যবের কিনারে,
তরঙ্গশাসিত তটে, কাপ্তানের বাইনাকুলারে,
শত্রুজাহাজে, পণ্যে, অন্ধকারে গুপ্ত আর্মাডায়
হে সূর্য, আলোকবিন্দু, একই সঙ্গে প্রসারিত করো
তোমার জ্যোতির থাবা—ক্ষুধা ও চুম্বন।

আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি

বনের ভিতরে আজ সকালের উদ্দেশ্যবিহীন দমকল একা একা ঘুরছে আমাকে টেনে নিয়ে চলো ঐ অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা আমারো আছে স্ত্রী আছেন পুরুষের আয়ত্তে যেমন ফুল আছে দানবীর আয়ত্তে যেমন আমার কয়েকদিন ব্যথা হল বাঁ চোখে এবং ভয় হল অন্ধতা আমার বেশিদূর যাবে কি যৌবনে—না হয় গাড়ির টায়ারচিহ্ন ধরে চলেছি এবার গভীর বনের দিকে দমকল কিছু আগে গেল

যেখানে মরণশীল উদ্‌ভ্রান্ত মোরগ ক্রমে উড়ে যায় মৃত্যুর পরেও লাল টালি-বারান্দায়

—ঐখানে অদিতির কণ্ঠস্বর শুনি আমি, সে বলে যুবক নষ্ট কোরো না বীজ

—ঐখানে নভোরশ্মির শাদা জরিপোশাকের দিকে তাকিয়ে বুঝেছি আমি 'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'

এবং বনের ভিতরে নীল শাখাপ্রশাখার জালে গেঁথে আছে দমকল সেদিনের এই তো সেদিন আমরা ব্যস্ত আছি সব্জির কাজে আর স্ত্রীলোকেরা গোয়ালে ব্যস্ত আছে হঠাৎ খবর এল চলো দেখে আসি

'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'

তোমার সিন্ধুর বাড়ি

ফুলের আঙুল তাকে ঘিরে রাখে। তারা জানে গোপনতা
আমি ঐ আধারে ব্যাকুল, ত্রস্ত চোখে খুঁজি মান্য
তোমাকেই—অজ্ঞাত বছর ফুরালো
এখন কাচের ঢাকা, ভাঙা শিক, নির্বোধের ভুলে যাওয়া রক্তস্বাধীনতা

কারা পেলো? আরো চাই জল, দিও মাটি—
নীরব ফুলের তলে অবিন্যাস, দিও বায়ুর ঝাপট,
দিও সামান্য আগুন যেন সেঁকা যায় হাত,
হাত সেঁকা যায়। দিও জলে ভবা বাটি

ফুলের সাজানো বিত্ত। যদি জানো সব কিছু
তবে কেন, হায় মান্য, তোমাকেই ছিঁড়ে-খুঁড়ে চলে যায় সমুদ্রবাতাস
তোমার গোপন বাড়ি ভেঙে যায়। থাকো মাথা নিচু।

আমার সঙ্কেত আজো তত নেই। সবই গ্রহণীয়,
চঞ্চলতা—বসন্তের গূঢ় ধৈর্য—প্রতিভা আমার
তোমার সিন্ধুর বাড়ি দেখেছিল। অস্থি কি পানীয়?

কুসংস্কার সম্বন্ধে কবিতা

সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা, চাও নাকি সশব্দ প্রস্থান তৃণবেহালার মতো—ধুনুরীর তাঁতের ভিতর থেকে তুলার ভিতরে তুমি চাও নাকি চলে যেতে—আমাকে কি ছেড়ে যেতে চাও তুমি, সবুজ রহস্যময় আত্মা, আমি তোমাকেই খুঁজে ফিরি মাঠে—আমি শ্যাওলায় মাথা কূট প্রদীপের বাটিগুলি খুঁজে পাই এখানে-সেখানে—আজ সকালেই বৃষ্টি শুরু হল—

আমার খাওয়ার ডাক পড়ে—শোনো, কৃষিসমবায়ে আমার অনেক কথা বলবার ছিল—মৌ-প্রজনন নিয়ে পরীক্ষামূলক বাক্স আজ সকালেই আমি খুলে দিয়েছি মাঠের উত্তাল বায়ুর দিকে এবং বাতাস লেগে উঁচুতেও উঠে যায় আমাদের মৌমাছি—অথচ ওদের, জানো, অতখানি ওড়া অসম্ভব—ওরা ছিটকায় নদীর জলে—নষ্ট করে মোম

সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা, আমাকে বিরক্ত করো কেন—আমি শীতের লেপের পাশে নেহাতই রৌদ্রের মতো পড়ে আছি—উনোনে আগুন নেই—যদি বলো 'সারাৎসার' মেনে নেব—যদি বলো 'সহমরণ' আমি শুধু আঙুল নির্দেশ করে দেখাব তোমাকে সপ্তদশ শতাব্দীর নৌচালনার ম্যাপ—আমাকে যথেষ্ট বোঝা হবে কি তোমার—

সবুজ রহস্যময় আত্মা তুমি, বাছা, চলো সন্দেশের বাক্স নিয়ে পাহাড়ের খাদের কিনারে গিয়ে বসা যাক—চলো, আমরাও অভ্রখনির মতো উদাসীন প্রচেষ্টা নিয়ে গল্প করি—বস্তুত, ঐ অভ্রখনির পাহাড়ের পাশ থেকে একদা দেখেছি আমি রাঁচীরোড অরণ্য ও তার নীহার

সবুজ রহস্যময় আত্মা, বাছা, দেহ অবসানে তুমি কী কী করে থাকো, খুলে বলো—আমার তো মনে হয় দ্রুতগামী রণপা খেলার মতো কর্মঠ তুমি নও—তুমি কি শ্মশানে তদ্বির করো শাপমোচনের—তুমি কি বর্জন করো লোহার নোঙর—তুমি কি চক্রতীর্থে ভেসে ওঠো জেলেদের নৌকোর দু'পাশে—সবুজ রহস্যময় আত্মা, আমি পরীক্ষামূলক ভাবে তোমাকে বিদায় দিতে চাই

বোনের সঙ্গে তাজমহলে

সূর্য ডুবে যায় দ্রুত। অগ্নিনির্বাপক
জাল রসায়নরাশি ফেটে পড়ে চতুর্দিকে। আমি তাজমহলের
পৈঠায় দাঁড়িয়ে ভাবি এবার বিশ্রাম
সপ্তর্ষিমণ্ডল এসে দাঁড়িয়েছে তাজমহলের নর্মমিনার ঘিরে
অর্থাৎ বিশ্রাম
অর্থাৎ সঙ্কেতধ্বনি পাঠাচ্ছে ও টুকে নেয় সান্ধ্যবিমান
যমুনার দুই তীরে গাঢ় হয় তরমুজবন
বেলা চলে যায়।

এবার অদিতি আমি তোমারই কোলের কাছে সরাসরি পড়ে যেতে থাকি
ধর্মচ্যুত, আশ্রয়বিহীন
নিজেরই বোনের প্রতি যৌনতা ও উপদ্রব আমি লক্ষ্য করি
নক্ষত্রসন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে শাহীবাগ গম্ভীর আগুন
নিয়ে ক্রীড়াশীল, ক্ষমা নেই, নির্দেশ, অপরাধবোধ
দেখাও অদিতি।

অর্থাৎ আমাকে তুমি সমসাময়িক জাল রসায়ন দিয়ে
স্পষ্ট করে তোলো, কোলে পড়ে আছে গ্রীষ্মের ক্রোড়পত্রখানি,
উপনয়নের তুলা উড়ছে বাতাসে,
তাজমহলের সিঁড়ির কিনার দিয়ে গর্ভবতীদের আমি ক্রমাগত
উঁচু বারান্দার দিকে উঠে যেতে দেখি
এবার বিশ্রাম
অর্থাৎ সম্ভব হল সৌন্দর্য ও সন্তানবেদনা
বিদ্যুৎ পড়ে এল নক্সাহীন ধূসর পাথর থেকে

উৎক্ষিপ্ত হল পাখা মানুষের
মানুষেরই উড্ডীন ব্যথা ঘিরে দেখা হল সান্ধ্যবিমান থেকে
পরস্পর তাজমহলের যুথ, চাঁদ ওঠে পুবে
চাঁদ চলে যায় পশ্চিমের নক্ষত্রবিহীন মাঠে যেখানে প্রবল
ডানায়, নিশ্বাসে, শব্দে উৎখাত হতে থাকে হৃদয় হৃদয়
হৃদয় তোমারই প্রতি যেতে থাকি নর।

বিশাল বাস্তবিক নক্ষত্রপদ্ধতি

যেখানে বালক বসে ছিঁড়ে ফ্যালে নীলদিগন্তের
নক্ষত্র, সিন্ধুর লেখা
তত দূর চলে যায় আমাদের মাতৃস্বসা
টুপিবোনা শিখে নিতে যায়।

●

চাঁদ দেখে মনে পড়ে কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায়

গিরিডির মাঠে ঐ যূথবদ্ধ ইউকালিপটাস
তোমাদের রাজ্যপাল একাদশ মনে হয়।
আমারো খেলার প্রতি টান ছিল—বিদ্যার প্রতিও-
হলুদ নদীর জলে চাঁদ দেখে মনে হল
পয়মন্ত নয় এমন অনেক শেখা বাকি আছে।

লি পো শিখেছিল।

উনিশশো বাষট্টি শেষ হল

তোমাকে বুঝি না তাই না-বোঝায় আমি সারাক্ষণ
হতচকিতের মতো হয়ে আছি। প্রত্যেকে আপন ধর্মে
—ব্যাপকতা—খুদ ভিখারির মতো বুঝে নেয়।
সূর্য বোঝে আপামর জনসাধারণ হতে সেও বেশি দূরে নয়।
যদিও দূরত্ব কোনো পরিমাপ, লক্ষ্য নয়
সূর্যে নয়, মেঘে নয়, ধানক্ষেতে ছুঁড়ে দেওয়া
রাখালের বাঁশিতেও নয়—
গোলা ভেঙে ফসল চুরির আগে চোর জানে ফসলেও নয়–
দূরত্বই বোধ, বুদ্ধি। অপ্রাপণীয়ের
বিস্ময়, মমত্ব, ক্ষোভ। মানুষের যা-কিছু সম্বল।

ফুল তাই গন্ধে আজ আমাদের সতর্ক করেছে।

আশ্চর্য তোমার গান! অন্ধ ছিলে? বধিবতা ছিল?
ডাক দিয়ে বলে গেলে চলো ঐ স্তম্ভের চূড়ায়
চলো ঐ জাগতিক ফুল, ফল, ধর্মের কপাট
ছিঁড়ে, ভেঙে, ডানা মেলে, বাহু মেলে, বাতাসে, সাঁতারে
উজ্জীবিতের মতো, পিপীলিকাভুক ঐ জন্তুর মিছিলে
পুরুষের বীর্যে, রোমে, মেয়েদের পশমবোনায়—

এবার শীতের বনে অপরাহ্ন দ্রুত পড়ে এল।

এবার শীতের বনে অপরাহ্ন চলে যায় দ্রুত।

এবার বৎসরান্তে প্রত্যেকের নাম আমি খাতায় লিখেছি।
তোমাদের সঙ্গে, বন্ধু, নতুন আলাপ হল,
তারো আগে অন্য বহু বন্ধুত্বকে মনে পড়ে
বস্তুত, বনের মধ্যে, নির্বাসনে, কাঠের বাড়িতে
সমসাময়িক বলে কিছু নেই,

যূথবদ্ধ হাঁস, পাখি, শিকারির আনাগোনা ছাড়া।
তাদের কর্তব্য বহু—খাদ্য আর খাদকের পরস্পর কর্তব্য, বুদ্ধির
প্রতিযোগিতাও আছে, শিকারির রাইফেল তেমনই মর্যাদাবান
গত বছরের মতো, শিকারির কার্তুজ তেমনই সন্ত্রাসবাদী গত
দশ বছরের মতো, মানুষের সভ্যতাও বন্যতার পাশাপাশি
পরিবর্ধমান গত সহস্র ঋতুর মতো—

ফুল তাই গন্ধে আজ আমাদের সতর্ক করেছে।

ধাতুর গলানো চাঁদ তরল ফোঁটায় ঝরে পর্বতচূড়ায়।
অন্ধকারে অগ্নিমণ্ডল ঘিরে শিকারির মেলামেশা দেখে
মনে হল সভ্যতায় অনুসন্ধিৎসাও বুঝি শেষ হয়ে গেছে।
অনেক পর্বতচূড়া পড়ে আছে নাম নেই কোনো
অনেক গহ্বর, ভূমি, বনপথ পড়ে আছে নাম নেই কোনো
বহু রাজনীতিবিদ্ চেয়েছিল, পর্বতের নাম হোক তাদেরই নির্দেশে
বহু যোদ্ধা চেয়েছিল, দেশপ্রেমী, এমনকি মুঙ্গের স্টেশনে
খোঁড়া ভিখিরিও চায় তার নামে ছোটো কোনো শহর পত্তন হোক।
প্রার্থনাই একমাত্র—জাগতিক বিপুল নিয়মে
কখনো হয় না পূর্ণ, অসমাপ্ত থেকে যায়—যত দিন
শিকারি বাঘের প্রতি আগুয়ান, যত দিন শস্যের সমাপ্তি নেই,
ক্ষুধার অন্ত নেই, যত দিন তোমাকে যাবে না বোঝা,

ঐকান্তিকতা ছেড়ে বেশি দূরে—কত দূরে যাব?

তোমারই সঙ্গে ঐ রঙিন বেলুন নিয়ে খেলা ছিল জলে।
কালো শিশু, পান করো ঢোঁকে ঢোঁকে ঘরে তৈরি মদ
কখনো খেলার ছলে ছেড়ে দাও উড়ো কীট—চূর্ণসম্ভাষণ
ঘড়ির ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে ইন্দ্রিয়ের তলে—
ঘড়ির ঘণ্টার মতো, ধাবমান, শব্দে মিশে যাওয়া
মৌমাছি-আক্রান্ত চাষি, হলুদ সর্ষে ক্ষেত, সৈকত, সীমানা,
জলের দীর্ঘ রেখা, বালি, ফেনা, সারসের নীড়,
সমস্তই একে একে উজ্জীবনপ্রান্ত থেকে ফেলে দাও।

আশ্চর্য। তোমার গান। অন্ধ ছিলে? বধিরতা ছিল?

শূন্যতা এমন করে তোমাকে বোঝার দায় ছড়িয়ে রেখেছ।
তোমাকে বোঝার দায় মারণাস্ত্রের মতো সঙ্গোপন ফুলের কোরকে
নির্জীব রেণুর পুঞ্জে পালিত রেখেছ।

রৌদ্রকে দিয়েছ তাপ, ততখানি, প্রয়োজন যত।

বৈকুণ্ঠকে, কিছু দূরে, নরকের আয়ত্তের বাহিরে রেখেছ।

স্বপ্নকে যথার্থ থেকে বঞ্চনা করেছ।

অন্ধকারে, মাটির গহ্বর খুঁড়ে রেখেছ কি মদ?

ভালোবাসা থেকে দূরে
রেখেছ কি মদ?

পুরী সিরিজ-য়ের শেষ কবিতা

তারপর ঘাসের জঙ্গলে পড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল শার্টপাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকতো।
সজলের বৌ আর মেয়েটি থাকতো। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদামপাহাড়ে।
আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদামপাহাড়ে।

আবার পুরী সিরিজ

উৎসর্গ

[পরবর্তী নতুন কবিকে]

কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথন
তারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন-তীর শস্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে দেখা মায়ের মতন।

আজ বসে আছি ভোরবেলা রৌদ্র ও হিমসকালের
আবরণ উদ্‌ঘাটনে। এ-প্রহর বাজে না চকিতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান, অলক্ষ্য যাত্রায়,
হলুদ পাতার ঝড়ে, নেমে আসা বাৎসরিক শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি। খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এতদূর গ্রাস করে—দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন
ভয়ে, দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে! দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন।

নীলকুঠি

১

তোমার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত রমণীয় আলোছায়াময় টানা দিনগুলি
গোল বারান্দার দিকে চেয়ে থেকে চোখে জল আসে
উদ্ভিদের, বটপাকুড়ের তলে অপর্যাপ্ত দিন ছিল, রাত্রি ছিল আমাদের
সকালে পায়ের কাছে অ্যাসিডের মতো তীব্র রোদ এসে নামত তখন
জ্যৈষ্ঠে আমাদের ছিল ব্যক্তিগত রমণীয় আলোছায়াময় টানা দিনগুলি
গোশালায় সে-সময়ে কখনো-বা ঝল্‌সে যেত গোরু ও গোয়ালা
বাতাসে নরম মাংস পোড়ার গন্ধে আমাদের বিষণ্ণতা লেগেছিল
দূরে আধো-অন্ধকারে, আগুনে ও সন্ধ্যার মেঘে
ডুবে যেত তোমাদের লাল বড়ো বাড়ি।

২

জামের বনের মধ্যে আমি এক চিরস্মরণীয়
বাঘের হলুদ ছোপে সাথীহারা সন্তান বাঘের
ঘোরাফেরা দেখি। পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের
শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে। সে-সব জামের বন আজ আর
উপদ্রবহীন নয়।

৩

নগরে নগরে তুমি গান গাও রমণীবিজয়ে।
ওদিকে পোকার স্তূপ জমে ওঠে—তারা আজ যাযাবর
স্ত্রী-পাখিদের দলে মিশে গিয়ে বাতাসনির্ভর
প্রাণবন্তের মতো শুয়ে আছে।

যদিও লাম্পট্য নয় ঔপনিষদিক তবু, সাথি, মহার্ঘ রেশম
রেখেছ কাঁধের 'পরে এবং বৃদ্ধের দলে
আধোভাঙা জীবদ্দশায় তুমি ডুবে গেছ। আমি বা কী কম?

যুবার পেশির তলে সদ্যজন্ম, ক্ষুধার্ত ইঁদুর
কবির মনীষা বলো, ছন্দোময়—লক্ষ্য সে-রেশম।

৪
কিছু কিছু ঘোড়া আজ নেই
এবং সহিস একা প্রাসঙ্গিক নয়
এজন্যই ফিরে আসে ঘাস আর ঘাসের জন্ম হয়
শরতকালীন
আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তিবোধ হতে থাকে।

শোভাযাত্রা

১
আমাকে দাওনি তুমি কম্পাসের খল-নির্ভরতা।
ছিলে না পরার্থপর মৃত্তিকার দিগন্তনির্দেশে।
বস্তু হতে অবাস্তব ভূতের আশ্লেষে
ক্রমশ লুপ্ত হয়ে অতগুলি অলৌকিক যন্ত্রের কথা

মনে কি পড়ে না কারো? আকাশে উড্ডীন
শকুনতাড়িত সূর্য হেলে পড়ে কম্পাসকাঁটায়।
বৈশাখ দুপুরে দূর বিমানের ধাতু-আলেয়ায়
বিপুল এয়ারোড্রোম পড়ে আছে বৈমানিকহীন—

উঠেছে গুল্মলতা। বহুকাল অব্যবহৃত
পিচের পথের পাশে জায়মান মৃত্তিকাব শর।
আমাকে দাও নি তুমি স্বর্গ হতে যৌবনে ক্রীত

সহস্র একরব্যাপী অনুর্বর জমি, জল, কম্পমান সাঁকো,
নিরন্ন প্রজার দেশ। তবু আজ গ্রীষ্মের ঝড়
সহসা দোলায় ব্রিজ। পথিকেরে ঐ পথে ডাকো।

২
তোমাদের বাড়ি বড়ো দূরে। তারই আগে বহু বাদুড়ের
বিধ্বস্ত ফলের দেশ পার হয়ে এনেছি খবর
কোনোখানে, কোনো রাজ্যে এত শস্য হয়েছে পরের

কেবলই ঈর্ষা হল, সন্দেহ, রগড়—

এখন তোমাকে ভাবি ছিন্নত্বক ফলে ও ছায়ায়।
জামের মধ্যাহ্নবনে ঘুরে যায় সে-কড়িখেলার
বেদনা-আহত হাসি। অত কড়ি পেয়েছিলে ভালো কি বাসায়?
ভুলে গেছ সে-কালবেলার

গোমড়ক, মন্বন্তর, তপশিলি গ্রামের উৎখাত? আজো জাগরণে
তোমার বাড়ির পথ ততদূর মনে হয়—ওগো প্রিয়, উন্মুক্ত ডানার
লক্ষ বাদুড় ঠেলে যেতে হয় জামের হরণে—

অতিরিক্ত মনে পড়ে পথ-ঘাট, হা-হা বিদ্যমান
আমানি খাবার গর্ত, মনে পড়ে শূন্য ক্ষেত, ভাঙা ভিটা গ্রাম-গণিকার,
দিগন্তে, ধূলির মেঘে, আর্তকণ্ঠ, উপবাসী হাতিদের স্নান।

৩
আফিমবীজের চেয়ে পরিণতিহীন লক্ষ্যে উড়ে যায় শিমুলের তুলো,
মোটা মেয়েদের স্তনবেষ্টনী ছিন্ন করে উড়ে যায় বৈধব্য নারীর
নিঃসন্দেহ হতে থাকি আমরাও—ক্রমশই বদ্ধপরিকর,
যেহেতু এদেশে নেই আফিম তুলোর চাষ, ফেনোচ্ছল ক্ষীর,

এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—
এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—

ফাটা গেলাসের শব্দে আমার মাতৃভূমি-জন্মভূমি নির্মীয়মাণ
যা-তোমার হাত থেকে খসে পড়ে তাই আমি সাগ্রহে ধরেছি
শব্দময় মূর্ছায়, পতনে ও আত্মআবিষ্কারে পেতে আছি কান

তোমাদের মাতৃভূমি-জন্মভূমি কী রকম? তার কিছু বর্ণনা দেবে কি?
তোমাদের রাষ্ট্রে কেউ ঘোষণা করে কি নেমে 'এবার বিকেল',
তোমাদের রাষ্ট্রে কেউ গোলগম্বুজ ছেড়ে নেমে এসে বলে নাকি
'এবার বিকেল—এখনই প্রস্তুত হও? অপ্রস্তুত শেল

ঘরে ঘরে নির্মাণ করেছি।' বোনের, বাবার হাতে ঐ সবই গড়ে ওঠে দ্রুত
মশলা-ঝাড়ার গান থেমে গেলে উৎকেন্দ্রিক কুলো
মায়ের, দাসীর হাতে ঘেমে ওঠে ততোধিক—হায় জাতীয়তাবাদী
কৃমি, হায় শিশুর রুগ্‌ণতা,
আফিমবীজের চেয়ে পরিণতিহীন লক্ষ্যে এই দেশে উড়ে চলে তুলো।

তথ্য

প্রিয় হে, সবুজ ফল,
তোমাকে কঠিন হতে
দেব না, সবুজ ফল,
আমাদের স্বীয়
ভবিষ্যতে দেখা হবে
সে-রকম কথা নেই। আজ
নিশীথের মতো দূরে
সূর্য ও আঁধার
একই সঙ্গে দেখা যায়
যেন উপাসনা ভেঙে দিয়ে
ডেকে ওঠে কাক, প্রিয়, সর্বস্বতার
কিছু আজ পড়ে নেই,
শৃঙ্খল ছাড়া, ঐ
অস্থিগুলি ছাড়া আজ
কিছু আর পড়ে নেই,
ফল, প্রিয় হে, সবুজ তুমি
কীটে নষ্ট হও তবু তোমাকে
কঠিন হতে দেব না আমার
প্রতারণা এই।

চায়ের নিমন্ত্রণ

১

তোমার দু'খানি হাত টেবিলে ন্যস্ত আছে।
টেবিল মানুক
তার তুল্য কিছু নয়। ফাল্গুনের আঁচে
হৃদয় জ্বালিয়ে দেয় স্তন-চিনাংশুক,
অবলীল, অতিরিক্ত হায়
অপরাহ্ণে পাতা হল আরো বেশি চা-টেবিল বনের ছায়ায়।

২

অপরাহ্ণেও আমি মাকড়সার জালবোনা দেখি।
লেবুপাতা গন্ধে নুয়ে আসে

আমার মেয়েরা আজ কোথায়? আমার
স্ত্রীলোকেরা কোথায়?

সহসা নক্ষত্রগুলি বালু থেকে জেগে ওঠে—
সান্তাল, বাঁশি বাজানোই জানো
লেবুপাতা জানে না ও-সব।

৩

বৃষ্টি, কুয়াশা তবু ফোয়ারায় জল পড়ে দ্রুত।
মেয়েদের হস্টেল এক মাস বন্ধই রয়েছে।
বাগানে অনতিদূরে—অর্ধেক জঙ্গলে—
পড়ে আছে ভূগোলদিদির
ভেঙে যাওয়া বিবাহের ছিঁড়ে ফেলা সুতো।

৪

আমি চাই নিজে দিক দেখা
ঐ সন্ধ্যাতারা। যেন নিরুপায়
ঝর্না, বিমানবাহী মেঘে ঢুকে পড়া
দার্জিলিং কুজ্ঝটিরেখায়

জেগে ওঠে। ঘুরে চলে জাঁতি।
আঙুলে সুপুরিফল। রেশম জানালো
'অচূড়, বোকার মতো বসে আছ। পৌত্রী ও নাতি
ছিঁড়ে নেয় জবাফুল লাল আর কালো।'

৫
তাকি হতে পারে তোমার ভ্রূ-ভঙ্গে আমি কপট, চঞ্চল
সামুদ্রিক খেলা ফেলে চলে যাওয়া উৎকণ্ঠিত জল
সরে যেতে দেখি। কোন্ দেশ? লাক্ষা বুঝি-বা।
নাব্য নয়। তরী নয়। রাজমিস্ত্রিদল
ভেঙে ফেলে বনগত বনানী ও বিভা
গড়ে না নতুন কিছু। তোমার ভ্রূ-ভঙ্গে তাই খসে পড়ে ফল।
বনে বনে চিনাংশুকে ঢাকা ও-ঈগল
মিথ্যা হয়। কোন্ পাখি? মানুষী বুঝি-বা।
রৌদ্র লেগে নড়ে ওঠে তির্যক শিকল
অলকদামের প্রতি নাব্য ঢেউ, টানাটানি, ছিঁড়ে যায় জাল
এসেছ বিশাল মাছ, ধন্যবাদ, কোন্ মাছ? মর্মর বুঝি-বা।

তবু ধন্যবাদ। তুমি মাছ নও। ধীবর হিসেবে
কিছু শাপ থেকে গেল। মকর হিসেবে কিছু ব্যথা থেকে গেল।
মানুষ হিসেবে কিছু প্রশ্ন থেকে গেল। যাবে
কোন্ দেশে? কোন্ দেশ? নীলিমা বুঝি বা।

৬
বনের ভিতরে আজ জেগে ওঠে বিহ্বল উপজাতীয়ের বন।
শ্রেণীসমাধির কথা মনে পড়ে।
বনের ভিতরে বন একই ভাবে পর্যুদস্ত হতে থাকে
হতে পারে মুকুলের পত্রবিন্যাসলিখা ততখানি তৎপর নয়।
আমাদের যায় বা আসে না কিছু
আমাদের যায় বা আসে না কিছু
অর্থনীতি বাড়ে কমে। ব্রিটিশবাগান ক্রমে ছোটো হয়ে আসে।
ফাল্গুনের বিকেলবেলায়
বনের ভিতর যুগ্ম কোম্পানির ঝাড় জ্বলেছিল।

৭
ফুলভাবে ফুটছে শিমুল
নতভাবে জাগছে বিকেল
জ্যামুক্ত নক্ষত্রগুলি ফিরে আসছে এই পৃথিবীতে
পূর্বস্থলীর মঠে গান গাইছে সন্ন্যাসিনীদল
আজ অনেক বছর পর
আমিও দেখছি চেটে সবুজ তামার ক্ষার
এবং সকলে জানো ওইখানে জ্বলে নেভে কটু ও লবণ
লাবণ্যসিন্ধুর নুন।

মধু ও রেজিন

১
এবার বসন্তে আমি পেতে পারি সেলাইমেশিন
উঁচু অশোকের ডালে।
আমার ভ্রান্তি হল—নিভে যাক আলোছায়াময় টানা রাত্রি আর দিন
হরিণ বোঝালে।
বসেছ গৃধ্রকূটে, শাল্মলীর বিখ্যাত মর্মরে
হতে পারো রাজা, দৈবী, বিদুষী বা হালে।
আমাকে ডোবালে।
আলোছায়াময় টানা রাত্রি আর দিন হরিণচত্বরে।
রাঁধুনি-নির্ভর আছি। তার নাম কূট মহসীন।

২
আমার আরবী ঘোড়া এবং তোমার
ছোটো ভাই একই সঙ্গে খেলা করে নির্জন খাঁড়ির মুখে, সমুদ্রের জলে।
তাদের মাথার ঊর্ধ্বে হলুদ পাতার স্তূপে আমি পড়ে আছি। নেশাতুর
অপব্যয়ে ঐ সঙ্গে প্রকৃতি আমাকে হলুদ পাতার মতো
ফেলে দিচ্ছে বারবার। আমি ক্রমাগত পাতার সমাধি ঠেলে উঠে আসছি-
(কারণ আমার জীবনের প্রতি আজো লোভ আছে) কারণ একদা
দূরবীক্ষণ নামে আশ্চর্যজনক বিদ্যা আমারও আয়ত্ত ছিল।
তোমার ভাইয়ের তাই জানা আছে। সে তো প্রেসিডেন্সির ছাত্র। নয়

ঘোড়াটিও অত জ্ঞানী! তারা পরস্পর
নিজেদের চিনে নিতে এত বেশি সময় লাগাচ্ছে কেন? আমরা তো
এরও চেয়ে অনায়াসে নিজেদের অনুরাগ জেনেছি।

৩

ধমনী ফুলের ডালি, এসো করি পুষ্পচয়ন।
কেননা ফুলের কাল বড়ো অল্প। তারই আগে বাগান উজাড়
করে যেতে চাই। পেতে চাই অক্লান্ত শয়ন
প্রতিটি ফুলের সাথে—ফুলের জাঁতার

তলে ধাবমান গোধূম, যবের ক্ষেত, প্রেমের জাঙাল
ধমনী রক্তে সব বেঁটে ফ্যালে—কেননা বাঁচার সাধ
জেগে আছে। জাগরূক ওদের প্রহরা। এখন বৎসর ঘুরে যৌনতার কাল
এসে গেল। এসে গেল ক্ষিপ্রতা অগাধ

ঢেউয়ের বিরুদ্ধগামী প্রশাখাবহুল শত গাছের সমাজে
ফুল-ফোটানোর বেলা কখন উদিত হয় কেউ কি তা জানে?
কখন বৃন্ততটে? আদিবাসিনীর সিক্ত চিবুকের ঝাঁঝে

দ্রাক্ষাপানরত আমি জেগে উঠে দেখেছি বিকার
আমাকে ক্রমশ টানে। কাদের সন্ধানে
এসেছিলে, সান্ত্রী তুমি, কোন্ পালিতার?

৪

কংগ্রেস আমলে বহু ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
ব্রিটিশ আমলে বহু ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
বীমার দালালি করে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
গুরুঠাকুরের নামে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
কনৌজ ব্রাহ্মণ বলে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর

তারাশঙ্কর পড়ে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
'দেশ'-য়ে ছোটোগল্প লিখে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
কামানের নীচে বসে ভালোবাসাবাসি হল
আমার ও মাধবীর
এতগুলি কামানের মুখোমুখি ভালোবাসা
আমার ও মাধবীর।

৫

কার্তিক জ্যোৎস্নায় আজ ওড়ে ঐ বিশাল বেলুন।
একা শ্বেত ধূ ধূ মাঠে। স্পষ্ট তাকে দেখা যায়।
রাঁচিরোড স্টেশন পেরিয়ে
আমাদেরই এই দিকে আগুয়ান বিশাল বেলুন।
ও কি চাঁদ নয়? ও কি ঈশপের উড্ডীন শাদা তাঁবু নয়?
প্রচণ্ড বাতাস লেগে রাঁচিরোড স্টেশন এবং
আমাদের পরশ্রীকাতর গোল বেলুন উড়ছে।

৬

যাবার সময় হল। এসো ভাঙি পান্থনিবাস।
এবার ভাঙার মতো বহু অস্ত্র পেয়েছি দু-জন—
ইস্পাত, কাঠের ধর্ম, ছিন্ন বই, ফলের নির্যাস,
মাছরাঙাটির সাথে মৌরলার অখণ্ড কূজন।

অথবা পাই নি কিছু—যা পেলে কাপ্তান
অবলীলাক্রমে ওঠে নিসর্গে ও মাস্তুললেখায়—
শুধু মাথা নিচু করে দিয়ে গেছি অহেতু সম্মান
ইতিহাসউক্ত সব বানরে, রাজায়।

যাবার সময় হল। আজ নেই প্রতীক্ষা আমার।
স্বপ্নে দেখা ভিখারিনী—তাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই—
হয়তো পথের প্রান্তে পথিকের ব্যাকুল আহার,

গ্রীষ্মদিনের স্নান অপারগ জলে ও পাতায়,
সহসা সন্ধ্যা হতে বিবাহের আসন্ন সানাই,
—সবই তাকে দিয়ে দেব। ভাবি আজ পরাধীনতায়।

৭

কুয়াশায়, মেঘের আড়ালে চলো, শাদা হরিণের পিছু পিছু
কুয়াশায়, মেঘের আড়ালে চলো, কলকাতায় টিলার উপরে
শাদা হরিণের পিছু পিছু, আকস্মিক বেলভেডিয়ারে
আন্তর্জাতিক ঢেউ ওঠে নামে। অনেক নিশান
দিয়ে মুড়ে দাও বীজাণুর সম্মেলন। রোগনিরাময়ে
হরিণের মতো আজ আস্থাহীন এই উল্লম্ফন।
তোমাদের অনেক নিশান দিয়ে মুড়ে দাও ঐহিকতা।
ভালোবাসাবাসি নয়, বিদ্যা নয়, লোকাচার নয়,
বন্ধু, তোমারই আঙুল ধরে, করতলে সঁপে দিয়ে চোখ,
চলো, ভ্রাম্যমাণ নাগরিক (চলো, উদাসীন গ্রামের মোড়ল
রোগবীজাণুর মতো) ক্যান্সার-আক্রান্ত স্বদেশে
আন্তর্জাতিক এই সম্মেলন শেষ হলে—গ্রামে ফিরে যাই।

প্রতিহিংসাপরায়ণ পর্দা নিয়ে তুমি খেলা করো

১

আজ আমরা ভারী সেই সব বল নিয়ে খেলা শুরু করি যাতে আমাদের আঙুল বিক্ষত হয়, উত্তর থেকে বাতাস আসে, পশ্চিম থেকে আসে বাতাস এবং উপরে তাদেরই সংঘর্ষে হৈ হৈ ওঠে আরেক খেলার মাঠে, নীচে আমাদের অসৌজন্য প্রকাশ পায় ক্রমশ কেননা বলগুলি ভারী ও আকর্ষণীয় এবং মনে পড়ে পরান্নলোভী সূর্যের পাঁচ আঙুলের নিচে এবারের সমুদ্রবাতাসে আমি খুলি নি জানালা শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি আর বারান্দার কোনা অব্দি সমুদ্রবাতাস লেগে ভরে যায়। লঘু, শ্বেত নক্ষত্র ও বালুকণা গড়ায় ঘড়ির পূর্ব অর্ধেক থেকে পশ্চিমের দিকে। বালুঘড়ি সমাজতান্ত্রিক।

২
পুব হতে পশ্চিমের দিগন্তরেখার দিকে চলে গেছে বেলাভূমি—উপদ্রুত, শাদা।
লাল সূর্যের বল ঘেঁষে জলের নরম ফেনা ততদূর জেগে আছে।
তরঙ্গের ক্ষীণ
প্রতিফসলের দিকে চেয়ে থেকে মনে পড়ে নররেফাবীর উজ্জ্বল তামার যোনিটি
আর গোপন ক্লাবের পথে
বৃষ-মহিষের মতো সমকামী নারীদের একাধিক রবারের উরু নিয়ে খেলা।

টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম

১
শীতের সকাল—নুয়ে দেখেছি গতরাত্রির বাফুনমাতাল—ছুঁয়ে দেখছি কালো পাথর—এই টেবিল আমার নয়—আমার ছিল হপ্তাশেষ ঘূর্ণিনেশা—লাটিম, তুমি সতর্ক নও, ছেঁড়া-তারে জড়িয়ে পড়া ট্রামে ছিলাম, দৈববশে—দু-লাইনের টেলিগ্রাম এই সূত্রে পাঠাচ্ছি যে—টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও।

২
ফেনা ও বুদ্‌বুদে ঘেরা দ্বীপগুলি জেগে ওঠে খেলাচ্ছলে।
আজ শীতের বাতাসে তাই মনে হয় লেখা প্রয়োজন।
যখন আমাকে ডেকে বলেছিল বাজারসর্দার
মাছের নৌকা আর জাল আর জঞ্জাল-আঁশ মেজে সাফ রাখো—
আমি তাই সমর্থনে ছুঁড়ে ফেলি লেখা ও পর্দার
কাপড়ে জড়িয়ে নিই মৃত শিশু—বিদায়—জলের
সরাসরি ঢেউ লেগে কেঁপে ওঠে কাঠের আগুন—খেলা প্রাণপণ।

শীত

১

ছিল একদিন, একদা যখন ছিল 'গীতিকবিতা' এই শব্দের অগোচরে আমরা জেনেছিলাম লিরিক তুমি সরল বীণার কাঠ, তুমি দু'দিনের আয়ু বৈ নও, জানতাম ঐ 'রোমান্টিসিজম' শব্দের অন্তরালে দীর্ঘশ্বাস, হায় তা-ও নিলে অবশেষে, ছিল জিপসির যৌতুকপ্রিয়তা, ছিল কৌতূহল অবশ্যই, নইলে এলাম কী ভাবে এতদুর—

দূরে, সংবাদপত্রহীন প্রবাসেও এসেছিল টেলিগ্রাম এবং বহনকর্তা আমাদের চুপে বলেছিল এ কি প্রতারণা নয় এবং দেখেছি আমাদেরই বাড়ির নলিন সকালের রৌদ্রে একা গাধার উপরে চড়ে নদী পার হল এবং শহরে গিয়ে দেখেছিলাম চমৎকার মল্লভূমি, ছিল আবিষ্কার যা-হোক কিছুটা এবং স্বপ্নের ভিতরে আমি শুনেছিলাম পারিবারিক বিবাহসম্বন্ধ, জানাশোনার ভিতর হলেই ভালো হত—

আজ উত্তরের বাতাস বইছে, আমি পঙ্গপাল-আক্রান্ত গাছের লোল উড্ডীন শিফন দেখি এবং সহস্র পাতা ঝরে পড়ে আমি তাই দেখি, শুধু আকাশে অপরিণত শীতের ভ্রমণকারী পাখিগুলি উড়ে আসে বারবার, আমি বলি : যাও, বনের ভিতরে যাও, যেখানে পাথর আর পাথরের দেবতার ফাটানো মস্তক জেগে ওঠে অতর্কিতে।

২

আরো কিছু দূরে ছায়া ও আলোর অন্তরাল ছিঁড়ে ফেলে সূর্য দেখা যায়,
বুঝি সূর্যে আর লাগে না জোয়ার, যেন লাগে না ভ্রমণ,
তবু সর্ষেতেল রোদে দেওয়া হল—তবু বালতির জলে ছিল স্নান,
শীতের সকালে আজ জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরাল ছিঁড়ে ফেলে
সূর্য দেখা যায় আর দেখা যায় মহীয়ান দেবদারু গাছ।
উভয়েই আমাদের সন্তানের প্রতি যত উপহার এনেছিল
খুলে দেখাদেখি করে,
দেবদারু গাছ থেকে ঝরে যায় পাতা আর ঐ দিকে সূর্যের চাবুক
আছড়ায় ভোরের বাতাসে।

দেবী

১

ঈশ্বরীর গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ তুমি ঈশ্বরীর কোমল সন্তান।
কালো কিন্তু জোড়া উরু—গর্ভ থেকে এনেছ কি কিছু
উপহার—আমাকে দেবে কি কিছু? অনেক মলিন আছি
সারাদিন—ঢাকা আছি পরচুলাময়
আতঙ্কজনক লোমে—দু'পায়ের ফাঁকে।

২

একাকী ভ্রূণের শিশু শুয়ে আছ তুমি। তোমাকে চুম্বন।
নর্মদার জলে আমি অব্যবহৃত ভ্রূণ ভেসে যেতে দেখি।
তোমাকে নদীর বাঁকে কাঠি দিয়ে তুলে নেয় বাগ্দী কিশোর। তাঁহাকে চুম্বন।
চাঁদে ঐ জ্যোতিষ্মান ভয়াবহ গর্ত দেখে আমি ভাবি গর্ভের দুয়ার।
যদিও ডালিম তুমি, চাঁদ ও গ্রহের মতো পরধর্মময়
বস্তুত তোমার মুখে পৃথিবীতে জন্মাবার স্বেদ লেগে আছে।
রক্তনাড়ীর গ্রন্থি কেটে দিয়ে বৈদ্য ও মানুষ
স্রোতের উল্টোদিকে যেতে চায় তোমার ভেলায়—
ছুরি-কাঁচি সঙ্গে নিয়ে নর্মদার জলে তারা শিখছে সাঁতার।

রঙিন সান্তাল ছবির বিচ্ছুরিত পিতল

এবার হেমন্তে আমি হলুদ পাতার নীচে ছুঁয়ে দেখছি নমনীয় নব-আবিষ্কৃত এক ধাতু, তার স্প্রিং, তার প্রসারণশীলতায় আমি আগামী বসন্ত অব্দি লাফাতে চেয়েছি, আমি ছুঁয়ে দেখছি গাছের সবুজ পাতার ভিতরে বয়ে যাচ্ছে ছল ছল শব্দে নিশান, সে-ই বহন করে নিয়ে চলেছে শত শত আলপিন—শিকড় থেকে ফুলের জানুর ভিতর অব্দি

আমি ঐখানে সোজা হয়ে বলছি : বোঝা গেল তোমার আহ্লাদ। বোঝা গেল তোমার পরিণতি বলে কিছু নেই—শুধু বারবার গভীর ফাল্গুনে স্ত্রীলোকের মতো (যেন বা মায়ের মতো, স্ত্রীর মতো, উন্মাদের শপথের মতো, স্ত্রীলোকের গর্ভ-উন্মাদনার মতো) তুমি ফিরে আসছ সময় হলেই।

রা-রা-রা ডিমোক্রেসি

মাতালদের সঙ্গে ধুলোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া অপরাহ্ণে বেশ্যাপাড়ার দিকে আমাকে ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তোলে এবং মাছির কথা ভুলিনি—সেজন্য দু'মুহূর্ত মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার দাঁড়াতে হল—বেলার জন্য কচুরি এবং অপরাহ্ণেই আমি ব্রণসমেত বেলাকে পেতে চাই বাথরুমের ভিতরে

আমার ভিতরে তখন বাঁশির নিরাপত্তাবোধ জেগে উঠেছে এবং প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে সুরেন মাতাল বলছে : ভাই, আমার ভাই। আসলে আমি বুঝতে পারছি কাকে বলে বিদ্রূপ যেমন বাঁশি বোঝে বিবাহের রাত্রে অসংখ্য ঠোঁটের ফাঁকে গড়িয়ে পড়া কষ

আমি মিলিটাবিদের দিকে তাকিয়ে আছি—আমার যাবার কথা বেশ্যাপাড়ায় কিন্তু পুকুরের চারিদিকে ঘুরছে মিলিটারি এজন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ—দুপুর থেকেই আমরা চেষ্টা করলাম বাজার, সিনেমা, শোভাযাত্রা, কবরখানা, স্টেশনরোড অতিক্রম করে বেশ্যাপাড়ার ভিতরে জামরুলগাছের নিচে তক্তপোশ পেতে বসে থাকতে চাইছি এবং একজন দু'জন করে যেতে পারি বেলার পৌরুষের/নারীত্বের দিকে

কিন্তু আমার ভয়াবহ হ্যানিম্যান স্মৃতিবার্ষিকীর কথা মনে পড়ে গেল—মনে পড়ল অনেকদিন আগে লিখেছিলাম 'দেহাবসান' অর্থাৎ ঐ নামেই একটা চিঠি লিখেছিলাম—এবং ঐ সংখ্যাতেই যে-নাস্তিক্যবাদিনীর লেখা ছাপা হয়েছিল তার নাম রেখা ভৌমিক : লেখিকা · বই : ব্যবহারিক বঙ্কিম—আলোচনা হিসেবে আমিও ভেবেছিলাম অনেক—আজ সংক্ষেপে মনে পড়ে 'তৃণ তুমি, স্বপ্নাচ্ছাদিত আত্মা, শুধু বহিরাবরণ নও'

এবং আমারই চোখের সামনে দৃশ্য/অদৃশ্যের মতো খুলে যায় দৈবী নদ—যেখানে ওপার থেকে হেঁকে ওঠে সামন্তদের শাল-ইজারার কর্তা : সামাল হে সামাল। কেননা জলের স্রোতে ভেসে আসতে থাকে পাটাতন—মফস্বলে বেশ্যাদের বাড়িগুলির চারপাশে ঘূর্ণিজল বেড়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

ছিল চাঁদ, যাব বহুদূর

১

জয়ন্তী নদীর চরে খরদ্বিপ্রহরে এক পাগল উদাসী
খুঁটে তুলছে কন্দফল। মানুষকে ভালবেসে, মানুষকে ঘৃণা করে
অল্পই লাভ হল—সামান্যই ক্ষতি হল তার
এবং নদীর চরে ধার্য ফল হাতে নিয়ে বলেছিল : উঠেছ প্রকাশি!

বাতাস থেমেছে দূরে। কাছাকাছি দেখা যায় তারা।
লঘু সেই পুরুষের অনায়াস চলে যাওয়া সন্ধ্যার পানে,
যেমন প্রয়াসী প্রাণ টলে যায় ক্রমাগত জীবন্মৃতের মতো
জীবনেরই দিকে—চিন্মোহন গরাদ, পাহারা

ভেঙে ফেলে আসক্তি-অতীত তুমি পাগল উদাসী
এতদূর এসেছ যে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব—
আমি চাই ষড়যন্ত্র তোমারই মতন প্রিয়, অপ্রিয় পুরুষ,
তোমার বাক্স থেকে কেড়ে নিতে চাই আমি ন্যূনতম বাঁশি

এবং গানের বহি, টানা খাতা, সংগীত-প্রণালী,
'গুরুর আদেশ বিনে'-লেখা ঐ পিতলের থালি।

২

প্রচণ্ড সূর্যের নীচে সমস্ত দিনের কাজ শেষ হয়ে যায়।
লাটবাগানের বন অন্ধকারে ভরে ওঠে, প্রিয়,
তখনই দারিদ্র্য আসে, হাত রাখে হাতে,
নরম গাছের তলে আবিষ্কৃত হতে থাকে সিপাহীর উনোন, কবর।

৩

শান্তি বেগমের কাছে দু'টি বাঘ বসে আছে চুপে।
একটি পুরুষ আর আরেকটির ভঙ্গি দেখে বোঝা দায়
ও কি পুরুষ না মেয়েছেলে

আমার লেখার খাতা ছিল ছ'টি
একটি কবিতা আর সাতটির সমুদ্রফেনার দিকে চেয়ে মনে হয়
ও কি কবিতা নাকি আমাদেরই শ্রম-বিনোদন

আমাদের কুঠি ছিল তারাপুর মোহনার জলে—
ঐখানে প্রতিদিন বীজাণুনাশক তেলে রাঁধা হত সান্ধ্যভোজ,
আমাদের ক্ষেতে কোনো মর্মরের অদিতি ছিল না
ও কি শেজবাতি নাকি আমাদেরই প্রসব-বেদনা

এখন এসেছি নেমে দুপুরের জিমখানা ক্লাবে
চুরি আর চোরা-আসবাব তারই গল্প শোনা হল
ঘোড়া আর ঘেসেড়ার প্রতি গ্রীষ্মবাতাস লেগে নুয়ে পড়ে ঘাস
শান্তি বেগম একা উঠে যায় নভ-বাথরুমে।

পিপাসা

শাদা হাত জলের ভিতর আঁচড়াচ্ছে নীল জল।
খোঁড়া ফৌজদার দুপুরের অবসরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে অমীমাংসিত ক্রাচ,
স্ত্রীলোকের জন্য তার লোভ শর্তহীন—

গোলমরিচ গাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি গোলমরিচ

যে-সব হাসপাতালে আমাদের বাপ-মায়ের সৌখিন অসুখ আরোগ্য হয়েছিল
সেই বাড়িগুলি আর নেই

আমি কান পেতে শুনছি কোলাহল, শোভাযাত্রা, দৈববাণী—
স্ত্রীলোকের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই মহাউৎসবের দিনে

ধ্বংসস্তূপ, সমুদ্র, পাথর ও বৃষমহিষের মূর্তি—তাদের মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে
পানীয় জল

তখন আমারই যাতায়াতের পথে পড়ে হাঁস ও রৌদ্রের দারুণ মেলামেশা—
মধ্যাহ্নভোজন ক্রমেই জটিল হ'য়ে দেখা দেয়।

তেরজা রীমা

হৃদয়ের থেকে আজ সৌন্দর্য উঠেছে জেগে মেরুদূরাতীত
রোহিণী নক্ষত্র ক্রমে কোলিয়ারী অঞ্চলের শেষাশেষি চলে যায়
ভূত ও ভবিষ্য থেকে সৌন্দর্য উঠেছে জেগে—স্বাধীন, অতীত

কোলিয়ারী অঞ্চলের প্রতি কোনো আস্থা নেই। অরোরাবিভায়
বিভ্রান্তিজনক ধাতু, তেল ও সাবান ক্রমে স্পষ্ট ফুটে ওঠে।
বিভ্রান্তিজনক গোল ফরাসী-শেখার ক্লাসে, উঁচু দরজায়,

হেমন্তকালীন শাদা খড়ি দিয়ে আঁকা হয় সৌন্দর্যবোম্বেটে।
অমন সৌন্দর্য আমি হাতে পেলে চলে যাই নবদ্বীপ
আবিষ্কার-করা আর আবিষ্কৃত-হওয়া থেকে উল্লাসের চোটে

পরস্পর চিঠি লেখালেখি অব্দি থেমে যাক। ট্রাক্টর, জীপ
পরিকল্পনার মতো কবিতার কালো ক্ষেত চষে খায়। ছিঁড়ে যায়
আধোঘুমে মশারির পায়ের দিকের পাড়। ভালো নাগরিক

হতে চাই। নবদ্বীপে, ফরাসী-শেখার ক্লাসে, বকুলবাগান থেকে চৌরঙ্গী পাড়ায়
হেমন্তের কোনা ধরে শুয়ে আছি এবারের সৌন্দর্য ও মশার জ্বালায়।

হে রাত্রি, আঁধারমথ

হে রাত্রি, আঁধারমথ, এসো কিছুক্ষণ নক্ষত্রের দেখাশোনা করি।
সমস্ত আকাশ ভেঙে একে একে উঠে আসে ওরা।
বাতাস শান্ত, নীল। সমস্ত পাহাড় ভেঙে একে একে উঠে আসে ওরা
নিদ্রিত শিশুর মাথা স্বপ্নে, চুলে, মাছের কাঁটায়
ভরে আছে। আঁস্তাকুড় থেকে তুমি উড়ে এসো, ছাইগাদা থেকে,
হে রাত্রি, আঁধারমথ, হে দূরবীক্ষণ,
কেবল পচেছে হাড়, ভাত, হাঁড়ি, এঁটো কলাপাতা,
সভাপতি আমাকেও বলে গেছে : 'লিখে যাও, লিখে যাও শুধু,

অমুক কাগজে আমি কবিতার সম্পাদক।'
এর বেশি আর কী-বা চাই!
কেবল উন্মাদ ডানা, ভুল, ভয়, অতি-অলৌকিক
গম্ভীর আকাশীঘণ্টা, তুমি কেন ডাকো?

যুদ্ধের ডাক এসেছে

১

বহুদূরে স্বপ্নদিগন্তের কাছে এবারের পাখি ও মানুষ
সরাসরি ঝাপটায় ডানা, সম্ভবত আমাদের যাবার সময় হল।

তোমার আঁচল যদি বাতাসে জড়িয়ে পড়ে কে খোলাবে জট—
আমাদের যাবার সময়ে তুমি তাহলেও এনেছ ফানুস।

ধন্যবাদ। একা ঐ ছাদে উঠে দেখি টব আপাদমস্তক
নৈশ-আগুন লেগে জ্বলে যায়—দেখি কূট, মরে-যাওয়া শাখা,
মারোয়াড়ী কৃষিবাগানের নিচে, অন্ধকারে, বিড়ালীও দ্যাখে
অতি কাছে আমাদের দ্রুত-ওড়া ডানা ও শাবক

পড়ে আছে। সোনার নৌকা, তুমি নিয়ে যাও যা-কিছু সম্ভব,
সোনার বিড়ালী, তুমি নিয়ে যাও মেয়েদের, শিশুদের নিয়ে যাও,
খুন করো, খোজা করো, মুছে ফ্যালো উল্কির লিখা
ফেলে দাও ধানক্ষেতে, নদীজলে ব্যবহৃত শব—

বহুদূরে স্বপ্নদিগন্তের কাছে পেয়ে গেছি ডানা
অশ্রুবিন্দুজালে-ঘেরা অন্ধকার আমার বিছানা।

২

হেসপারাস, আশ্চর্য নক্ষত্র তুমি, এখনো এলে না
ওদিকে বিকেল ক্রমে পড়ে এল—মহাদেশ ফেটে যে চৌচির
বিড়ালীর বাঁকা নখে—বিড়ালী কি নাবিক তোমার?
তোমার সন্তান? সেনা? সে কি এ-জন্মের তিরস্কার?

হেসপারাস, আশ্চর্য নক্ষত্র তুমি—আমার চৈতন্য
আলুথালু, সম্মান পায় নি তত, তুমি কি তোমার
প্রাপ্তবয়স্ক বুড়ো ছেলেদেরও দাসীবৃত্তি করো? নিখিল আকাশ
হাসপাতালের টানা অকৃত্রিম মেঝের মতন

সমতল—দু'একটি ধাত্রী তাকে ধুয়ে মুছে রেখেছে এবার।
ধন্য তুমি। সন্ধ্যার ঘণ্টা আর শোনো না শিবিরে।
মহাদেশব্যাপী গোল বিছানা ও কাঁটাতারে জ্বলন্ত বিমান।
আশ্চর্য রমণী তুমি, উপস্থিত নও আজো, দেরি হল

শুধু ঐ সামান্য সাঁতারে রোগ থেকে উঠে আসা—
তা'ও দেরি হল? বৈধব্য ও অরুন্তুদ ছেঁড়া পাতা
একই সঙ্গে উড়ে যায়, হেসপারাস, সন্ধ্যাতারা তুমি
এখনো এলে না—তবু বেলা পড়ে এল।

দাঙ্গা

শহরে, শীতের রাত্রে ঢুকে পড়ি একা, হেঁটে ঢুকি কলকাতায়, অথচ
ধর্মাবতার, আমার অভ্যেস ছিল ট্রেনে ফেরা, ব্যতিক্রম হল এই
প্রথম, লক্ষ্য করুন,

জিনিস বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই, ছোটো থলি, এবং পানের দোকানের
পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম নৈশ-ইস্তাহার,
লক্ষ্য করুন, সেই প্রথম আমি খবর পেলাম, আপনাদের
দেশের বিপুল আন্দোলনের খবর পেলাম, সেই প্রথম আমার
মাথার মধ্যে হাহাকার বেজে উঠল, নিজের বাড়ির জন্য
টান দেখা দিল, হুজুর, দেখলাম

মেষপালকের মৃতদেহের উপর ক্রন্দনরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—
এবং আগেই বলে রাখা ভালো
আমি চাষিদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম এই ভেবে যে
তারা মধ্যবিত্তদের চেয়ে অধিকতর জটিল

ও পরিসংখ্যানজাত—
'কথা বলো' এই জলছাপ-সমেত কয়েকটি চিঠিলেখার কাগজ
আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম-বা,
ছিল চমৎকার আরকে ভেজানো ডাকটিকিট, লিখলাম—
'ইন্দ্রাণী, আমাকে তুমি ফিরে দাও প্রত্যাখ্যাত ছোরা,
অন্ধকার হয়ে আসে—পড়ে আছি আমি আর ধর্মীয় স্ক্রোল—'

এবং শুনলাম আর্মেনীঘাটে প্রথম নগরসংকীর্তন
তখন আগুন জ্বলছে এখানে-ওখানে,
আরো শুনলাম বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো খবর—
হুজুর, লক্ষ্য করুন, আমি সেই মানুষ যার করণীয় কিছু নেই
শুধু পাখিদের আহার জোগানো ছাড়া
শুধু সিঁড়ির মার্বেলগুলি সাফ রাখা ছাড়া অতিরিক্ত
কাজ কিছু নেই—
ছিল অবশ্য চাষজমি, কোম্পানিকাগজ,
ছিল শহরে-বন্দরে বেশ তদারকি, ছিল বীরেনবাবুর চিনিকল—

কিন্তু আমি দেখেছিলাম গাছ থেকে খসে পড়ছে
পাখি ও পালক—তার ছিঁড়ে ফেলা নীড় আর মৃত সন্তান আর
ফেটে যাওয়া ডিম—দেখেছিলাম ইস্তাহার উড়ে আসছে পিছু পিছু।

আগুন আগুন

১

তোমাদের বিচালিগাদায় আমাকে দিয়েছ ঘর—গ্রীষ্মে এতে আগুন লাগাব, জেনো, এই গ্রীষ্মে—আমি নিরুপায়—তোমাকে লাফিয়ে যেতে দেখব তোমার পুকুরের জলডিঙিটির দিকে—তোমার অস্বাভাবিক খাঁচার চকোরগুলি নষ্ট হয় হোক—পুকুরের শাপলায় তুমি নষ্ট হও—

আমার হারানো চাঁদ ফিরে আসে শিকড়সমেত—মৃত ইঞ্জিনড্রাইভার ফিরে আসে—ভয়াবহ রেলবাঁক জলের কিনারা অব্দি প্রসারিত হয়—চাঁদ, দ্যাখো দুর্ঘটনা,

আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ঐভাবে নষ্ট করো তুমি—পড়ে থাকে ফাটা কাপ, রক্তাক্ত চামচ—খবরকাগজে-মোড়া ভারী চাঁদ নিভে যায় বিঁচালিগাদায়--আগামী গ্রীষ্মে আমি পাব তেল, দমকল, পাব তার্পিনদাহ্যতা।

২

পাতা কুড়ানো খেলা তোমার, প্রবঞ্চনা—পাখির ঘর খেলাচ্ছলে নষ্ট করা—হাতে সেলাই ঝাড়লণ্ঠন—শানবাঁধানো বনের তলা—বিয়ের দিনে কাটা মৃগেল—খেলা তোমার নষ্ট হোক—আমরা উঠি সমতলে—আমরা উঠি উপত্যকায়—যেখানে নীল রবারগাছ, গন্ধতেল—দু'চারদিন স্নানসাবান বন্ধ আছে—জ্যোৎস্না নেই—জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে থাকা করুণাহত সেলুনগাড়ি একা একাই দাঁড়িয়ে আছে মালগুদামে—

তোমার খেলা আমি জানি, ঈগল জানে—জয়ঈগল উড়ছে আজ মেঘের কোলে—আমরা যেন চেয়েছিলাম যেতে তোমার দার্জিলিঙের রাজভবনের পিছন দিকে—চকোর বলে সত্যি কোনো পাখি বা মাছ রইল কিনা জানতে চাই—

দেখতে চাই সমতলের খঞ্জ গোরু কেটে এখন মাংস যারা বিলোয় তারা কোন্ গাঁয়ের—কোন্ বাগানের বর্গাদার শিস দিচ্ছে রবারগাছে—ঐ বাগানে হঠাৎ ঢুকে মনে পড়ল ব্রাহ্মসমাজ--রঙিন কাচে সকালবেলার রৌদ্র নামে এখানে আর ঐ কিনারে বিশাল ঘরে পাতা কুড়ানো খেলা তোমার শুরু করছ, আদরিণী, বাতাস আজ বইছে এলোমেলো।

প্রিয়তমা

প্রিয়তমা, তোমার চুলের
ভিতরে দেখছি আমি ভারতীয় ভূমিজরিপের যন্ত্রগুলি
ঐখানে অরণ্যশহর ঘিরে গড়ে ওঠে
মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা আর হেমন্তের ভূ-বিজ্ঞান।

প্রিয়তমা, তোমার দু'খানি চোখ
হোমিওপ্যাথির মতো করুণানির্ভর।
প্রিয়তমা, তোমার দু'খানি বাহু আমাকে কেবলই ডাকে।
কৌঁসুলি মোহনদাস উত্তমাশায়
ঐ মতো বুঝেছিল স্বদেশ ও স্বাধীনতা—দেশে ফিরে চলো।

প্রিয়তমা, দেখছি তোমার কালো স্তন,
দেখছি এবার ধর্মপ্রচারকগণ
সেঁটে দিচ্ছে ইস্তাহার
দেখছি তোমার কালো স্তন ভরে যায় ধর্মীয়
দ্রুতলিখন অক্ষরে—

প্রিয়তমা, দেখছি তোমার ধৈর্যহীন উরু
ভিতরে দেখছি আমি পরিণতিহীন ডুবোনৌকাগুলি
নিয়ে আসে
আত্মীয়-সমেত মৃত উকিলের দল,
আমাদের
উদয়াস্ত স্ত্রী ও জননীদের নিয়ে আসে—

প্রিয়তমা, দেখছি তোমার স্বপ্নাহত কৃশ পা, আমার
স্বপ্ন বুঝি মনে হয়, কারণ এবার
অসময়ে নৈশ বিরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে—
সান্ধ্য ক্লাস ছুটি হয়ে যায়।

রাজকমলের স্মৃতির উদ্দেশে

কাঠুরেদের মতো মনে হয় আমারও প্রতিশ্রুতি ছিল বন্য ও আরণ্যসম্পদ হেলায় অগ্রাহ্য করে আমি শহরে এসে বুঝেছিলাম আমার প্রতিশ্রুতি ছিল নিতান্তই নাগবিক অর্থাৎ আমি রাজকমলকে লিখেছিলাম ভবিষ্যতে দেখা হবে, তখন দু'জনে মদ মুখে রেখে কথা বলব কাকে বলে মদ, তখন কবিতা সামনে রেখে কথা বলব স্বপ্ন কাকে বলে, অথবা কিছুই ঘটবে না সেদিন, তৃতীয় যে-কোনো লোকের কথা মন দিয়ে শুনব সেবার, মাতৃসদনের সামনে হাওয়াগাড়ি দেখার সিদ্ধান্তে বহু বালকের ভিড় হল, খুঁড়ে তোলা টেলিফোন গর্তে তারা নেমে গিয়েছিল, কিছু একটা ঘটবে তা হলে, কী বলেন? নিশ্চয়ই : আমি বলি, এবং বেসরকারি দু'একজন দারোয়ান, দর্জি, উকিল, ভারপ্রাপ্ত নিম্নবেতন সকলেই বেশ তুমি কবে আসবে এই ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল পথে, সেদিন ডিসেম্বর উনিশ, এই শালা মুখ খারাপ করবি তো মারব টেনে, বেশ ছোটখাটো গোলমাল চলছিল চৌমাথায়, আমার মনে পড়ল এই ক'টি লাইন : আমাকে অতঃপর/আরো বহুদিন/সূর্য ও নিশীথ/মেরুপ্রদেশের হিম/সযে যেতে হবে/আমাকে আমার নিজ/শরীরের

সৎকারে/কিছু জমা দিতে হবে : তখনই এসে পড়ল বিরাট শবযাত্রা, তার পিছনে কলকাতায় নতুন জলের গাড়ি কে. এন. রাও যাকে বলেছেন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র প্রতিমূর্তি, যার পিছনে ছিল তহবিল তছরুপের বিরাট মামলা, সামনে এক মন্ত্রীর মৃতদেহ, দু'পাশে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আদর-আবদার, তখন শীতকাল, বহুদিন আগে উড়ে এসেছিল শীতের হাঁস কুরুক্ষেত্রে যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন এবং হিমালয় থেকে গঙ্গাদেবী তাঁর সন্তানের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন একদল শাদা হাঁস, তখন শীতকাল, ভূমিতে অর্জুন নিক্ষেপ করছেন তীর এবং সেখান থেকে উঠে আসছে জল আর আকাশে উড়ে আসছে শীতের প্রথম শাদা হাঁস তখন।

ভোর থেকে দেখেছি আগুন

'তুমি বিবাহিত, নাকি আনুষ্ঠানিক'—এই প্রশ্ন করেছিল প্রেত। আমি বরাবর রাস্তার উপরে হেঁটে দেখছিলাম পথ শেষ হয়ে যায় গাছের বিচূর্ণ রঙিন জালে যেখানে সমাধি আর প্রসূতির হাসি আর রক্তমাখা প্রেত, তার ভয়াবহ প্রশ্ন ও বিচার

'এই নবজন্ম, আমার ব্যক্তিগত বিছানা ও দুধের বোতল', বলেছিল প্রেত এবং চমৎকার শাদা দেওয়ালের প্রতি চোখ রেখে আরো বলেছিল, 'পিতা, তুমি খরশান, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে'

ঐখানে শত শত শূকর ছাগল মেষ ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে আমাদেরই জন্য নিয়ে আসে রক্তাম্লতা ও কিলোওজনের অর্ধেক চাঁদ

তুমি লাফ দিয়ে ওঠো, খড়্গ, আমি সমুদ্রফেরীর গান ভুলে যেতে চাই, তবু নীচে বাড়ির উঠোনে শেষরাত্রির মাংস স্তূপ করে রাখা হল, শব্দহীন ভোরের বাতাসে জল কল থেকে পড়ে যায়, সোমবার বিকেলে আবার দেখা হবে, ইতিমধ্যে আমাদের উৎসব তাই ছুরি-কাঁচি-সান বসেছিল—'খড়্গ, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে'

আমার মাথায় আজ জমে ওঠে জঞ্জাল, যেন বান সরে গেছে ঢালু আঘাটার দিকে, যেন পরিত্যাগ, আমি খুঁজে পাই সোডাবোতলের ছিপি, তাই আবিষ্কার মনে হয়—মাতাল হিসেবে আমি প্রতিশ্রুত—মাতাল হিসেবে আমি কিছু গান ভেবে নিতে পারি—আমি ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে স্ত্রীলোকের কানে মুখ রেখে বলি : তুমি কংগ্রেস।

আজ চৌষট্টি সালের শেষ দিকে যা নড়ে উঠছে, হেঁটে ঘুরছে, যা অস্বাভাবিক লোমবীজাণুর ভিতরে ডুবে গিয়ে বলছে : তুমি কোথায় (আমি বলছি : ঘৃণ্য তুমি) তারাই ক্রমশ মিলিয়ে যাবার আগে নষ্ট করে দিচ্ছে এই অন্ধকার—এই ধ্বংস ও সূর্যোদয় একই সঙ্গে।

সেলাইমেশিন

স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে
লেখাজোখা নেই,
আমি তো ছিলাম স্বপ্নে—জাগরূক বসন্তনিখিলে,
হায়, ঝর্নাজলে সেই
গ্রামোফোন বেজে ওঠে—ঘোরে নিচু সেলাইমেশিন
স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে
ভাবি সারাদিন—
স্বপ্ন ফুরায় আর সময় ফুরায় আর সামান্যই থাকে,
দু-চার বসন্ত আমি ঘোরালাম সামান্য লেখাকে।

স্বাধীনতা, প্রিয় স্বাধীনতা

এখানে লিখিত হোক সাল আনুমানিক
চৌষট্টি ও বিংশ শতক
প্রিয় কবিদের শুষে নেয় খবরকাগজ
আর তন্দ্রাহীন মাংসের শিক
চোখে যেন বিঁধে যায়—

ফাঁসির মঞ্চে বসে কাটে নখ
ক্ষুদিরাম—স্বাধীনতা এখনো উন্মন করে
আঁস্তাকুড়ে পচে ওঠা সার শুধু
জমেছে শহরে—

বার্লিদেবতা আর ধানের দেবতা আর গমের ঈশ্বর :
—ডাকে অরণ্যতক্ষক।
আমাকে লিখতে হল সাল আনুমানিক
চৌষট্টি ও রক্তমাখা নখ।

ন্যূনতম কবিতা

ধন্য ধন্য হে তুমি নবাবিষ্কৃত ডুমুরগাছের তলে উপাসনারত
তাই প্রশ্ন ছিল পথিক যাই পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে নীলাচলে
বর্ষা শেষ হয়ে এল, কী সংবাদ, এবার হেমন্তে সাঁই নষ্ট হল মেলা
ধন্য ধন্য হে তুমি নবাবিষ্কৃত ডুমুরগাছের তলে উপাসনারত

তিন মাস পাল্কি নেই, চড়নদার এসেছিল, ফিরে গেছে,
আমরা আসছি নেমে, দেরি হল, তউবিল সম্ভাবনাহীন
এবং মন্দির থেকে সরাসরি বাঁশপাতা উড়ে যায়, যখন বিরত
জল ফুলে ওঠে নীল বাঁধে, বৃষ্টি হল, সাংসারিক বৃষ্টি হয়

ধন্য ধন্য হে তুমি নবাবিষ্কৃত ডুমুরগাছের তলে উপাসনারত
তাই প্রশ্ন ছিল পথিক যাই পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে নীলাচলে—
যাই, চাঁদের নীচে দৌড়ে চলি, চাঁদ খবর আনে দুঃসংবাদ,
মৃত্যু আর বান্ধবের মৃত্যু আর সহমরণ সে তো হাতের পাঁচ
ঝাঁপিয়ে পড়ি সাগরজলে যখন ওঠে চাঁদ কেবলই মরার কথা মনে পড়ায়।

অপরিসীম কবিতা

পারস্য কার্পেট তুমি
জানো অবিচ্ছিন্ন ফুলগুলি ভালো নয়
তাই নকশাপাড় হতে থাকে
আঙুলের ফাঁক দিয়ে
বসন্তরজনী আর
বসন্তরজনী
উড়ে আসে
সরাসরি দ্রাক্ষাপতঙ্গের
ডানা ছিঁড়ে-ফেলা ডানা
জাল ঘিরে দাও
জানালায়
অর্থাৎ মোচন করো
তুমি
নিক্ষেপ করেছিলে
ঐ ক'টি পাতা
ফাল্গুনের তাপে রাজ্ঞী
খুলে ফেলা
পাতা আর স্তন-আবরণ
আর ছুঁড়ে-ফেলা তীর
নর্গিসকান্তারে
দেখা হয়েছিল
নিক্ষেপ করেছিলে ঐ ক'টি পাতা
দ্রাক্ষা হতে
উতরোল সুতিবস্ত্র খসে পড়েছিল।

এ-সপ্তাহটা কেমন যাবে

আবার আমার মুখ ভেসে উঠছে আয়নায়—দাড়ি-কামানোর আগে আমার মুখের সঙ্গে অত্যন্ত রগুড়ে চাপা ভালোবাসাবাসি হচ্ছে পরস্পর মুখোমুখি—অর্ধেক সাবান-মাখা, অর্ধেক মেরে-আনা এই সাপ্তাহিক মুখচ্ছবিটির দিকে তাকিয়ে এখন আমার কবিত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র বড়ো বড়ো কথা ভাবছে—অথচ কবিত্ব নাকি ভালো নয়—

আর সব ভালো—যেমন, বাজার করা ভালো, চিঠির উত্তর দেওয়া ভালো. মা-বাপের আন্তরিকতা ভালো গোল হয়ে খাবার টেবিলে বসে—উড়ো জাহাজের তো ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে—নতুন, বিস্ময়কর ধাতুদ্রব্য খুঁড়ে তোলা হচ্ছে না যদিও, তবু এটা-ওটা মিশিয়ে এমন কম কিছু রহস্য চলছে না—

কাঠবিড়ালীও আপন উরুর ফাঁকে চুমু খাচ্ছে—যে-কোনো সপ্তাহে আমাদের আত্মউপলব্ধি হতে পারে—আমাদের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতিষ্মান জড় দেবতার থালা দেখা দিতে পারে—বুদ্ধদেব বসু যদি আমেরিকা থেকে ফিরে না আসেন তবে এই কথা তাঁকে আর চট করে জানানো যাবে না—আমি তো মুর্শিদাবাদ চলে যাব এই আশ্চর্য জিনিস দেখাতে—কবে ফিরব ঠিক নেই—জৈনদের পয়সা খাব—অন্তত তিন-চার বছর আমি কবিত্বের ভালোমন্দ থেকে দূরে গিয়ে, রাঁচি-হাজারীবাগ রোডের উপর একাকী দাঁড়িয়ে এ-জন্মের গতানুগতিক ক্লান্ত মুখচ্ছবিটির জন্য চাক্ষুষ অশ্রুবিসর্জন করতে পারব বলে মনে হয়।

চিঠিপত্র

১

আমি স্বেচ্ছায় এ-সব লেখার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে রাজি নই। আমি প্রতিশ্রুত নই লেখার জন্য। আমার লেখা শেষ পর্যন্ত সেই সব ঠগবাজ পড়বে যারা হেঁসেলে মদের বোতল লুকিয়ে রাখে। যমুনাতীরে, কামানের ছায়ার নীচে বসে আমি হাঁস ও শকুনদের মাংসখণ্ড খাওয়াব একদিন। সভ্যতা কি ততদূর বিস্তৃত হয়ে পড়বে? কিন্তু, আমি ভীত নই। তাঁরাই ধন্য যাঁরা নিজ সাহিত্যকে নিখুঁত বলে জানেন। আমার স্বপ্ন আমাকে ঘৃণা শিখিয়েছে। হয়তো আমি মানুষ বলে এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম এবং আমার চারপাশের আত্মীয়-স্বজন, কলকারখানা তারাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হল না তার কারণ আমি আসলে স্বপ্নবিস্মৃত পুরুষ। কিছু কি ঘটছে কোথাও? তুমি কি ব্যবহারিক মিথ্যে

কথাগুলো সহজে বলতে পারছ—নাকি অন্ধকার খাটের তলে হামাগুড়ি দিয়ে নিশিদিন অমিত্রাক্ষর মার্বেল খুঁজছ?

মধুসূদনের কবরের উপর আমি এক বৃষ্টির দিনে ছাতা খুলে বসেছিলাম। আমার পায়ের নীচে ধক্ ধক্ করছিল মাটি—ট্রাম যাচ্ছিল পথ কাঁপিয়ে। আজ যাঁরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছেন তাঁরা জেনে রাখুন—হাতঘড়িটি সঙ্গে নিতে ভুলিবেন না।

২

ক্ষেতজাঙালের কাছে ফিরে যেতে ভালো লাগে—
তোমাদের ফলের বাগানে।
নিরক্ষর বেশ্যাদের কাছে যেতে ঠিক ততখানি ভালো লাগে।
বই বন্ধ রেখে নতুন সাবানে

গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে। এতদিনে ইন্দ্রিয়গোচর
বস্তুব্যাপকতা থেকে সরে এসে ভুল হল।
ভুল হল এত মুখোমুখি
বসে থাকা। পড়ে থাকা সমাধিপ্রস্তর

গ্রামমোড়লের নামে কেঁপে ওঠে—
তাঁরা জীবিত বা মৃত
দূর ক্ষেতজাঙালের তন্দ্রাহীন, প্রতিপত্তিময়
পাতা, খড়—বাতাসতাড়িত।

৩

খৃশ্চানীকে ভালোবেসে অত্যধিক হয়েছি খৃশ্চান—
আবো বহু খৃশ্চানের বাড়ি গিয়ে ভোজ দাও ভোজ দাও বলে
কোলাহল করেছি সজ্ঞানে--
তাদের সবার দেহে গুপ্তরোগ জাগে নি এখনো,
কর্তব্য, যৌনতা আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম জেগেছিল,
খৃশ্চানও পারে না হতে নৈসর্গিক জন্মপরম্পর খৃশ্চানতা—
দুধের বোতল রেখে প্রত্যূষে চলে গেছে গাড়ি

হিব্রু পাঠমালা বলে : পান করো দুধটুকু, দুধের সন্তান।

৪

তোমাকে পড়ে না মনে হে ঈশ্বর, হে উদরাময়।
বাকি সব মনে পড়ে—মাটির হাঁড়ির তলে ভাসমান একটি মানুষ-
ও-মানুষ এখন শীতের হাঁস ধরে নিতে চায়
হাঁসের অজ্ঞাতে। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে।
তোমাকেও মনে পড়ে হে ঈশ্বর, হে উদরাময়!

৫

উতল সিন্ধুর জলে উড়ে যায় উত্তরী তোমার।
আমাকে বাঁচাও।
ফস্‌ফর সিন্ধুর জলে দৌড়ে যায় ব্রাহ্মণ, নপুংসক, ধর্মাবতার।
তৈরি করো নুন।

শিমুল তুলার লোভে এতদূর এসেছি—তোমার
তুলাচাষ এই?
কোথা নাচ, একবীজপত্রী উদ্ভিদ, ক্ষার,
স্নানোৎসব কোথা?

আঁখিপক্ষ্মের ভিতর দিয়ে সে আমাকে দেখেছিল।
অরুণ জানে। অরুণের স্ত্রী করবী জানে। আমি
এটুকু জানি রাস্তা দিয়ে পাড়ার ছেলে দৌড়েছিলাম। তিনতলার
করবী জানে এবং জানেন অরুণ রায়—করবীদেবীর স্বামী
আমায় বলেছিলেন : আঁখিপক্ষ্মের ভিতর দিয়ে সে তোমাকে দেখেছিল।
ফিরতি ট্রামে শুনেছিলাম রাগী মাতাল : হারামি,
তুই শুয়ার। তাকেই আমি বলেছিলাম সেদিন যা-কিছু ছিল বলার।

৭

আশা, আমাকে বোলো না, এক-একদিন ঝড়ের রাত্রে আমি ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি আকাশে মেঘ নেই অথচ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অহরহ—আমি ছুঁয়ে দেখি মৃদু ভূকম্পনে নড়ে উঠছে কলকাতা, আশা আমাকে বোলো না, জানোয়ার যে-ভাবে ভয়ে ঘুরে দ্যাখে চারদিক তেমনই চিরস্থায়ী বিদ্যুৎচমক চার-পাঁচ মিনিট আলো করে রাখে ফুলের টব, কাপড় শুকানোর তার—আমি ঘুরে দেখি আমার দু'খানা বাহু নেই আর—প্রবল টানে নীচে ছিটকে পড়ে টব ও রেলিং, উড়ে যায় বেনিয়ান, আশা, আমাকে বোলো না

জয়, বোলো না আজ অব্দি পৃথিবীতে কত মানুষ মরেছে সবসুদ্ধ, কেননা ততোধিক মানুষই জন্মাচ্ছে আবার, কেবল দেবতার রোষ দেখেছে দু'একজন একা কার্নিসের ধারে দাঁড়িয়ে, দেখেছে ভয়ংকর শাখা-প্রশাখাসমেত বিদ্যুৎব্যবস্থা ধসে পড়ছে ময়দানে—আশা, তা কি মৃত্যুর মতন বৃষ্টিহীন নয়?

৮

দিতি-অদিতির কোলে মাথা রেখে ডুবে যায় শেষরজনীর চাঁদ।
    আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা দেখা দিক।
ডাকো, যারা কবিতার বিরুদ্ধতা করে—
    আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা স্বচক্ষে দেখুক।
তুমি ধূর্ত [illegible] জেলেদের নৌকা থেকে নেমে এলে।
    আজ [illegible]র্কিতে নক্ষত্র উঠেছে।
তুমি দুঃস্থদে[illegible] গ্রামাঞ্চলে নেমে গিয়ে বিলি করো তাস—
    ঈগলের অপবাদ, পাখিদের অপবাদ বিলি করো।

৯

তোমাকে কিছুক্ষণ ভালো লেগেছিল। তারপর নিয়নে বিদ্যুৎ
সহসা জানাল ঐ টুথপেস্ট আরো ভালো, ঐ তেল, হাসির মেশিন,
বস্তুত, করোজ্জ্বল সূর্যের ডানা থেকে এতগুলি উদ্‌ভিন্ন পালক
আমারই চোখের দিকে ছুঁড়ে দিলে, তবু অর্ধেক অগ্নিদগ্ধ চাঁপা
আমারই ওষ্ঠ যেন পিষে ধরে—বলে : তুমি চেপে যাও, তুমি চুপ করো।

আঃ ছাড়ুন

সিনো, তুমি বাল্যে ছিলে কুকুরছানা
এখন হলে আলাপচারী,
কুকুরছানাই ভালো ছিল—অনর্থক
লোকের কথায় হচ্ছ নারী।

সিনো, তুমি শিখছ টাইপ, মন্দ নয়।
রৌদ্রালোকে
হাঁস ও ময়ূর ছিঁড়ছে ডানা।
সিনো, তুমি নেশার ঝোঁকে

বাল্যে কেমন ডেকে উঠতে
বনের ধারে।
আজ ছায়ায় বসে দেখছে কবি শীতের দিনে
অর্ধশ্বাপদ শিকল-বাঁধা প্রেমিকারে।

চমৎকার সুরাহা তুমি, আর
যা-ই বলো! চমৎকার পাটাতনে দৌড়ে যাও। কৃশ পা তোমার
নখচিহ্নহীন পলি ফেলে যায়। যা-ই বলো
আমারো কি ততখানি অপব্যয় করা সাজে
আমাকে তো ক্লাবের সমাজে
যেতে হয়—যেখানে তোমাকে দেখে
অর্ধেক শেখা আর
অর্ধেক শিখিয়েছে আরক্ষাবাহিনী।
ধন্যবাদ তোমাকে, আর ধন্যবাদ তোমাদের,
ধন্যবাদ মোটা ম্যানেজার যিনি
আমাদের তৈরি করেছেন।

গাছে গাছে কোকিল 'কোকেইন কোকেইন' বলে ডাকছে

কোকেইন, প্রিয় কোকিল,
তাকিয়ে দেখি আয়না
আছে, জলের গ্লাস আছে,
তুমি কী জানো কমবয়েসী ছেলে
ইস্পাতের মতন কত বছর
হাতে পেলাম, বাতাসে গড়িয়েছি।

বয়েস হল অনেক, তুমি শোনো
চাতুরিহীন শর্তে যেতে চাই
লুকিয়ে আমি তোমায় দিতে চাই

আমার বুড়ো বউয়ের ঘরের চাবি
ছেলে তুমি ব্যবহৃতই হও
নষ্ট হও, পাতকী হও শ্রমে।

কোকেইন, প্রিয় কোকিল,
তাকিয়ে দেখি আয়না
নেই, জলের গ্লাস নেই,
বৈশাখের বাতাসে গলে টার—
দু'কষ বেয়ে রক্ত ঝরেছিল
কমবয়েসী ছেলে, তুমি বাঁচাও।

ভ্রমণকাহিনী

১
প্রিয়, তোমাকে গোপনে বলি ঝাউ-বাংলোর পাশে দু'খানি কবর আমি আবিষ্কার করেছি,
বিশ্বাস করো। সুতরাং ও-বাংলোয় থাকা আর
নিরাপদ নয়। কিন্তু বিকেল ঐ নিস্তেজ হয়ে আসে। কেন, আকিঞ্চন,
হাঁটু মুড়ে অন্ধকার মেঝের উপরে বসে ভরে নিচ্ছ ডিডিটির তেল?
প্রিয়, তোমার শাড়ির থেকে চোরকাঁটা বেছে দিতে আমি অপারগ—অন্তত এবার।
তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া ভালো।
তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া ভালো
বারান্দার কোণে বসে তোমারই মঙ্গলচিন্তা করছে এই ভীত, দেশি কবি।

২
আয়নায় বর্ষার মেঘ লেগে আছে—আমি এতখানি দেখেছি জীবনে—
এবং আয়না বেয়ে মেষপালকের সারি নেমে যায়
পাহাড়তলিতে।
অভিযাত্রীদল, আমি তোমাদেরও উঠে যেতে দেখি
অক্সিজেনহীন ঐ নীল শৃঙ্গে—
শাদা বরফের ধার দিয়ে সেলায়ের ছাপের মতন
পড়ে থাকে পদচিহ্ন তোমাদের।

তুষারমানব নিয়ে আর কেন আলোচনা হল না বাস্তবে?
আয়নায়, মেঘের আড়ালে তারা ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ, সাধু।

৩
আমরা যারা বনের ভিতর জ্বেলেছিলাম কুশ
খেতে চাইনি হরিণমাংস
না চেয়েছি শশক—
চেয়েছিলাম আগুন জ্বলুক একা
সম্ভবত আমরা কোনো পরার্থপর অগ্নিপরিমণ্ডলের ভিতর থেকে
চেয়েছিলাম জেনে নিতে
জ্যামিতি আর ধাত্রীবিদ্যা কিছু।

কবিতা লেখা চমৎকার

চেয়েছিলাম রাধা মল্লিক
রাধা মল্লিককে চেয়েছিলাম
ও হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা মল্লিককে চেয়েছিলাম
কী করছ রাধা তুমি
আসছ না—না আসছ?

চেয়েছিলাম মথুরাপুরী
মথুরাপুরে চেয়েছিলাম
ও হ্যাঁ হ্যাঁ মথুরাপুরে যেতে চাইছি
কিন্তু চলি নীলাচলে
চাঁদের নীচে।

যাচ্ছি ছুটে চাঁদের নীচে
চাঁদের নীচে দৌড়ে চলি
ও হ্যাঁ হ্যাঁ চাঁদের নীচে দৌড়ে চলি
ভয় হচ্ছে কতটা দূর
দৌড়বে আর রাজদ্রোহী।

এমনিতরো কবিতা লেখা
কবিতা লেখা চমৎকার
ও না না কবিতা নয় তেমন আর
কে আর তেমন লিখতে পারে
সাতাশ খণ্ড রচনাবলী—
নিদেন ছেচল্লিশটি স্বদেশি গান।

যিশুর বাড়ির হাঁস

যিশুর বাড়ির হাঁস অনাদরে বেড়ে উঠেছিল।
আমার সঙ্গে তারা মুস্তফীদীঘির জলে কেটেছে সাঁতার।
স্বৈরতন্ত্র থেকে তারা রাজতন্ত্রে, অরাজকতায়
অবলীলাক্রমে নানা ঢেউ তুলে করে পারাপার।

যিশুর বাড়ির হাঁস অনাদরে বেড়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীদের
বাঁশবাগানের পাশে। অন্ধকার, কালো জাম বনে
ফেলে দেওয়া ফলগুলি খুঁটে খেত—আমাকে খাওয়াত।
আমাদের উভয়ের পায়ে যেন ছোপ মারে! বেগুনি সাবানে

আমাদের ছেলেবেলা প্লুত হয়ে গিয়েছিল। যেখানে গিয়েছি
অদ্ভুত রঙিন ছোপে আমাদের চিহ্ন পড়ে যেত।
নিজেদের ক্ষতি, ক্ষয় আমরা করেছি।
সকলেই অনুমানে বলেছিল চতুর্দিকে : 'এ তো

রায়বাবুদের ছেলে. অমুক বাড়ির হাঁস—এ-পুকুরে কেন?
আমাদের ঘটিবাটি চুরি যায়। বড়ো বেশি আসাযাওয়া তোমাদের।
অন্য জলায় যাও, খালে-বিলে, অন্য আঘাটায়!'

আমি বুঝিনি তাদের ধর্ম। সমুদ্রের দিকে চেয়ে হাঁসগুলি পেয়েছিল টের।

রাত্রির বাতাস

যা নয় তোমার বাহু তা-ই কালো, তা-ই অন্ধকার।
উচ্চকিত তান ধরে গাছে গাছে নপুংসকদল।
এখন তাদের দেহ ক্রুশবিদ্ধ, ছেঁড়া নিতম্বকম্বল,
প্রেতবনচ্ছায়া হতে করতালি উড়ন্ত খাঁচার
চাঁদটিকে দোলা দেয়। যে-চাঁদের গান ছিল : হায় রে চকোর,
যদিও চকোর নয়—জানি জানি যৌনদ্রাঘিমার
চন্দ্রালোকপানরত পাখি এক রাজন্য শকুন
অকস্মাৎ রাকা হাড়, রক্ত-মাংস ফেলে দিয়ে হেরো শূন্যতৃণ
কুরুক্ষেত্রে জেগে ওঠে। বুঝি অভিশাপ
কপালে লিখিত ছিল কেউ যা পড়ে নি।
অন্ধকারে পাখি কাঁদে : এবার পড়ুন।

মুখর কবি

শ্রীমতী অমুক ঐ তো সেদিন বলে গেলেন ·
'বে-বেশ্যাদের বেসরকারী আতুরালয়ে পাঠিয়ে দাও।'
আমাকে করো আ-আড়ষ্টজিভ—স্বভাবকবি পরিদর্শক।
ওঁদের ও'সব নোংরা কাজে ডেকো না আর ম-মন্ত্রীদের।

রামায়ণ গান

সীতা ক্রোধে জলকুজ্ঝটির দিকে তাকিয়ে আছেন।
রাম তাঁকে বোঝাচ্ছেন এই জল, ফোয়ারা, তূণীর...
পম্পা-সরোবর তীরে মৃণালের আধোঅবশেষ
ফেলেছে বানর। আরো অতিরিক্ত স্থির

অস্থি পড়ে আছে বনে। কে বেশি ক্ষুধার্ত আজ?
পাখি না বানর? নাকি অরণ্যের শিবা?
গহ্বর প্রস্তুত, সীতা, গহ্বর প্রস্তুত—
মর্মর, পাতা ও রৌদ্রে অভিনীত হতে থাকে বাল্মিকী-প্রতিভা।

পিকচার-কার্ড

গ্রন্থের প্রতি যথেষ্টই মনোযোগী তুমি—তবু, আমা-হেন
গ্রন্থকীটের কথা ভেবে দেখতে রাজি নও—
আমাদের তো দু-চার বছর আরো
অতিরিক্ত ভালোবাসা হতে পারত।
সামাজিক জোটনিরপেক্ষতাও চমৎকার হয়েছিল।
অথচ আমরা আজো ততখানি উভয়তোমুখ—
আজো ভালোবাসি উড়ো-ডাকে বিলিতি শীতের
ছবিগুলি ফিরে পেতে। অতিদূরে বরফ কেবলই
সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যহীনতার কথা মনে পড়ায়।

ট্রেনে-লেখা কবিতা

●
আছে ভয়
মেঘের সারল্য আর বালুচর যে-ভাবে খেলছে।

●
আমার ছিল না জানা ডাক-পায়রার প্রতি
পুরুষের ভালোবাসা হতে পারে
হল তাই।

●

আজ বৃষ্টি নেই মেঘ নেই রৌদ্র নেই
    মাঠে কামান রয়েছে
        গোলন্দাজ খেলা করে ঐ মাঠে
            উড়ে যায় তুষ
                বাতাস রয়েছে।

●

বালা, তোমায় দৌড়ে যেতে দেখেছিলাম
                অনতিদূরে—
লক্ষ্য করো বিপদ, বালা
    শুনছ নাকি বাঁশি?
        দুন এক্সপ্রেস বাঁক নিচ্ছে দেহাতি রোদ্দুরে।

এখন সময় হল দ্বিপ্রহর
এখন ইশারা হল বেলা দুই
তোমার নেতৃত্বাধীনে ফাঁকা হল বনপথ
খর নূপুরের শব্দে মহাশূন্যে চলেছে বাউল
এবং অপরিণত মাটি খুঁড়ে পেয়েছি তোমায়
যেন-বা কবর ছেনে পেয়েছি মর্মর।

●

আগ্রার মতন শহরে
    গিয়েছি শ্রাবণ মাসে
                তাজমহলের
        গায়ে গায়ে দেখেছি শকুন।

কোন্ তারা? হায়, ঝর্না সম্ভবত

প্রান্তরের কাদার ভিতর
গাঁথা আছে আমাদেরই প্রিয় কবিতার বইগুলি-

তোমার ব্যক্তিগত নোটবুকে লেগে আছে
আড়াআড়ি
ঘোড়ার খুরের দাগ
দেখেছ তো?

লবটুলিয়া ঘুরে এলেন কলকাতার শেরিফ
হাসতে হাসতে বলছিলেন—এমন কিছু নয়।

●

বুড়োদের ভালো তুমি সইতে পারো না মোটে—
কেবলই ওদের
মিথ্যে নিয়োগ করো মাছি তাড়ানোর মতো রূঢ় কাজে।

মুরারির শবদেহ ঐ যে শ্মশানঘাটে পড়ে আছে
এবং মাথার কাছে একটি বালিকা একা ফিরি করে বই
মুরারিকে নিরক্ষর জ্ঞান করে।

আমার
স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলে যায় পদ্মাবোট
আরোহীবিহীন।

●

সূর্য আর বাঁশবন সমানুপাতিক ছায়া ফেলে রাখে।
চলে যায় অতঃপর শাদা হাঁস সূর্য থেকে বাঁশবনে চলে যায় হেলাভরে
চুনারে যে-সব স্বপ্ন দেখেছি আমার স্বপ্ন
মনে নেই শুধু মনে আছে তৃণ।
দেখেছি বাগানে
অল্প কয়েকজন মালী এসে ফেলে দেয় আবর্জনা।
সূর্য থেকে বাঁশবনে চলে যায় অমনই আয়াসে তারা—
বেলা পড়ে আসে।

একটি প্রাচীন গ্রীক লিরিকে যা বলা হয়েছিল

তোমার শিস মদে ভিজিয়ে নাও, কেননা কুক্কুরনক্ষত্র আকাশে চাকার
মতো ঘুরতে ঘুরতে উঠে আসছে এবং
সে-ই ফিরিয়ে এনেছে গ্রীষ্মদিন, আর সারা জগৎ ঝল্‌সে যাচ্ছে তাপবিকিরণে,
এখন ঝাউগাছগুলি আর্তনাদ করে উঠছে—তাদের পাতায় পাতায় প্রবাহিত
হচ্ছে সিরাপ, ডানার আড়াল থেকে চিৎকার করে উঠছে তারা,
এখন ডাঁটা শাক ফুলে ভরে উঠল, স্ত্রীলোকেরাও বেশ রসালো হয়ে
উঠেছে—তাদের পুরুষদের কাছে আরো দাও আরো দাও বলে দাবি জানাচ্ছে,
এবং সেই পুরুষেরা শিথিল হয়ে পড়ছে ক্রমশ, কেননা তাদের মাথার উপরে
যে অতিকায় নক্ষত্রটি জ্বলছে সে-ই পুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের মস্তিষ্ক ও হাঁটু।

বহুকালের কথা

তোমার প্রতি সকল সন্দেহ
মুছে ফেলে ইচ্ছে হয় আবার ভালোবাসি।
সতেরশো বিরাশি সাল মুছে ফেলে
অনতিদূর বাতাস, গোরু, চাষি,
অনতিদূর যবের ক্ষেত, গৃহবিমুখ ফাঁসি
সমস্ত রাত স্বপ্নে জ্বলে—
কোথায় তুমি রয়েছ আজ জানি না তা'ও
কম বেশি-বা দু'শ বছর পার হলাম।

কুচবিহার

বৃষ্টি শেষ হলে আমি ভোরবেলা বাগানে নেমেছি।
পাঁচটায় তোমাদের ট্রেন এসে পৌঁছয় স্টেশনে—
কোপানো মাটির 'পরে পা রেখে এখন
তোমার, মায়ের সঙ্গে, বাড়ি ফেরা দেখব আগ্রহে।

আমিও স্টেশন অব্দি যেতে পারি, কিন্তু বাগানের
বৃষ্টিবাকলের তলে নেমে যাওয়া ভালো—
মনিয়ার কাছে আমি সের দুই দুধের সন্ধানে লোক
পাঠালাম এইমাত্র। আমাদের এদেশে এবার
চাষবাস ভালো হল—শাকসব্জি উঠেছে প্রচুর—
পুকুরে নরম মাছ—হাঁসের নতুন ডিম—রিক্সয়
যদি-বা আসো চার আনায় পৌঁছে দেবে ওরা।

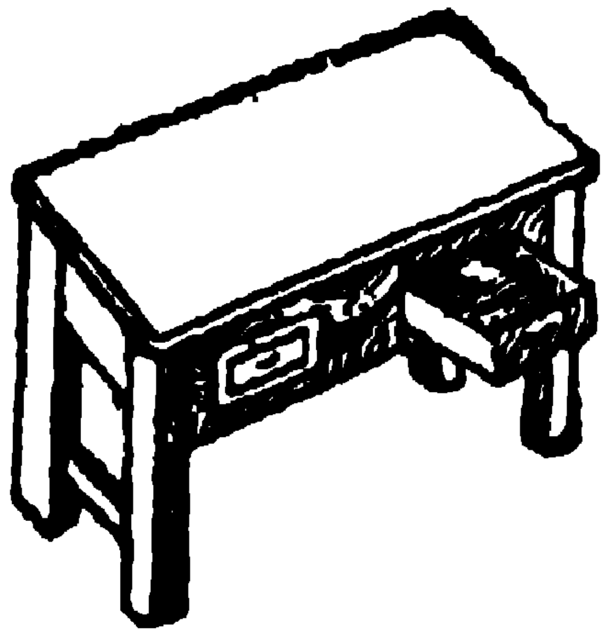
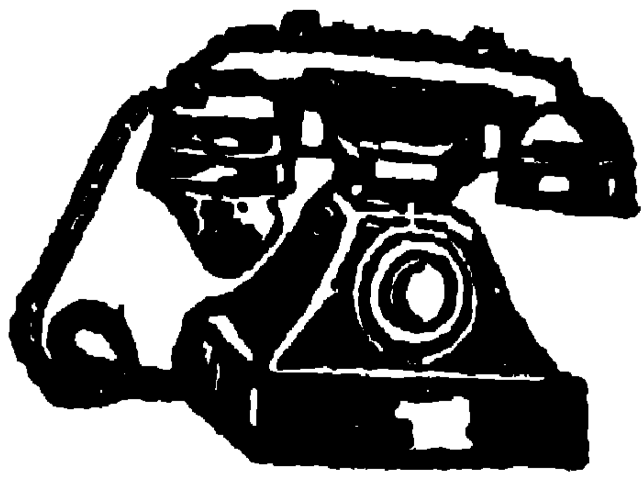
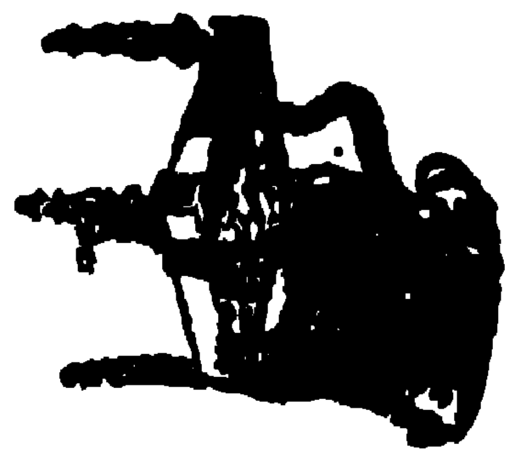
তাম্বুলের ডালা

সমুদ্রতীরকে তুমি বিদায় জানাও! বলো : বিদায় ঝাউয়ের বন। বলো : যজ্ঞোপবীত
ছিঁড়ে ফেলে : বিদায় সেনানী, বিদায় জরিপঘর, হিত ও অহিত
নষ্ট হোক, ভেঙে যাক বাতাস, গরিমা, ঢেউ, প্রচারকৌশল

একদা আকাশ যেন ভরে গিয়েছিল
জলের ঝাঁঝরি থেকে ঝরে পড়া জলেরই আগ্রহে
আমার রচনাগুলি আরো বেশি প্রামাণ্য ও তাৎক্ষণিক মনে হয়েছিল
নিশ্চয় সুন্দরী তুমি, নইলে চাঁদ কেন-বা আকাশপারে উঠেছিল
হায়, পুলিশব্যারাকে কেন বেজেছিল বাঁশি—

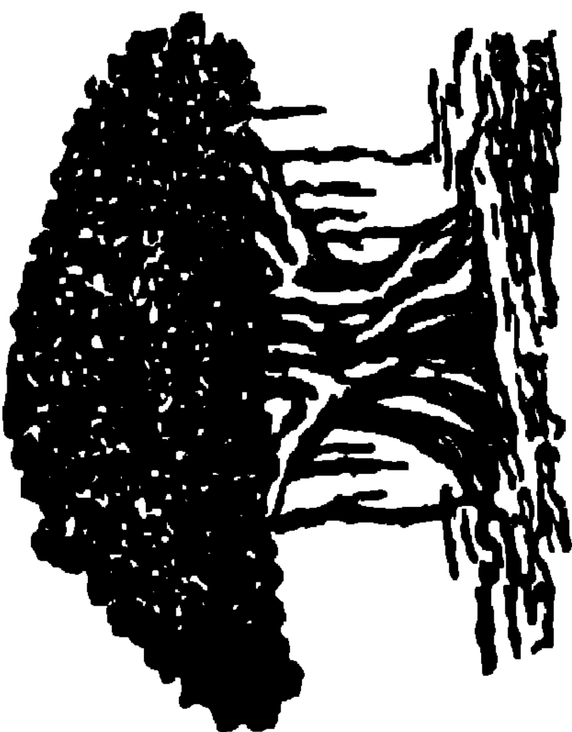
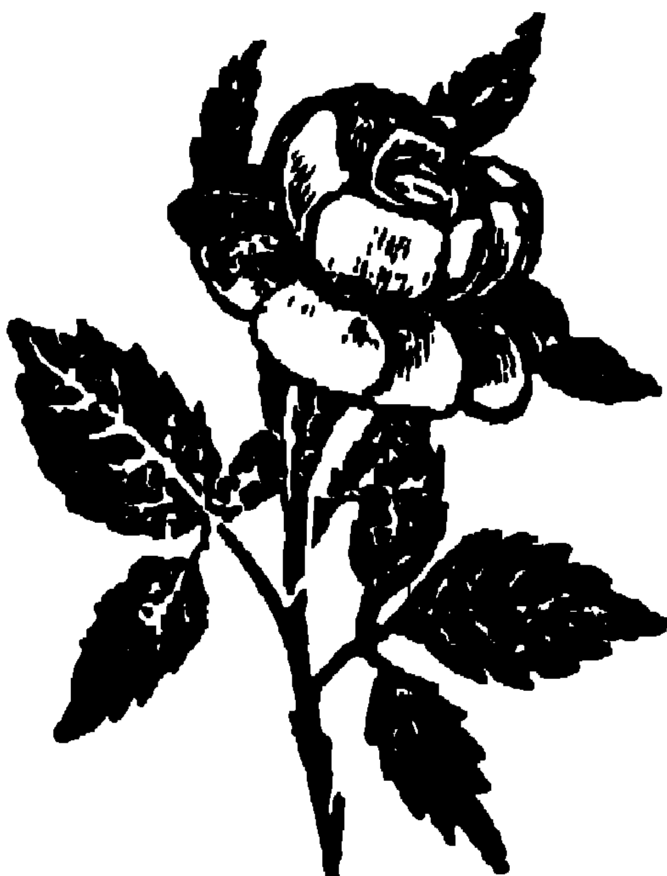
বেঁচে থাকা ক্রমশই আমার কাছে নিয়ে আসছে ফুল আর শবাচ্ছাদন।
কার শব? হয়তো আমার নয়। আমি জীবিত বা মৃত
জীবন্মৃতের জন্য কোনোদিন এত উপকরণের প্রয়োজন হতে পারে
আজই জানা গেল। তাই গ্রহণের ছাউনি, চাঁদ দূরে অতর্কিত
সমর্থনের মতো সাড়া দেয়।

লোচনদাস কারিগর

লোচনদাস কারিগর




প্রকৃতি

যখন ছিলাম শূন্যে ভাসমান তুমি ছিলে কোথায় হায় রে
যখন ছিলাম ঘাসে ঘাসবীজ তুমি ছিলে কোথায় হায় রে
আগুন নেভার পর বুনো ঘাস উড়ছে বাতাসে

আঁধারে যে-সব ফল পেকে উঠত তারাও তো ঝাপটাত ডানা
গোহাড় জ্বলত রোদে...শ্বেত মেঘরেখা...শ্বেত শকুনের ডানা...
আগুন নেভার পর বৃশ্চিক নাচছে পাথরে

যখন পাহাড়ে এসে সেনাদল ছাউনি ফেলেছিল তুমি ছিলে কোথায় প্রবাসে
যখন ছিলাম হাঁসে হাঁসডিম তুমি ছিলে কোথায় প্রবাসে
আগুন নেভার পর বুনো হাঁস নেমেছে ঝর্নায়

বহুদিন এ-পাহাড়ে বৃষ্টি নেই, হিম নেই, মাটিতে ফাটল
ভস্মপাথর থেকে আমরা লাফিয়ে পড়ি পোড়া গর্তে, জলের ফাটলে
আগুন নেভার পর ভুল হয় ব্যক্তিমানুষের আর ব্যক্তিপাখির আর ব্যক্তিশ্বাপদের

যখন ছিলাম পেটে জায়মান, ভ্রূণরূপী, অসত্য ছিল না
খণ্ডবিশ্বাস ছিল, কাদা ছিল, ছিল বনে পায়ে হাঁটা পথ
আগুন নেভার পর উড়ে আসি দগ্ধ জলায় আর ছাইকাঠে, পথের ফাটলে।

শীতকাতর ঘুমের ভিতর গভীরতর শীতের ঘুম আছে

'জাগো, ঢেউ এসে নাড়া দেয় বটের শিকড়ে, জল স্পর্শে আছে নদীতীর, জাগো ফুঁ দিয়ে ওড়ানো ধুলো বই থেকে, হাতের ঝাড়ন নুয়ে আছে, সাম্প্রতিক হৃদয় হেলানো দেখে হেসে বলছে তুমি নাকি, এসেছ তো

'জাগো, বিধুর দেহাতি গানে, চৌকিদার লাঠি দিয়ে ভাঙছে আঁধার, রাত শেষ হল, শিস কান পেতে শুনছে কুকুর, খাড়া কান আরো এক অতিজাগতিক ঘূর্ণির লাটিমে শোনে পৃথিবী ঘোরার শব্দ, তারই কক্ষপথ

'জাগো, ছাতারে পাখির নীড়ে, হে অবরোহিতেশ্বর, তুমি উঠেছ অনেক ডাল থেকে ডালে, হাতে গুঁড়ো হল ডিম, তুমি কেমন বট হে সখা ডিমচোর

'জাগো, ভিজে চুল হারানো বালক, দূর বাংলার কাশবনে ভিড়েছে নির্জন নৌকা : আমরা সমুদ্রযাত্রী, তোমাদের কেউ নই, কারোর আত্মীয় নই, তাম্রলিপ্তি থেকে এ-ভাবেই চলে যেতে হয় প্রবাসে ও জীবনমরণে : সোনার মালিকা ছুঁয়ে ওরা বলেছিল : জল দাও তোমাদের বাদার, জল দাও, পাঁক ও পুকুর থেকে তুলে এনে শান্তি দাও

'জাগো, দম্পতির কাজে লাগা নতুন রান্নার লোক, অতিবেগুনী রৌদ্ররশ্মি ছুঁয়ে আছে কাঁসার বাসন, বারান্দায় পড়ে আছে মই, ওঁরা এখনো শোয়ার ঘরে, বাতাসে উড়ছে মেঘলা পর্দা, এ তো কালকের কাগজ

'জাগো, রাণা কমলালেবুর বীজ, প্রতাপের মতো, খাঁকি পোশাকের ভাঁজে, উলমোহরের তাপে, কবে জানবে নিশ্চয়তা, সঠিক ঠিকানা লেখার আগে পিন্ কোড, কবে জানবে রোগে শোকে প্রজন্মে ও সন্তানবিয়োগে শালপাতামাংস নিয়ে আমিও এসেছি আরো দশজন ভীরু সামাজিক রসের-ই নাগর যেন।

বিজলীবালা

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট তুমি, তোমাকেই ছুঁয়ে থাকে অথির বিজুরি
চিরকাল, আমরাও স্পর্শ করি (চার আনাব সুঁড়ি গর্তে
সার্কাসতাঁবুর পথ) চেনামুখ, এ-জমি পতিত

আমাকে জঙ্গল বলো, ডাকো রেল-স্টেশনের ভুলে যাওয়া নামে
আমাকে শেখাও ভাষা, যে-ভাষায় বিলেতফেরা হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ
ডাক্তার সেনের সঙ্গে মানুষী রীতার (পুরনো বান্ধবী. পাত্র চাই,

ছেষট্টির এম. এ: বি. টি) গড়িয়াহাটের মোড়ে
কথা হয়েছিল। চেনামুখ, তবু কাঁটাতারে ঘেরা
আন্তর্জাতিক ভূমি, যার গায়ে দিন নেই রাত্রি নেই

সাবান ফেনায় মাখা কাঠচাঁপা ফুলগুলি ঝরে পড়ে সামান্য বাতাসে,
উঠোনপ্রান্তিক দেশে এ-ভাবেই মুক্তি হবে আমাদের :
আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, সার্কাসতাঁবুর পথে যেতে যেতে

কতখানি মুক্তি চাই তুমি বলেছিলে, দু'হাত চার হাত?
ভিখিরির সহচর পারিয়া কুকুর ঠিক যতখানি মুক্তি পায়
ততখানি চরে বেড়ানোর মতো আবর্জনাস্তূপ তুমি

পেয়েছ দেখছি। তাই বা ক'জন পেল? বরং পাত্র নাও
নাও ঘটি বাটি গেলাস গামলা যারা পুরুষ রমণী বেশে
ভ্রাম্যমাণ, কাদা চষে, খেটে খায়, তাদের ভর্তি করো

সূঁচের মতন ঢুকে পড়ো বিবিধ ফাটলে, কবিরা তো সহজেই
পাল্টায় নিজের ঘর, চামড়া বদল করে, নইলে কী ভাবে
আমি বা তোমাকে ডাকি অন্য নামে, কথা বলি আরেক ভাষায়?

তদন্ত

১
নামি দ্বিখণ্ড হয়েছ ভেবে। নেমে দেখি হোমগার্ড অনুকে খুঁজছে।
সিঁড়িতে, দেয়ালে পিক। কাল রাতে ক'টায় শুয়েছ?
অনু ফিরেছিল?

আসি সহজ হয়েছ ভেবে। এসে দেখি জানলা ভেঙেছে
বুনো ডালে। ঘরে শুক্‌নো হলুদ ফুল।
বাঁশপাতা বাতাসে উড়ছে।

আরো কত প্রশ্ন চাই এ-মরশূন্যতাকে ভরে দিতে?
ছোটোদের কান্না চাই। চাই কুকুরের পথ পার হওয়া।
আমরা হাসছি কেন? কেন চেয়ে আছি?

যদি দ্বিখণ্ড হয়েছ আজ, একদিন শত টুকরো হবে।
আমাদের জেলখানা ভরে যাবে পলাতক অসংখ্য যুবকে।
ঝাউবনে আমরাও খুঁজে পাবো চিহ্নহীন, অজস্র কবর।

২
ঐ যা-বলেছি তার বেশি কিছু বলবার নেই।
গভীর নিয়তিবোধ আমাদের। হবিষ্যরান্নার ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ভেসে আসে। ঘাসের উপর
লণ্ঠন নামিয়ে রাখি। এইখানে জমির সীমানা
শেষ হল (ঝাউবন) তারপর অতিরিক্ত আছে
খয়ের জঙ্গল আর ধুলো-খাল এবং সে-মানুষের
ফেলে দেওয়া মৃতদেহ (আঘাতের চিহ্ন আছে) গাছেব পাতায়
ছিটোনো রক্তের দাগ লেগে আছে—

নোনা ঘাস
উন্মাদ বাদুড়ে খায়। শুক্‌নো সমুদ্রক্ষত
পিঠে নিয়ে হাঁটছে কামঠ। তোমাদের হাতে তো রয়েছে
গ্রেপ্তার পরোয়ানা, কোমরে পিস্তল আর উকো-শিক
যে-কোনো দরজা খোলে, আমি জন্মমূক, কাকে চাও
অবশ্যই জানি, কিন্তু...বোবা ও বধির আমি, এই
রাত্রির মতো, ঐ বাদুড়ের মতো, ঐ কামঠের মতো আমি
গতিময় অথচ নিশ্চল।

সুখের কথা আর বোলো না

১
কাপি কাপি কাপি নো মিল্ক নো চিনি সক্কর নানকোপরেশন ইন ফেমিলি আরিগুু পেল্লা কাপি কাপি ন্নো সুগার ওগো মা-র এবার একটা ব্যবস্থা করো বাবলুর জন্য একটা ঘর তো চাই কতোবার তোমায় বলেছি মিলু হাঁ দো কাপি সুগার অলগ বিলাসপুরেই ভালো ছিলুম বড়া খাবে দো বড়ে বডা অলগ দেনা সামনের বছর নেপালে পোস্টিং ইরাকেও যেতে হতে পারে সুখেনরা তো ফিরে এলো এদের মানে এই মাদ্রাজীদের দোকানগুলো কিন্তু খুব পরিষ্কার ছাই তুমি ভিতরে গিয়ে দেখে এসো কাপি দো বিয়ের

আগে চীনে হোটেলে কেমন খেতুম মনে আছে অম্বল হত না ওরা ঝালটা যে একদম খায় না কেন চিলি ও' আমাদের জন্যে নিজেরা কি খায় এনমিদি কাপি তোম্মিদি বডা কী-রকম ব্যাবসা ফেঁদে বসেছে বলো দিকি বাঙালিদের আর কিচ্ছু হবে না কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না এদিকে এত ব্যাঙ্কলোন সেদিন অমিতাভর ছোটো ভাইটাকে পাইয়ে দিলুম অজিতবাবুর সঙ্গে চেনা ছিল কোন্ অজিতবাবু যার সঙ্গে তুমি মাল খাও ছিঃ মাল বোলো না শ্যামলী ড্রিঙ্ক করি ও-সব আজকাল করতে হয় আউট না হলেই হল আর আউট হলেই বা কী অজিতবাবু তো বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন মালয়ালম মনোরমা ঐ কাগজটা এখন ইন্ডিয়ার বেস্ট সেলার তুমি আবার মাদ্রাজীও পড়ো নাকি আহা এ-খবরটার জন্যে মাদ্রাজী জানতে হয় না সান্‌ডে পড়লেই চলে রজনীশের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবো পরে সে যা কেচ্ছা।

২

যবে চার্ণকচাবি একদিন খুলেছিল কাপাশসিন্দুক তার ভিতরে গোপন রহস্য বলে কিছু কি লুকানো ছিল—নাকি ছিল নুটিসূতা বাংলার তাঁতের—এই কলকাতায় গোবিন্দপুরের গ্রামে দোতলা বাসের গায়ে রোদ্দুর এলানো আছে সিল্কের মতন—একমাসব্যাপী তার শৌখিনতা দেখা যায়—রপ্তানি-মেলায় শীত—পোড়াঘাস ময়দানে টাঙ্গাইল জর্জেট তার শতকরা দশ ছাড়—আমরা যাবো তো আজ নাকি কেনাকাটা করা ভালো সে-সব দোকানে যার অন্য কোনো ব্রাঞ্চ নাই—

ভবিতব্যতার কাছে হাত পেতে বসে আছে মালিক-দালাল—পরস্পর মুখচুম্বনের আগে দেখে নিচ্ছে ঐ ভবিতব্যতার থেকে কতখানি দূরে গেলে আরবার চোর-চোর খেলা যাবে—সেয়ানা পুলিশ দেখে আমরা হটি না—জানি, বন কেটে বসত বসেছে—বসত উড়িয়ে দিয়ে বস্তি বসেছে—নিকাশি জলের ধারে বাজার বসেছে—

মনে হয় এই তো আমার সহজ হবার টাইম—ঘুরে বোসো নিজেকেই বলি—হাত পাতো, পাবে উড়ন্ত ধুলোয় ভরা টুনি খাতা, দু'শ বছরের ধোপার হিসেব আর ধুতির রিবেট আর পাজামার আস্ত দড়ি—বিকেলভর্তি মাঠে খালি হাতে কে-ই বা ঘুরছে বলো?

রণনিমিত্ত হৃদয় আমার

সম্ভবত আর বছর কুড়ি কি বাইশ বছর টিকে যাব তোমাদের এই চমৎকার আতিথ্যময় পৃথিবীতে
আমি দেখে যাব প্রতিটি ফার্নিচারের পিছনে যে-গাছ আতা দোলায় তার নিসর্গ আমার আস্পর্ধা কত তা একদিন জানা যাবে, মায়ের দান তালপুকুরে যে-আলবেলি স্নানে চলেছে সে-ই বা কেন ইসলামের গান গাইছিল তা-ও জানা যাবে
যারা ইন্দ্রিয়পরবশ শুধু তারাই জানবে দীপালির মৃত্যুর কারণ, কে বা কাহারা তার শবদেহ ফেলে দিয়েছিল ব্রিজের নিচে, তাদের ফটো উঠবে রঙিন শিশুদৈনিকে আমি তোমাদের আশ্বাস দিই
আমি স্তব্ধতাকে ভালোবাসতে শিখব আরো বেশি কথা বলে
আমি জানব টায়ারের ভিতর কী উপায়ে মদ চালান হয়, কী ভাবে ইলেকট্রিক ট্রেনের গোড়ালির কাছে লুকিয়ে রাখা হয় গোবিন্দভোগ
আমার ঘরের কোন্ জানলা দিয়ে ঢোকে ব্রণবিলীন বাঁদর আর ছুলিজল রাগী মায়ের কাছে কী কৌশলে জেদি গোপাল আদর কাড়ে তা-ও জানা দরকার
সুধীর কানুনগো কেন সে-বছর জলি খলিফার কাছে পুজোর পাঞ্জাবি বানাতে দিয়েছিল অথচ সত্য মুহুরি কেন শালীকে দিয়ে পাজামা কাটায় তা-ও জানা দরকার
আমি অমুক সম্পাদকের সেরেস্তায় গিয়ে একদল প্রবীণ লেখকসমেত হামলা করব, বলব এরা অণ্ডকোষমর্দনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের যা-হোক একটা হিল্লে করে দিন
প্রতিটি হোমাগ্নির কাছে হাঁটু মুড়ে বসব আমি, জানতে চাইব তার রসায়ন, ভূতবিজ্ঞান, তার জ্যোতির্বিদ্যা, কী উপায়ে সে ফুটিয়ে তোলে হিন্দোল হাঁড়ির ভিতর পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল
আমি জানতে চাইছি ভোরবেলা কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপের উপর কেন হিম দাঁড়িয়ে থাকে গোয়েন্দা শুকতারা, সূর্য ওঠার আগে, ঠিকে আসার আগে
উত্তর-না-মেলা এক কৃশগণিতের দিকে তাকিয়ে সারা সকাল আমরা সপরিবারে হাসছি, বহুদিন পর নিজেদের বেশ ঝরঝরে লাগছে, ভাবছি সিনেমায় যাব আজ বিকেলে, ব্ল্যাকে টিকিট পাওয়া যাবে কি?

রক্ষাকবচ

১

স্তব্ধ নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার মতো দীর্ঘসূত্রী লোক
কি-ই বা ভাবতে পারে—জলের গভীরতম প্রহেলিকা ছাড়া,
যার শিয়রে কঠিন ধান, আঁটিবাঁধা অগ্নিময় শোক,
ধাতব বীজের কাছে একমাত্র আমিই পাহারা
দিতে চাই, কেননা প্রকৃত স্বপ্নের রূপ নেই, শুধু অবতংশ আছে,
আছে হাতুড়ি পেটার শব্দ, যার ভ্রমে তৈরি হয় ফুল
বিদায়-বারুদে মোড়া, তাৎক্ষণিক, গিলে ফ্যালে মাছে
নকল আংটি যেন. পাশে গৃহস্থের চুল
সহসা স্রোতের টানে দেখা গেল। সে তো বহুদিন গত?
মনে কি পড়ে না ঘাট, কাছিনৌকা, পালের বিস্তার?
হাতুড়ি-পেটার শব্দে স্বপ্নের নির্মাণ হয়, চিরদিন যে-রকম হত
আজ বাংলায়, উড়িষ্যায় নদী-মোহনার মুখে মৃতের আছাড়।

২

আমি লিখি আলাদা যুদ্ধের গল্প। ফুল হতে ঝরবার আগে
যে-মাকড়লালাবিন্দু স্থির হয় শতছিদ্র জালে
স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির ভিতরে ক্রমশ তাকে টেনে নেয় প্রকৃতি ও আমাদের
স্থূল সাংবাদিকতার বোধ। এইভাবে শান্তি টানে যুদ্ধকেও। নালে

পদ্ম টানে জল। ব্রিজ-নেই নদীর ওপারে
এদিকের নৌকাটিকে টান দেয় বুঝ্‌মান ক্ষেত্রজ্ঞ লোক।
শব্দ ও স্রোতের ঊর্ধ্বে দেখা যায় হাত নাড়া। দিদি, পৌঁছেই চিঠি দিও।
আমি পরোপকারের জলে নেমে পড়ি। অসংখ্য যুদ্ধের শোক,

তারবার্তা, গালা ও দলিল এই দেহে ভাসমান।
আমি স্বস্তি পাই। যা ভাঙবার নয় তা-ও টুকরো হয়, ফাটে,
যেমন পাথরখণ্ড, ন্যাড়া বট, আমাদের ইহলৌকিকতা,
ঘুমন্ত বোষ্টম পুঁথি ভেসে যায় খান-খান কাঠের মলাটে।

৩

যদি প্রাণ, যদি হে রসিক,
নৌকায় ঠেলা দিয়ে বলো
দু'টো দিন, বেয়াই মশাই,
দু'টো দিন থেকে গেলে হত—
মেনে নিই এ-শুধু লৌকিক
ভদ্রতার আরো একটি দিক

এই ঘাটে পরমার্থ সিঁড়ি
বহুদিন বাসন মেজেছি
বহুদিন কাপড় কেচেছি
নামিনি গভীরতর জলে
মনে ছিল ভয়, আজো আছে,
আংটির গল্প-গেলা মাছে

হেথা টান, স্রোত খরতর
দ্বি-মুখ দ্বি-ধার তরী ভাসে
চলে যাওয়া, পিছে ফেলে-যাওয়া
ফেরা নয় ফিরে-আসা নয়
সচ্ছলতা ঘটছে এখানে—
বাতাস ও জোয়ারের টানে

ধুয়ে নিই জুতোজোড়াখানি
মুছে নিই এ-পদযুগল
তবু নদী যতটা জটিল
তারও চেয়ে লৌকিকতা গূঢ়—
কাঁপে মাছ থলির ভিতর
পাতা ঝরে, গাছের অক্ষর।

সতর্কবার্তা

সমুদ্রসাঁতার মেয়েদের ক্লান্ত করে। শুধু একজন
ভাসছে সহজ নীল জলের ভিতর। তার জামাখোলা স্তন
ঢেকে যায় বুদ্‌বুদে। আমার পায়ের নীচে সরে যাক বালি :
তার এই কথা ফুরোতেই আরেক বিশাল ঢেউ বলে : এসো, চালি
নতুন পাশার দান। তুমি নাকি ভালো খেলোয়াড়?
ঢেউ অটুট দাঁড়িয়ে থাকে। ভাঙে শুধু বালির পাহাড়।

সমুদ্রসাঁতারে নৌকার ক্লান্তি কত—আমি একদিন
ওর কাছে জেনে নিতে যাই। আমারো তো কিছুটা প্রবীণ,
কিছুটা গভীর সত্য শোনবার ইচ্ছা হয়।
আমার স্তনের দিকে চেয়ে থাকো, এর চেয়ে বেশি সত্যময়
খুঁজো না অন্য কিছু : হেন উক্তি তার।
আমি অটুট দাঁড়িয়ে থাকি। ভাঙে শুধু বালির পাহাড়।

সমুদ্রসাঁতারে শ্মশানের কালো কাঠ ক্লান্ত হয় নাকি?
প্রশ্নের মতো জেনো উত্তরেও যথেষ্ট চালাকি
লুকানো থাকতে পারে। আমাদের কৌতূহল তত কালো নয়
যতটা আগুনে পোড়া। আজ খোলা-গিঁট হাঙরের ভয়
উপকূল স্তব্ধ রাখে। সম্ভবত আর
সমুদ্রে নামো না যারা, জাপ্টে ধরো বালির পাহাড়।

রাজপুরুষ

রাখো রাষ্ট্রপতি ভবনের এই চাবি, রাখো যত চাই কামান-পালিশ।

শহর ছিটিয়ে আছে বাস্তবিক পাথরে পাথরে—
উটের দেয়াল যেন, বাণী-চামড়া, করাতে কাটে না,

রাখো বন্দ্য উপাধ্যায় বংশের ছেলেটির চাকরির কিছু সম্ভাবনা ঐ দেশে—

স্টেশন গড়িয়ে পড়ে ছিপিখোলা সোডার মতন
নগর হাবেলি থেকে খোকা যায় নগর হাবেলি

রাখো যৌবনে যা সহজাত, টাইপিস্ট খুঁজে বের করা,
কেনা দশ কপি দরখাস্ত-খাম

শহর কামড়ে দেয়, আমি গাছ প্রকৃত বোধির,
বিষ্ঠার চিহ্ন লাগা, ধুল পোড়া দাগ শহর দিয়েছে—

রাখো নিজেকে যেমন আমি তেমন রাঠোর নই
জংশনে, রেলের ঘাসে, শুয়ে আছি অসংখ্য ছাগলে।

গ্রামসেবক

শুধু
পাথর সম্মান পান এই দেশে—বাকি সব
নীলামে বিকোয়
কুকুর-পেচ্ছাপ লাগে চারা গাছে, বিকোয় সাহিত্য,
তার লাউডগা, কুমড়োর বীজ-তোলা শূন্য খোল, ঘোড়ার শ্লেষ্মা আর
জোড়া-গিঁট আমাকে বেঁধেছে
খচ্চর ভূতের পায়ে
জোনাকি ডাকছে
উটেরা নক্ষত্র চেনে
চাঁদের আলোয় শুকোয় নাইলন সার্ট
ধাঁধা-চৌবাচ্চার
তিনটি রাক্ষস মুখ
· সর্বদাই হাত পাতি, জল খাই,
এমন শহর কখনো সম্ভব নাকি যেখানে কেবল তৃষিত লোকের বাস
দেখি মরুভূমি
মনে হয় আমার সমস্ত কাজ শেষ হল
বালি
সে-ভাবেই আমাদের বিশ্রাম-ম্যাপের

খোড়ো ঘর অর্ধেক ঢেকেছে
একদা এখানে ছিল জনপদ, বাজার, ফাটক,
আজো ধ্বংসচূড় থেকে
অন্ধ মেয়েরা ডাকে : এসো-না যুবক
শহর দেখাই।

রাক্ষস

সেদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হল।
তাকে বলি : এই তো তোমারই ঠিকানালেখা চিঠি, ডাকে দেব,
তুমি মনপড়া জানো নাকি? এলে কোন্ ট্রেনে?

আসলে ও নির্জনতা নয়। ফুটপাথে কেনা শান্ত, নতুন চিরুনি।
দাঁতে এক স্ত্রীলোকের দীর্ঘ, কালো চুল লেগে আছে।

সই লুডো খেলা

১
টোমাটো—ভুবড়ি-লাল, আমি সিকি-আধুলির মতো গড়িয়ে পড়ছি
চিতল—ধারালো মাছ, খ্যাপা টান দু'দশ টাকার
বেগুন—বালক পিতা, পেটে ঘুন্সি, পয়সা-মাদুলি, তেলা কালো মুখ
কপি ও পালং—ঋজু বিদ্বৎসমাজ, শুধু কী খাই কী খাব চিন্তা,
বুঝ হে এমন দিনে তোমাকে ব্যতীত আর সব কিছু খেয়ে ফেলতে চাই।

২

ঐ ছেলেটা বাবু ঐ হারামজাদা দু'টাকা চায় ব্যাটাছেলে খেটে খা না আমরা মেয়েমানুষ বালবাচ্চা আছে কোথায় পাবো দু'টাকা সেদিন দিইছি তাই ব'লে হপ্তায় হপ্তায় তোদের কী হারামজাদা মদ খাস বদমাইসি করিস আর আমাদের কাছে জুলুম আজ এক টাকা কাল দু'টাকা এই সেদিন দিলম বাবু বিশ্বেস করুন বলে টাকা না দিলে চাল ফেলে দেব পেটাবো তা মার না দেখি হারামি ঘরে মা-বোন নাই বাজারে এসে তোর রোয়াব ঐ চাদর-গায়ে ছেলেটা কাল এসছিল বললুম পয়সা কোথায় পাবো বল্ সবাই রেশন ধরে আজকাল বিক্রি নাই কখনো-সখনো কেউ আসে ইদিকে বলে চাল আছে গোবিন্দভোগ আছে কত কিজি বউনির সময় তার মধ্যে ঐ শালা মুখ গলিয়ে বলে দুটো টাকা দে রে মাগী নইলে এখানে বসতে পাবিনি জমিটা কি তোর রে হারামি লেকবাজার কি তোর বাপের তুই ব্যাটাছেলে খেটে খা না পুলিশের কাছে প্রতিকার নাই ধরে নে যায় ঘুষ খায় আর ছেড়ে দেয় ক'বার হাজত ঘুরে এলি বল্ না বাবুকে এই শালা এই মড়াখেকো আর ক'দিন মস্তানি করবি সাগরেদ হইচিস চোরের সাগরেদ ন্যায্য কথা বলি এত লোগ খেটে খায় আর তুই তোর মরণ হয় না দু'কেজি আট আনা লাভ তোর ঘরে মা-বোন নেই রে বলিস্ পেটাবি চাল ফেলে দিবি তোর মরণ হয় না রে বাঁদর।

৩

হয়বদন গীটার তু তু বাঁশি জেব্রা ঢোল ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম নাইকুণ্ডলি মাইক হাঃ হাঃ শ্যামলবাবু ট্যাক্সি ভাড়াটা আগেই নিয়ে রাখুন তার আগে বলুন দেখি এই টু-পিন প্লাগটা কোথায় ঢুকবে ট্যাক্সি না পেলে শীলাদির লিফ্‌ট নেবেন সাউথে যাঁরা যাবেন বাঁ-দিকে বসুন রেডিও আর্টিস্ট হতে গেলে গাড়ি চাই টিভির জন্য টেলিফোন জেব্রা ঢোল কোন্ জঙ্গল দুলে উঠছে ঐ পায়ের শব্দে পিকোলো কোন্ ঝর্না পথ বদলালো হায় হায় রে দিন যায় রে আলুলায়িত সোনি টেপ অমন মাথায় বেন্ধে দেব টেক ওয়ান রেডি শীলাদি দন্ত্য স-গুলো সামলাবেন রেডি টেক ওয়ান ঝড়-ঝুমুর গলাটা গেছে দেখি আপনার গানের স্কুল খুলে বসুন একতলার ভাড়াটে তুলে দিন জল বন্ধ করুন সে যাবে রেন্ট কন্ট্রোলে তো আপনি যাবেন তরুণ সঙ্ঘে সেকেন্ড তবলা বাইরে গিয়ে কেশে আসুন ঝেড়ে কাশুন দেখেছিলাম সারানে ওবে সারানে।

৪

মূক তুমি তাকিয়ে রয়েছ ঠাণ্ডা ভাতের থালার দিকে
কী দেখছ তুমি জানো আর জানে আধ-হাতা ডাল
নুনের সঙ্গে ভিজে মাখামাখি, চালে হলুদ কাঁকর
ধানের পোড়াটে খোসা, তুমি জানো, যথার্থই জানো,

এদের ভিতর কোন্ সাংবিধানিক দূতীপনা খেলে যাচ্ছে-
মেলা ছক, গূঢ় আঙুল-বাঁকানো এক তুখোড় ছক্কাদান
লাল গুটি এগিয়ে চলেছে তার মরুভূমি দিয়ে
লাল ঝোল গড়িয়ে পড়ছে ঐ মাছটুকু ঘিরে
গ্রাসের আগের মুহূর্তে ঠিক যে-যার মতন
নিজস্ব বিশ্বাসে কাঁপছে—ভাত, ঝোল, নুনের আঙুল—
যে-বিশ্বাসে কাঁপে নীল গুটিগুলি লাল খেলাঘরে।

সংসার

রাখো
রাতপাখা আমার শিয়রে
রাখো হাতপাখা আমার মাদুরে উত্তর চব্বিশ-পরগণার যাত্রীবৈশাখ দূরে
ডাক দেয় জীবনবন্ধুরে তুমি
আছো নাকি জেগে
হা
তুই ছাই খে গে যা
মা শিশুটিকে বলে
ঐ ক্রোধে জ্বলছে সমানে অজস্র ইস্পাতি গুঁড়ো নিরন্ন জেলায়
এসেছে জামাই তার পাতে দিও ছাই
এসেছে বাতাসী
একেলায়
কতটুকু পারে
দিনের ছলনা আর রাতের নেহাই
কচুবনে সাপের চিৎকারে আমাদের ঘুমানো কঠিন
কবে বৃষ্টি হবে দাই কবে
খুঁজে পাবো হাতপাখাখানি

রাত
এগারোটা
জংশনে দুই যাত্রীবাহী
এই শেষ উত্তেজনা

ঘুম
যেন ঘুমের ভিতর
গোটা হাত তুলে নেয়
ও কি আমাদের চেনে
শহর
যে-ভাবে চেনে মেয়েদের
ঘরভাড়া টাকায় ছ'আনা
তুমি চিনে রাখো আত্মীয়স্বজন নিজের পূর্বপুরুষ চেনো
মনে রেখো সফেদাবাগানে
আমাদেরও চার কাঠা তিনটি নারকেলগাছ জংশনে দুই যাত্রীবাহী
মেয়েদের আরো দূরে যেতে হবে
রাত আটটায় শেষ বার দালালের মুখোমুখি
চেনামুখ, ঘুম এলে তোমাকেও ভুলে যাই
খুলে পড়ে শাঁখা
খসে পড়ে উত্তর চব্বিশ-পরগণায় কেনা এই
ভাঙা রাতপাখা।

তীর্থ

১

আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, যোগিন্দর, সময় আমার সময় তা কি গাছের মতো, বলতে চাই গাছের আছে আলাদা এক সময় যেমন নদীর আছে আলাদা এক সময়রেখা যা-কেবলই পারাপারের, যাত্রী জানে, জানে শ্মশানঘাটের ফটোগ্রাফার, আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, আমার সময় মাঝবয়েসী, ক্লান্ত কিছু, চমকে উঠছে নানান ডাকে, সমাজপতি বলছে এসো দু'কথা বলো না-হয় কিছু পাঠ করে যাও, এমনিভাবে সময় আমার মাঝামাঝি সরল একটা পথ চিনে নিক।

তোমার সময়, যোগিন্দর, চোখের সামনে উল্টে আছে, ট্রাকের আলো পড়েছে তার ডোরা কাটায়, হলুদ লোমে, তার শ্বেতনখরে রক্ত লাগা, উদাস মায়ের বাচ্চাগুলো দুধ খাচ্ছে সেই সময়ে।

২

যাই সুখের ভিতরে নেমে, সিঁড়ি আছে, আলোও জ্বলছে, অনেক
অনেক বছর পর এই পথে কুয়াশায় দৌড়ে নামছি, বৃষ্টি পড়ছিল,
মহাবীর মন্দির-গুহায় রুপোর টুকরো, ভুল নয় নামার মুহূর্তে
ঠিক এ-ভাবেই দৌড়ে থাকি, সোনার ভিতরে নামি ধাতু ও তামার
উজ্জ্বল দণ্ড কাঁধে, সুখের ভিতরে নামি, হয়ত এমন
জটিল নামার জন্য মনগড়া শর্ত আছে, কেন বা পুরুষ
সুখের সন্ধানে যায় একা একা তারো কানুন রয়েছে, আমরা জানি না,
দৌড়তে ব্যস্ত থাকি, পাথরে পিছলে পড়ি, যাই গাছের শিকড়ে বেঁধে,
সেখানে ভোরের
আলোর ভিতরে জ্বলছে রাস্তার বাতিগুলি। আজো আমরাই প্রথম এসেছি।

সপ্তর্ষি

গভীর উদ্বেগ নিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়
সাতখানি ঘুম
আমাকে রয়েছে ঘিরে—
কেউ শূকরবাহিতা, কেউ খর্গবিলাসিনী, কেউ
ডিগবাজিপ্রিয়
বয়স্য ক্লাউন, তার কুষ্ঠের সঙ যেন, ঐ পেটায় ঢোলক
মাথায় কাগজটুপি
পরনে ইজের
টানে শিল্পী ধরে সাধের ছাগলে—
ওরা
সাতখানি ঘুম আমাকে রয়েছে ঘিরে, বলে
এখনি সঙ্গে চলো,
বলে—আয়
গভীর উদ্বেগ থেকে
ভয়াবহ সুষুপ্তির দিকে।

প্রগল্‌ভতা

ঝাঁকাও যে-ডাল ইচ্ছে, গাছ তার চেনা ফলগুলি
উপহার দিতে থাকে, আমরা লাফিয়ে উঠি, দৌড়ে যাই,
যা-কিছু প্রত্যক্ষ তাকে পিছু ফেলে হেঁটে যাই দ্বিধার ভিতর—
সেখানেও ফল পড়ে, ফাটা ত্বক, আঁক্‌শি অনন্ত
আকাশে দুলছে দ্যাখো, এ তো বল্লভপুরের সেই কালবৃক্ষ নয়
যার ফলগুলি স্বতন্তর, বিদ্যুতপাতিত।

খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন

খণ্ডবৈচিত্র্যের দিনের উৎসর্গপত্র

আমি জলের ভিতর ডুব দিয়ে যে-সব মাছগুলিকে দেখতে পাই
তাদের নাম জানি না—কিন্তু জানি তুমি বহুদিন দেশ ছেড়ে চলে গেছ
জলের উপর ঝরছে পাতা—তার উপর ভাসছে মাছ— তার উপর উড়ছে নিশান
নিঃসঙ্গতায় এবং তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে।

বিদেশী স্বাস্থ্যকর্মী

কুশ, কাঁটায় গোধূলি,
কুয়াশায় ছিন্ন হল ত্বক,
বুঝে ফেলি তুমি সে-জাতক
(শ্বেত মহিলার মাথা ঘিরে স্থির
এক ঝাঁক শাদা ধোঁয়া) নিয়েছ তো তুলি'
শীতের প্রথম ফটো ধীর
বাতাসের, তবু ছক
বহুদূর ছায়, তোমাকে দেখাতে
আনি প্রীত বাংলায়
মেঠোপথে শোভাগান (খড়ি-
চিহ্নিত মানবদেহ) হাতে
যা-ভবিষ্যরেখা তাই আহা মরি
যম বিষে-সিদ্ধ-করা
পরিসংখ্যান যেন, আমাদের শ্রীমান খাঁচায়
কত অর্থনীতিবিদ্, নিজেদের ভুল
ধরে ফেলে আমরা যখন
হেসে উঠি আমাদের
তখনই দেখায় ভালো, স্থূল
লাঙলের মুখোমুখি নোনামাটি, ফের
নোনাজলে এ-অবগাহন
উঠে আসি যে-বাংলায় তার
শাদাকালো শাদাকালো চুল

এইখানে সুপ্রাচীন মীথ
জড়িত তমসাগান
পুরুষের হাত-পেতে-থাকা
ভাঙা ভিক্ষাপাত্রে দান
বল্লালের হিত ও অহিত
কঙ্কালীতলায় ঐ বাঁকা
আলোটুকু কী জন্য পড়েছে
কী সম্মান লিখেছে কপালে

কোন্ ফুল কেশে ফুটে আছে

রায়দীঘি সাগরদীঘির
যে-তুমি জলজলক্ষ্মী, তার
খণ্ড টুকরো মাসের পাহাড়
নীল কচুরীপানায় বীর
কালো চাঁদ (মাতা ও লৌকিক)
কুয়াশায় কুশের কাঁটায়
ছিন্ন রশি, মজ্জ প্রতিমার
কিছু খড়, কাঠ কিছু, বুঝি হাড়
ও-ভাবেই জলে ভেসে থাকে, শিক
বিঁধে থাকে চোখে
ত্রিশির কাচের মতো দেহ
নিরালোক ভেসেছে আলোকে
রশ্মির এ-পরিদ্রবণ
সাত রং সাত ঘোড়া সাত বোন
সাত স্বাস্থ্য সাত শিশু সাত স্নেহ
বাঙলায় অপরিবর্তন
এই কুশ, কুয়াশায় ঢাকা যক্ষধন
গোধূলির গল্পগুলি বহমান রক্তের মতন।

অর্কিড

অর্কিড সহজ ফুল—কিন্তু তারও জটিলতা চাই
হাওয়ায়, বাতাসে। মাঘ মাসে, শীতে
তাকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় ফুটে উঠতে দেখি।
আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, ট্রাক থেকে ইটগুঁড়ো পথ,
দূরে ভোজনক্যান্টিন, কিছু সাদামাটা পাইনের গাছ,
এ-সবের মধ্যে কোনো চালিয়াতি নেই—ঐ হাবিলদারের
দেশ থেকে চিঠি এল, তা কি সুসংবাদ নয়?
শুধু অর্কিড, বিকৃত মুখের ফুল, অন্যভাবে ব্যাপারটা দেখছে।

বৌভাত

ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত সঙ্গীতময় সরীসৃপ আর
দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর

—চলেছি স্বাজাত্যবোধে, ভাত খেতে, লুচি-মাংস খেতে,
—এমনকি কুঁদুলে নেপাল চুপে, আলপথে, সঙ্গে চলেছে—তার নিমন্ত্রণ নাই

—কোথাও রয়েছে এই সমাজ-মেঘের মুখোমুখি ছিঁড়ে আসা বিকেলের আলো, ঐ তপ্ত উঠোনের চারপাশে কড়াই বসেছে যেন ধুন্দুমার জংশন পার হয়ে সাবেকি আগুনে পুরনো দিনের কয়লা জ্বলমান, ছাঁটা মাটির আড়ালে, ধুলো-খালে, খনির আঁধারে

আমাদের লৌকিকতা শেষ হোক। এখন আকাশে দশটা আঙুল জ্বলে। বসুধারা জ্বলে। ঘুম পায়। নিমন্ত্রণলিপি শুধু—তার চেয়ে কে আর জাগ্রত!

খাজুরাহো

দেবতা
আসছো নেমে
তবে এই মাটির থালাটি
আমি
ভেঙে ফেলি,
স্বতই যা উঠে আসে
তার
প্রতিরোধ চাই. বিশাল ঝঞ্ঝাট মারো যেখানে আবেগ
ঝরছে পাহাড় বেয়ে
ঠেলে দাও মেঘ,
বনে গভীর ফাটল টানো, চোরাগর্তে, বালুময়
জীবিকা আমার,
বেদানা ফলের ফাটছে সিদ্ধ ত্বক—নৃসিংহের,
ধাক্কা-মূর্তির আর হ্লাদিনীর, আর বামনদেবতা

তুমিও আসছো নেমে,
হাসি মুখ, আমার বিপদ
তোমাকে আনন্দ দেয়,
এই ভেঙে ফেলা মাটির থালাটি
অতিরিক্ত বেশ কিছু
হাসির বিষয় হবে
তোমাদের।

ভাষার জন্ম

সবিতা (দুর্বল ভাষ্য) ওঠো, দ্যাখো বাইরে কে ডাকছে তোমায়
ভেঙে পড়ছে বস্তুজগতের টুকরো, আঁধার নামছে, রাত্রি
এক দীর্ঘ সুতোর প্রান্তে দিন, জলের ভিতরে
কাঁপছে তামার থালায় কোটা আস্পদের মুখচন্দ্র

বলছে সবিতা :
'এই শুরু'
অতএব শুরু হল

সবিতা দেখছে
প্রচণ্ড ঘূর্ণির ফলে
দুধ থেকে ফেটে উঠেছে মাখন
বালিশের ওপাশ থেকে, ঘুমের ভিতর
মানে দিন : অন্ধকারের ভিতর
অর্থাৎ রাত্রি

দিন শেষ হল, মানে রাত শেষ হল
আলো ও আঁধার স্বতন্ত্র হয়েছে
অতএব বিছানার ভিতর থেকে
অনেকে কথা বলছে : আলো
হাত বাড়িয়ে বলছে : তুমি এসো।

'আর কাউকে যদি না পাও তবে আমরা পুষিয়ে দেবো' ব'লে সংসারের কোনায় কোনায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে মাকড়সাজাল, ঝুল, নোনা কাঠ, ক্ষয়ে-যাওয়া লোহা, মরচে-ধরা তালা, এমনকি নক্ষত্রের মতো যুযুধান গা-ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়েছে এই গ্রীষ্মের জলপতঙ্গ বহু, যেন কালপুরুষ তারা, ভল্লুক-গোষ্ঠীর চোখ, সাত ঋষি

সূর্যোদয় : মানে কাজ
সূর্যাস্ত : মানে ঘুম

সেদিন আলো থেকে জন্ম নেয় শিবির, গতি থেকে ঝরে যায় ঘাস, ভাষা থেকে লাফিয়ে নামে চাঁদ, একা, ঘাসবিন্দুর মতো, শিবিরের কোলাহলের মতো (যুদ্ধের প্রসব) ঐ মাতৃরেখা ধরে আমি দৌড়ে চলেছি, প্রয়োজনবোধে, যেখানে কাজ ও উদ্যম, কাঙ্ক্ষাপ্রকৃতির টুকরো, মানুষ মানুষকে ডাকে, সাড়া দেয়, সেই বিশাল পিতৃভূমির অপর প্রান্তে সূর্যাস্ত, মানে ঘুম, মানে উৎসাহহীনতা, যুগ্ম পাথর ও শ্যাওলা, অন্ধকারে ঝর্না ঝরার শব্দ, গুহার ভিতর দু'টি মেষ পরস্পরকে লেহন করছে।

মাতা বিন্ধ্যাচলগামী

ভেসেছে আঁধারে যান—বায়ুযান—কর্কশ মন্দির
ভাঙা তার দাঁড়িপাল্লা, ইতস্তত ওজন ছড়ানো,
নিচে ক্ষম-হরীতকী, সেই গাছ, সেই নদীতীর,
ওরা কি উড্ডীন নয়? সাংখ্যের ভিতরে প্রকৃতি

সামান্য বিনুনী ভেবে বাঁধে এক রুদ্রজটাজাল,
পোকামাকড়ের গ্রন্থি—ভয়ে গা-ঘেঁষে বসেছি
ঘূর্ণ্যমান, লাফ দেওয়া, ভেসে যাওয়া পুরুষের মতো
চরাচরে যাকে স্থির মনে হয়, যাকে খোঁড়া ও অন্ধ

বলে উপহাস করা চলে— যে পারে না উড়ে যেতে,
দৌড়ে যেতে, ভেসে যেতে শূন্যের ভিতরে—
অথচ সে ভাসমানতায় ভরা, লাফের আহ্লাদ আর ঘূর্ণির চোরাটান
সে নিজেই—তবু তাকে পর্যুদস্ত হতে হয়

স্থপতির ভয়বৃক্ষে, বিমানের লতামূলে, শকটের শিকড়ব্যাদানে,
বৃশ্চিকের মতো সে-ও রৌদ্র থেকে আঁধারেই সরে যেতে চায়।

পকেটমার

ধোঁয়াপাহাড়—শুয়োরমাথা বন—ধ্বংসবালির উপর খেলছে দুই বল-বালিকা—এই দেশে তুমি জন্মেছিলে— অথবা তোমার তীরবেঁধা শরীর আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম— আমরা পকেটব্যাধ— চামড়াচর্চিত— পাতা ও প্রশাখার সন্তান— গোধিকারাধা তুমি— দেশ বিভাগের পর এই দেশে সোনার সংসার গড়ে উঠেছিল— আটপৌরে রাজনীতি ছিল অশীতিপর বুড়োদের যাঁরা আজ ফাঁসগড়ায়— এঁদের পিছু পিছু আমরাও হটেছি— সেই মাটির উপর শুয়ে পড়েছি যেখানে বহু বছর কোনো চাষ হয়নি— অথচ পিঠের নিচে টের পেয়েছি হালের দাগ— নাকি চাবুকের— দেখেছি কানা মেঘের আড়ালে আগুনে-খড় উড়তে উড়তে চলেছে মৈমনসিংহ থেকে জুম-জমি সুবর্ণসিঁড়ির সীমানাতক— চক মীরকাশিমপুরে দণ্ডী বক একা দাঁড়িয়ে রয়েছে— ঘুরে ঘুরে মাছ জ্বলছে— সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার ঘটনা সেবার কাগজে রিপোর্ট হয়নি— ডাক্তার জ্ঞান চৌধুরির মধুর চিঠিখানি এখনও ভাঁজকরা ব্যাগে রয়েছে— উনি লিখেছেন : হি কাম্‌স ফ্রম এ গুড ফ্যামিলি—

মানুষের চেয়ে তার নৈতিকতা বড়ো— অর্থাৎ তঞ্চকতা— পদ্মপাতায় স্যাত সমুদ্রের গুজব— গোপাল ঠাকুর দেখছেন শালুক-নাচ— চোখ মটকে বলছেন : সে-কথা থাক— কোন কথা— বাবা আমার ভয়-তরাসে— ব্যাঙগিন্নির আড়ালে ব্যাঙবাবু— সঙ্গে পুঁটি-খল্‌সে— বিয়ের বাজার এত দেরিতে কেন গা— লগনসা গগনসা-র অপকর্ম ভাণ্ডার— মারি তো গণ্ডার— চিল ছোঁ— না' নিয়ে গেল বোয়ালমাছে— আয়, আমরাও নাচি।

দণ্ডী

আজ কিছুটা হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল কেননা ঘুম ভেঙেছিল ভোরবেলা আজ পশুদের ডাকে—ঐ তো ওনার পায়ে শিকল, রুপোয় বাঁধানো, আলো-ঠিকরে পড়া—প্রাণীপোকা, প্রাণহননের কীট, জন্ম থেকে সূচবেঁধা, পিষ্ট ঘাসফড়িঙের গতি নানাদিকে, যন্ত্রণা যে-সব দিক নির্দেশ করে থাকে— আজ একা তেমনই ঝর্নার পাশে থমকে দাঁড়াই যেখানে একদিন ভেঙেছিল সোনার কলসি—আগুয়ান অমৃতধামযাত্রী উইপিঁপড়ের পিছু পিছু সংঘবদ্ধ যাত্রীদল— তাদের সারস, বৃষ, বৃকোদর তাকে নিয়ে হাসাহাসি—হাউসিং কলোনি থেকে ছিটকে-আসা মাসি-বৌদি— ও মা, ওনাকে চিনতে পারবো না উনি তো কিছুদিন আগেও ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন—এ-ভাবেই বাসনা নিভে আসে— তখন

আমরা স্রোত ভেঙে ঝর্না পার হওয়ার পথে শুনতে পাই বিজয়তন্ত্র থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ, মৃদু ঘুমপাড়ানি অস্ত্রের ধাতুগান, আর চোখের উপর ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে যে-স্ফুলিঙ্গগুলি বারবার জ্বলে ওঠে তা বহু তরবারির সংঘর্ষে ফুটে ওঠা ঝরে পড়া আগুনের বেরীফল— আমাদের লক্ষ্য তবু উৎস ও উচ্চতা, প্রায় বানানো গল্পের মতো— আশা আছে আরেকটু এগোলেই দেখতে পাবো পাথরে তৈরি পাখির বাসা, গাইডের নিজের গ্রাম আর সেই যুবরাজকে যিনি চায়ের দোকানের মালিক, যিনি তাঁবু ভাড়া দেন এবং তাঁর শস্যক্ষেতে জন্মায় কালো গম— কিন্তু ততক্ষণে আমার হাতের এই বীণাযন্ত্রটির তিনসুতো পশুকেশরের তার নিশ্চয়ই কিছুটা শিথিল হয়ে আসবে এবং হয়ত আমাদের শেষ পর্যন্ত খালি গলাতেই গান গাইতে হবে যা প্রায় হাহাকারের মতো--যা শুধু নিরক্ষর, বোকা এবং অস্ত্রহীন যোদ্ধারাই গাইতে পারে।

রাজনীতি

১

মশলায়
জিভ পুড়ে যায়
পান
অগ্নিসমান
জর্দা-কিমাম আর কেশর-সুপুরি
বরফ কাঠের বাক্সে
বহমান জলের দু'পাশে
রাংতায় মোড়া নুড়ি—
গান
বিদায়ের, খৃষ্টবিমান
মানুষকে শূন্যে তোলে, উড়ায় আকাশে, ওড়ে
হাঁ-মুখ গহ্বরে,
মশলায়
রাঁধছে নানকগোষ্ঠী, জাতিস্মর, বামনের কোলে বসে থাকা
বিভাজিত নর।

২

নেতা আসে
মন্ত্রী আসেন—
হাসি মুখ, হাসি-হাসি মুখ, হাসি,
আয়কর বিভাগের কাশি
পানরাঙা—
এ-বছর ফসল ফলেনি
গাছে পাখি নেই
স্রোতে মাছ নেই
এসেছেন নেতা
উনি অর্ধেক দেবতা
বাকি অর্ধেক
থাকে
ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ঐ আমলাদের ঝাঁকে
মুখ্যসচিব আর বিভাগীয় হেড আর পুলিশ-প্রধান
বরফের বাক্সে চাপা রাংমোড়া খিলি খিলি পান—
আমি ভালোবাসি
কচি কচি মন্ত্রীদের গালভরা হাসি।

সংসার

১

যেন সে ফুটেছে ফুল, জলে নয়, জলান্তরে নয়,
জলন্ত উনোন ব্যেপে যে-লতা জন্মে ওঠে তারই ফুলে
আমার সময় লেলিহান, তারও বাস্তবতা হয়—
ক্ষুধা ও বায়ুর মতো, যৌনতায় উঠেছিল দুলে
এই তো আজকে ভোরে, আমি বাথরুম যাবার নামে
খুলে রেখেছি দুয়ার হেঁসেলের, ভয়
ও-পথেই এসে থাকে, দেখি প্রচণ্ড আগুন, দেখি শাদা ফুল ঘামে,
দেখি বিছানায় পদচিহ্ন, দৈত্যের এখানে আশ্রয়
তা-হলে নিশ্চিত হল, নিশ্চয়তা-নাম্নী এক উনোনের পাশে
আমার দু'দণ্ড বসা, ফুঁ দেওয়া, জৈবফুল পুড়ছে নিশ্বাসে।

২
জর্দালতায় তুমি পানপাখি বসে আছো, ঠোঁট লাল, সবুজ পালকে
সুপুরি লুকানো আছে, পায়ে বিষ্ঠা, চুনাদাগ। তোমার স্বাতন্ত্র্য বলে
কিছু নেই, জেদ আছে, খোঁড়াখুঁড়ি আছে,
মাটির অল্প নিচে রাঙা আলু, প্রকৃতিতে যথার্থ হেঁসেল, উপরে আগুন,
নুনজল বাতাসে ফুটছে—
আমি শুধু বোঝাতে এসেছি। শোনো, আমার উনোন
অমনই একান্নবর্তী, প্রকৃতিরই মতো, রবিবার, অনেক অতিথি,
পেঁয়াজ-হলুদে শিলপাটা থৈ থৈ, এসো, মাথা পাতো ছুরির ধারের নীচে-

জর্দালতায় রৌদ্র ঝলসে ওঠে, রক্ত ঝরে—রান্না ও নিয়তি প্রস্তুত।

বনবালা

যেন মেঘ বটের চূড়ায়
লগ্ন, ধবলাকার—
তার নিচে পাতাই পুড়ায়
মানুষেরে, ক্ষার

এ-জীবন বটপত্রলীন
মায়ার পোশাক পর।
উদ্ভিদ কিছুটা প্রাচীন
উদ্ভিদে অল্প কিছু জরা—

দেখি অপাবৃত
টলোমল উচ্ছৃঙ্খল ভাঁটি
সাবান, নীলাভ ফেনা, গীত
সংগীতে কাপড় কাচা, গাঁ-টি

ফস্ফরকেশিন
দিনমান পাথরে আছাড়
পাথর ও ধুতি শায়া শাড়ি, তিন

কাল এসে ঠেকেছে নাছাড়
এক কালে, এক বস্ত্রে, তা-ই
ধুয়ে মুছে পারিপাট্য করো
নইলে পাতার জামা, গঁদ, ভস্ম, কাঁই,
ও-দেহে চড়াও, বুড়ি, ঐ সবই পরো।

খলসামগ্রী

এই হাড়— একে শান্ত করো
মাটি দিয়ে অন্তরাল করো
চারিদিকে কুকুর ঘুরছে
শুয়োর ছুটছে

এখানে আয়নাটুকু ধরে রাখি
দেখি উড়ে চলা গাছ
দেখি গাছের ফোকরে এক জায়ফল
সুদূর সূর্যের

জন্ম নিতে পারি—আমি
হাড় হয়ে জন্ম নিতে চাই, চাই
বাংলোর খ্যাপাটে বাগানে
একা পড়ে থাকি

ধুয়ে যায় শুশুকপ্রণালী
প্রসবিনি, এ-গান গর্ভের,
এই গান কাঠবিড়ালীর
চামড়া ছেঁড়ার

এই গান গ্যারেজ-ঘরের
ফেলে রাখা কাজ, নীল
ইস্পাতখণ্ড থেকে লাফ দিয়ে ওঠা
ধাতুকবিতার

শেষতম হাড়, তার খুলে ফেলা
ত্বক
মাটি দিয়ে অন্তরাল করো, দ্রুত
ঘাস চাপা দাও।

ষষ্ঠিতলা

১
কতো? প্রায় তিন'শ বছর এই মাছধরা জালে
জড়িয়ে রয়েছি। তবু কেন কাতর হইনি?
ষষ্ঠীতলায় তুমি ভাঙা দেওয়ালের খোপে শায়িত রেখেছ
খর্ব, খোঁড়া, পরাচুল, লোল-চামড়া মমী ও বালকে—
সাষ্টাঙ্গ জড়িয়ে আছে সুতোজাল গন্ধআঁশ, জল ছিটে দাও,
হাত নাড়ো মাল্‌সার জীয়ল সাগরে, আমি ল্যাজ নাড়ি,
এ-মাছ বেড়ালে খায়, মানুষ খায় না, তবু তিন'শ বছর
কোন্ কবি বেঁচে থাকে?

২
ভাঙি নাটমন্দিরের মাটি, ভাঙি ঢেলা ও চাঙড়, শুকনো কাদার তাল,
ভাঙি গোঠ—প্রতিমা ও প্রতিমার জলস কলস—তারই সর্বনাশ,
মেঘহীন জলদৈত্য এ-ভাবে চিহ্নিত হয়—গায়ে যার খড়-অলঙ্কার,
হ্যাঁ গা সাতপুরুষের ভিটে, আমি বাবুটিকে চেনো নাকি, চিনে রাখো,
আমি গয়ারাম, ভাগ্যান্বেষী, ঠারেঠোরে কথা কই, দানবীর, দাঁতাল মহিমা,
মায়ের সুনামে স্কুল, বাপ-নিকেতন, জ্যাঠার বাগান, পাড়ার মেয়েরা
ভোরবেলা ফুল তোলে—ঠাকুরপুজোর ফুল—পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ঐ কিশোরীরা,
যেন সরলবর্গীয় গাছ, এই প্রজন্মের, ছড়ায় শিকড়, হাসে যেন কাঁটাতার,
নিচে চোরাচালানের গর্ত, আমেরিকা থেকে আসা গুঁড়ো দুধ, চীনের কলম
আর ছাতা নেপালের,
আন্তর্জাতিকতা এতদিনে মান্য হয়, নড়েভোলা ভূগোল-শিশুরা পায় দশে দশ,

ত্যক্ত খোলস চলে এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে।

খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন

ও-সবুজ খণ্ড হতে পারে— তাই উড়ে আসে ধর্মবক
ঠোঁটে যার মৃতের স্ফটিকমাংস— ধানক্ষেতে এদিক-ওদিক
ছড়িয়ে পড়েছে শিরা— জাল যেন— ভোরবেলা ফাঁসি-বোনা— বাঁধো
শস্যের সবুজ— তার হাহাকার— তার বীভৎসতা— তার রক্ত-ঝরে-পড়া
ঐ উপহার— আজ জন্মদিনে— এই পঞ্চাশ বছরে।

আঁধার নামে

আঁধার নামে। আমার পাঠ শেষ।
সমুদ্রতীর পাখির ঝাঁকে কালো।
গো, পতঙ্গ, সুসমাচারী মেষ

ভূর্জপুঁথি চিবিয়ে ছিঁড়ে খায়,
জাবর কাটে, অবসাদের আলো
লবণঝড়ে হঠাৎ নিভে যায়

আমার কাজ এবার হবে শুরু
নিশ্চয়তার চেয়ে অনেক ভালো
অনিশ্চয়—জলের মতো পুরু

বালিকাচের উপর ছড়াছড়ি
ঝিনুক-খোলা। দেবতাদের এ-সব কূট চালও
আমার জানা। উল্টে দিই প্রমথ কানাকড়ি।

সময়গাছ

যে-আগুন কাঠের সর্বস্ব
তাকে নিভে যেতে দেখি
খর শীত নামছে পাহাড়ে

আমার ভিতরে আজ যে-আনন্দে জ্বলছে দাহন
সে শুধু রক্তের, সে শুধু মদের,
তুমি পান করো—

লোহা এসে বিঁধেছে পাথরে
শিক মাথায় হেনেছে
এ-আমার করোটিপ্রতিমা
বীজ ও পোকায় ঢাকা অনন্ত খামার,
তুমি পান করো—

সমস্ত পাহাড় আজ চুপ
সব ঝর্না স্থির হয়ে আছে,
প্রতিধ্বনি—গেলাস ভাঙছে—
জঙ্গলে উড়ছে বোতল।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র উৎসর্গপত্র

একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে।
একে ভাঙা টেবিলের মতো তুমি কাছে টেনে নাও। রাখো গরম পেয়ালা
এরই অক্ষরের ’পরে। জলের গেলাস রাখো। শোনো এ-ও কাশে।
থুথু ফ্যালে। তোলে হাই। ঘুম এলে চোখ বোজে। যেন কালা

শোনে না অপ্রিয় সত্য। মিথ্যা বলে। এই তার গা-ঘেঁষা চাতুরি
সাম্প্রতিক। অপরাধজ্ঞান নেই। চেনে না সে প্রতিবেশীদেরও।
পড়েনি অন্যের লেখা। বিদেশিকে ভয় পায়। পায়ে সমুদ্রের নুড়ি
সেবার বেড়াতে গিয়ে এনেছিল। তাকে দিয়ো যত পারো

ঘরের খুচরো কাজ। পয়সা কাটো। একে দিয়ে ভূতের বেগার
খাটাও যেমন খুশি। তুলে দিই তোমার আঙুলে
বারুণী রাতের দাহ, লোহাস্পর্শ, জলে ভেজা ক্ষার,
কোরা কাপড়ের গিঁট, অন্ধক্রোধ— একদিন দেখো তুমি খুলে।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকা : ১

আমাদের অধ্যাপক (বাংলার) এবং তাঁর স্ত্রী (শান্তিনিকেতন) পরস্পরকে ডাকেন সুচারু বলে এবং তাঁদের (একমাত্র) সন্তানের নাম যাজ্ঞবল্ক্য—যে (নিজের) বাপের নাম ভুল উচ্চারণে বলে অনাদনাদ রায়।

আমাদের ঐতিহ্য এই যে, যা আজ জীবিত তাকে আমরা স্পর্শ করি না কারণ (ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস) জীবিত সমস্ত কিছু (আবার) আমাদের স্পর্শ করে দ্যাখে। প্রমাণ : একটি সাপের কাহিনী : সন ১৩১৭ (বারুইপুর থেকে দু'মাইল উত্তরে) হাসনপদা গ্রামে জনৈক চাষি একটি (মাঝারি সাইজের) গোখুর সাপকে দুপুরবেলায় পুকুরের পাড়ে শুয়ে থাকতে দ্যাখে এবং বলে চল্ চল্ এবং আরো প্রকাশ (ঐ রাতে) জনৈক চাষি নবকৃষ্ণ সামন্ত ঘুমের মধ্যে শোনে ভাই রে ডাক অর্থাৎ প্রথম চাষির জীবনবায়ু সর্পাঘাতে বহির্গত হয়। আমি লেখক এই সংবাদ অবগত হওয়ায় হেড পুরোহিত এগিয়ে এসে বলেন : আচানন্দ রূপম্...অর্থাৎ যিনি আনন্দ তিনিই চিৎ অর্থাৎ যুগ্মভাবে চিদানন্দ (আবার তিনিই সৎ) তখনই রান্নাঘরে তুমুল কোলাহল ওঠে কেননা ডাল শেষ এবং হেড পুরোহিত অসতর্ক ভাবে বলেন : অন্ধের কিবা দিন...

আমার ঘর। ১০×১৫×১৩। দেয়ালে লেখা (কাঠকয়লা) বীর্য ধারণ করো। আমাকে সহকারী বুঝিয়ে দেয় ওটা কোনো অনাজ্ঞ কথা নয় ওটার মানে এই যে বীর্যই বল সুতরাং সে স্বামী প্রেমভেদানন্দজী সম্বন্ধে নিচুগলায় আমাকে দু'চারটে খবর দেয় এবং সেই অবসরে জেনে নেয় আমি দীক্ষিত (দিকশিৎ) কিনা।

* * *

: সমাজসেবা কী?

: আমরা সমাজবদ্ধ জীব এবং সমাজের প্রতি আমাদিগের প্রেত্যেকের কিছু-না-কিছু করার আছে। আজ আছি কাল নাই এই ভাবনা আমাকে একসময় ক্রেমাগত উদাসীন করিয়া তুলিত। তখন আমি এই আশ্রমে আসি এবং বাহিরের ঘরকে তখন বলা হত বহির্বাটিকা (সে আজ বিশ-ত্রিশ বছর হতে চলল ; বা তারও বেশি) তখন অনাথবাবুর বাবা (অর্থাৎ আপনার পূজনীয় শ্বশ্রূমহাশয়) মধুপুরে রিটায়ার লাইপ কাটাচ্চেন। তিনি বললেন : গুঠাকুর, আর নয়, আপনারও বয়েস হল আমার কিঞ্চিৎ সাশ্রয় আছে তা দেবসেবায় নিয়োজিৎ করতে ইচ্ছুক। আমি বললাম : মানুষই দেব্‌তা (অনাথবাবুর বাবা হাসলেন : আপনি ঠিক তেমনিই রয়ে গেলেন দেকচি। আমি বললাম : উপায় কী) তখন আশ্রমে কেউ আসে না। লোকে বলে ওটা শঠ, কেউ বা বলে আক্ড়া, শ্রীধাম থেকে বিন্দুবাসিনী দেবী লিখে পাটালেন কল্যাণ হোক, ত্রিশজন মাত্র অধিবাসী— সে কি আজকের কথা, হাঁ, যা বলছিলাম, আপনারা হলেন শিক্ষিত, আমাদের আশাভরাসাস্থল

এবং উপরন্তু আপনারা শিক্ষক, ইনি লেখক, আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের প্রতি আমাদের প্রেত্যেকেরই কিছু-না-কিছু করা কর্তব্য। আমরা চাই আপনারা এগিয়ে আসুন! গ্রামের এই খোলা বাতাসে নিশ্বাস নিন! দেখুন আপনার দেশ (যদিও বা আপনারা শহরে থাকেন তা বদ্ধ জলাশয়) আপনার দেশের অগণিত দরিদ্র চাষি-জেলে-কৃষক- কৈবর্ত আপনাদেরই মুখ চেয়ে আছে...

এই সময় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় এক ঝাঁক কবুতর। ওগুলি আশ্রমের পালিত বলেন হেড পুরোহিত এবং কথায় ছেদ পড়ে। উনি আমার কাঁধে হাত রেখে আঙুল দেখিয়ে বলেন : চলুন, পশুপাখির ঘর দেখে আসি।

* * *

হরিষে বিষাদ!

হরিষে বিষাদ!

আশ্রমের ভাঁড়ার ঘর থেকে কে বা কাহারা দু'বস্তা মাসকলাই ডাল (চুরি করে) নিয়ে গেছে এবং সহকারী আমাকে বলে আমি জানি কার কর্ম, আমি বলি পায়ের ছাপটাপ কিছু... সে বলে কাল তো বৃষ্টি হয় নাই আমি বলি (কথাটা ঠিক) কিন্তু তুমি যদি জানোও সহকারী (সাবধানে বোলো অর্থাৎ) নিশ্চিন্ত হয়ে বোলো বিকেলবেলায় হেড পুরোহিত বলেন আশ্রমে এমন ঘটনা যে এর আগে ঘটেনি তা নয় কিন্তু সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এমন ঘটনা...সহকারী আমাকে জিজ্ঞেস করে এখন কি জানানো ঠিক হবে আমি বলি না, না রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বোলো সকলের সামনে না বলাই ভালো।

: আমার মনে হয় (সহকারী তবু উঠে দু'চার কথা বলতে চায়) আমাদের ঠাকুর সুবিধের লোক নয় (অনাথবাবুর স্ত্রী অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকান) আমার মনে হয় ঠাকুর লোকটা সুবিধের নয় (সহকারী রিপীট করে) জ্ঞাতসারে অপরের ক্ষতি হোক তা আমি চাই না কিন্তু আশ্রমের মানসম্মান আজ কোথায় (হেড পুরোহিত ভ্রূকুটি করে তাকান) সহকারী থতমত খেয়ে বলে : এদের সামনে...আজ যাঁরা বাইরে থেকে এশ্চেন তাঁরা কী ভাবচেন বলুন দিকি... আমাদের সম্মান কোথায় থাকলো?

: তুমি থামো। ইটিকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা। হেড পুরোহিত ওকে থামিয়ে দেন। সহকারী যেন হেড পুরোহিতের হুবহুক প্রতিলিপি, আমাকে আড়ালে ডেকে অবিকল ঐ ভাবেই হাত নেড়ে বলে : ওঁয়াকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সহকারী যে সঙ্গীতজ্ঞ তা আজ সকালে টের পেলাম। সে আমাকে বিবিধ সঙ্গীত শোনায় এবং আমি আরো টের পাই সে গৃহপলাতক, অযত্নবর্ধিত, অপরের ইচ্ছার দাস ও কর্নাটে সে ছিল একদা ক্রিশ্চান, জয়পুরে জৈন, এবং সে শোনায় মীরার গান, পাদ্রীর প্রচার, যেমন :

(গীত)

কুন্দা চামেলী বেলী
চাঈছে আঁখি মেলি
তরুপাশে আছে হেলি
নন্দাকিশোর।

বা,

(গীত)

তবে প্রেম দেখে আমি—যীশু—মনে হলেম হতজ্ঞান।
তুমি প্রাণ দিয়ে নাথ, প্রাণ কিনেছ,
তাইতে প্রাণের প্রাণ।
আহা দারুণ ক্রুশেতে, প্রেক, শলাকাঘাতে,
আমার প্রাণ কাঁপিছে থর থর,
করে ক্রুশ ধ্যান।
(কথা) এমন সুহৃদ ত্রাতায়, কদাচ না ভুলিব,
বিপদে সম্পদে প্রভুর সঙ্গ না ছাড়িব।

কিন্তু নিম্নলিখিত গানটি আমাকে আশ্চর্য করে, এবং সহকারী সময়মতো এটি আমাকে টুকে দেয় :

(গীত)

শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়ী খান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা খেলতে এসে লাগল ধাঁধা
নরেশ্চন্দ্রের হাসাকাঁদা না-আসা এক ভাল ছিল।

একদিন সকালে, ছুটির দিন— আমি, সহকারী. অনাদনাদ রায় এবং তাঁর স্ত্রী সুচারু পাহাড়ে বেড়াতে বেরলাম। আমরা বেশ ভোর-ভোর রওনা হলাম বলা চলে, এবং পাহাড় অল্প দূরে, বেশি উঁচু নয় এ-কথাও ঠিক এবং নীচে লতাগুল্ম পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে যেতে থাকলাম উপরের দিকে। এগুলি বনতুলসী, এবং এগুলি বিছুটি না ছোঁয়াই ভালো। মেঘ ও রৌদ্র। নীচে আমাদের সুরঙ্গপথ, পাহাড়ে ওঠার বা পাহাড়ে হাঁটার। আমরা একটি খরগোস আবিষ্কার করি পথিমধ্যে। বস্তুত, পাহাড়ে দৌড়েই ওঠা যায় এবং মধ্যাহ্নে ছায়া পড়ে পুবে-পশ্চিমে, পাহাড়ের না গাছপালার বলা কঠিন, কিন্তু ছায়া পড়ে নীচে একটি গ্রামের উপর (সোন্‌ডিমরা) ঐখানে সহকারী আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ক্রুশকবর, দারোগাসাহেব এতদূর এসেছিলেন, এবং

আরো দেখিয়ে দেয় ফ্লিন্ট, চক্‌মকি ঠোকার শব্দে আমি শুনি হাহাকার, কিন্তু আগুন জ্বলে না। শ্রম ব্যর্থ হয়। আমি দেখি সাঙ্কেতিক পাথর। আদিম পুরুষ কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল। তাঁরই বিজ্ঞাপন। তিনটি অস্থি অবিভেদ্য নতজানু ভাবে একটি গহ্বরের দিকে যেতে বলে (আমরা যাই না) সুচারু এদিকে এসো, আমি দেখি কাঁটাবনে জড়িয়ে পড়া সুচারু দেবীর শাড়ির আঁচল, আঃ ছাড়ুন, দেখি তাঁরই গভীর মেরু-কোমরের খাঁচ এবং কৃশপিঠের নিচে ফুলে ওঠা মেশিনের মতো নিতম্ব, ধক্ ধক্ শব্দে নড়ে ওঠে বেসামাল চর্বি ও বারুদের অপপ্রচার (কোন্ টাইমে আসবো) আমি চোখ মেলে দেখি অল্প দূরে (অর্থাৎ নিচে) আলো ও ছায়ার বীজগণিত, তারই চমকপ্রদ সমাধান, ধাঁধা ও প্রশ্নোত্তরে বলো, আমার মাথার মধ্যে আর্তনাদ করে ওঠে কবিতা, তারপর স্থির হয়, আমি হতাশ-আড়ষ্ট হয়ে লিখি : 'বুলেট-বেঁধা মহান কাচ। আজও অটুট।'

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকা : ২

এইখানে পিরামিড। মধুবন। হাতের তালুর ঊর্ধ্বে
ছড়ানো চত্বর। সে-ও আজ সবুজ তামায় ঢাকা।
ভাস পাখি হেসে উঠেছিল। পথে হরিণের
শিঙ। ওগুলি বিক্রয়লব্ধ। কিছু ছালের চাবুক আর
শ্বাপদের ধর্মদাঁত। যদি খেজুরবনের এই পারে
ধ্রুবতারা সমানুপাতিক ভাবে লম্বরূপ হয়ে থাকে—স্থিরতর
মদ ও মোহের মাত্রা বেশি হয়ে থাকে— তবে
আমি পুণ্য তীর ছেড়ে দিয়ে ক্রমশই পাপসমুদ্রের দিকে ভেসে যাই,
যেখানে শীতল জলে, নির্বিচারে পুড়ে যায় দেহ—
যেখানে পিতাকে দেখি, পিতামহ-মাতামহদের দেখি,
বীর তারা, নিঃসংকোচ, তারা জানে উন্মাদ উত্তরপুরুষে
বর্তায় রক্তনলীর গ্রন্থি, কণ্ঠনলীর ফাঁস, এই সে-বাঁধন, কথাবলা,

ছায়ারূপ, আত্মবিবৃতির মতো পিরামিড।

অন্ধীর গান

লাল পিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে গায়ে জল ঝরছে স্নানের শেষে গামছাচেপা জল পড়ছে তাদের সারে উঠোনে ছিল কাপড় মেলা তুলতে গিয়ে তাকিয়েছিলাম একলহমা গ্রহণ-লাগা সূর্যপানে অন্ধ হল দু-চোখ আমার কাঙাল কানি মাগীর ভাগ্যে ছিল এ-সব লেখা বাঁশবাগানে কে চলেছ চুপিসারে চোর নাকি গো নাকি আমার চোরাই নাগর নাকি লাল পিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে।

আমার আত্মার মাঝে

জানালার পাশে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি— চোখ মেলে কিছুই দেখছি না
শুধু শুনছি অদ্ভুত পায়ের শব্দ ফেলে কারা গেল— কারা আসে—
তুমি ক্রমাগত নীল আকাশের ডোম থেকে তাজমহলের মতো
শাদা হাঁস বাতাসে ছাড়ছ—
মনে হল আমাদের কোনো শ্রম বৃথা নষ্ট হবে না এবার
সামান্য আঙুল নেড়ে আমি বুঝি উজ্জ্বল, চক্ষুষ্মান, প্রতিশ্রুতিময়
কবিতালেখার দিকে ফিরে যাব
জানালার পাশে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—তুমি ক্রমাগত নীল
আকাশের ডোম থেকে তাজমহলের মতো শাদা হাঁসগুলি বাতাসে ছাড়ছ—

এই দেশ ছেড়ে আমি চলে যেতে চাই, লাসা পাহাড়ের দিকে,
হয়তো বা পায়ে হেঁটে, কেননা লেখার খাতা অসম্ভব অজ্ঞান-লেখায়
ভরে গেছে, হয়তো বা নদীপথে— ঝর্নাপাথরের পথে— ফাদার ত্রিনার
লেবুবাগানের পাশ দিয়ে, এবার আমার খাতা অবাস্তব বিরোধী লেখায়
ভরে গেছে, কূটবুদ্ধির সঙ্গে বিবাদ হয়েছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দূরত্ব ঘটেছে,
চন্দননগরে মহা হৈ হৈ পিকনিকে আমার ততখানি আহ্লাদ হল না—
আবলুস কাঠের চেয়ারগুলি যত প্রিয় ছিল আজ তারা তত প্রিয় নয়।

'আমার আত্মার মাঝে বার বার কেঁপে ওঠে সূচ!'

*

হে সমুদ্র, অন্ধকারে বিবাহের এত আয়োজন ছিল তোমার প্রান্তরে।
আমরা এনেছি ধাতু, ধর্ম ও সংগীত। রাত্রি

প্রকম্পিত করে নেমে আসা সৌরবাতাসের লুঠ চলেছে সৈকতে।
হে সমুদ্র, অন্ধকারে, বিবাহের দ্রুত আয়োজন হল প্রত্যেক বিবাহে—
একই সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা হল— সন্তানের জন্ম হল— উত্তরোত্তর
আমরা বিবাহ ছেড়ে আরো দূর বিবাহের উৎসবে চলে যেতে চাই।
আমাদের অদ্ভুত সংগীতের আয়োজন নিয়ে যেতে চাই প্রপিতামহের
কাছে— আফ্রিকার বাঁশি, নিচু জেরুজালেমের উপত্যকা থেকে আনা
ঘোড়ার খঞ্জনি। কিছু উপহারও নিয়ে যেতে চাই— এইসব গান ছাড়া।
কিছু উপহার আমি দিতে পারি প্রত্যেক বিবাহে— প্রপিতামহীর
বিবাহেও আমি কিছু মসলিন কেটে দিতে পারি, অথবা খেজুর,
অথবা পাতার কৌটো ভর্তি করে রুপোর চামচ। অথবা বাৎসল্য-বোধে
পৌত্রীর বিবাহে আমি চুম্বক ছাড়া কিছু দেব না ভেবেছি।
আকাশের নীল নহবতখানা থেকে, হে সমুদ্র, আমরা স্বর্গবাসী আমরা
নরকবাসী ক্রমাগত বাঁশির ফুৎকারে, ভাঙা ঢোলের আহ্লাদে
আমরা পরস্পর অভিবাদনের মতো রাঙা ভঙ্গি করে নেচে
যেতে চাই সৈকতের বালুর উপরে—
যতখানি উপস্থিত হওয়া যায় ততখানি উপস্থিত হয়েছি উৎসবে।
তা কি পথশ্রম নয়? তা কি কবিতার মতো কোনো পথশ্রম নয়?

*　　*　　*

হে রুয়া, আদিম পিতা, আবির্ভাবমাত্র তুমি বৃহৎ সূর্যের কোল থেকে
মানুষের যোনিমণ্ডলের মতো সেই কালো ছায়া মুছালে সত্বর-
হে রুয়া, আদিম পিতা, আবির্ভাবমাত্র তুমি আপন লিঙ্গের অবাস্তব
দৈর্ঘ্য নিয়ে উচাটন করেছিলে জ্যোৎস্নার বিশাল গহ্বর—
স্বাতীনক্ষত্রের ঈর্ষা হল— ধর্মপত্নীর প্রতি ঈর্ষা হল রক্ষিতার নানাবিধ।
হে রুয়া, আদিম পিতা, আবির্ভাবমাত্র তুমি বৃহৎ সূর্যের কোল থেকে
তুলে নিলে ঢাল, সেই পৌরুষের আচ্ছাদন, জলপাইপাতা,
যে রুয়া, বিষাক্ত তুমি, অখণ্ডমণ্ডল তুমি, তুমি কৌতূহল,
তুমি অক্ষর, অশ্রু তুমি, উদ্দেশ্য ও বৃক্ষস্বাধীনতা,
হে রুয়া, তমসা তুমি, নৌ-উন্মীলন।
তোমার মাতৃভূমি— ঊনপঞ্চাশ বায়ুর পরিধি—
সূর্যের ঝড়ে তুমি, আবির্ভাবমাত্র, ঐ মুখ দিয়ে নেড়ে দিলে স্তন
মা-উটের, মা-তিমির, মা-মানুষের হৃদয়স্পন্দন।

*　　*　　*

রুয়ার বিবাহে আমি যেতে চাই এইমাত্র, দ্রুত।
রৌদ্র, সিন্ধু, জলপাইবন থেকে ভেসে আসে গান।

'মহীয়ান পুনর্মিলন' বলে আমাদের সম্প্রদায় এসেছিল ফলআহরণে—
রুয়ার বিশাল বংশ আধোশ্বেত মাছের সন্ধানে ওড়ে কাক, শঙ্খচিল, সমুদ্রকপোত,
রুয়ার বিবাহে আমি যেতে চাই চল্লিশ মাল্লার মান্দাসে আরূঢ় হয়ে
রুয়ার বিবাহে আমি মসলিন আবৃত হয়ে যেতে চাই শবের মতন
রুয়ার বিবাহে আমি যাব বলে উঠেছি এবার নিশিধাক্কার ঢেউয়ে ত্রস্ত হয়ে
সকালবেলায়। আনিয়েছি অণোরণীয়ান সেঁকোবিষ, কস্তুরীমালার ফুল,
অগুরু, গন্ধক,
এ কি উপলব্ধি নয়? এ কি উৎসরণ নয়?

* * *

রুয়ার বিবাহে যাব। চিরদিন এদিকে আসার পথ বন্ধ হল জেনে।
দুয়ার বন্ধ করে সমুদ্র-বেলার দিকে চলে যাব--
যতদূর রৌদ্রের ভিয়ান লেগে সিন্ধু চলকায়। সমস্ত রাত্রি ধরে
বিবাহের আয়োজন চলেছে এখানে।
এদিকের বিবাহ ফুরালে
অন্য কোনো বিবাহের, উৎসবের, জোয়ারভাটার দিকে চলে যাব—
খাঁড়িমোহনার দিকে। এতগুলি উৎসবে আমাদের উপহার শেষ হয়ে যাবে
একদিন। সমস্ত গাছের পাতা শূন্য হয়ে ঝরে যাবে, মুছে যাবে জলপাইবনে
মেঘ ও আলোর খেলা। অথচ উৎসবগুলি বাকি থেকে যাবে বহু।
ভিখারির মতো কোনো উৎসবে যাব না আমি। খুঁটে দেব
মরা প্রজাপতিরাশি আমার মস্তিষ্ক থেকে—

তা কি গ্রহণীয় মনে হবে? তা কি বর্জনীয় মনে হবে তোমাদের?

বন্যা

তুমি ধ্যান করো সেই খুদ একদিন তোমাকে বাঁচাবে
আসে কাছিম-দেবতা
পিঠে কালো মেঘ
বর্ষার খিলান
তার চৈত্য ও গম্বুজ— ঐ মেঘ একদিন তোমাকে আশ্রয় দেবে
আসে জলস্রোত
পূর্বসাগরের দিকে ভেসে যায়— ফেনার বিস্তার লাগে দুই তীরে—

সাত জলাভূমি
প্লাবিত সেগুনকাঠে, উপরে আসীন
সহস্রার সারস
তার ডানা-নাড়া, তার নিজেকে জাহির,
ক্ষেতে, মাঠে বৃষ্টি পড়ে আর তুমি ধ্যান করো
এক অশান্ত বিন্দুকে যার নাম নেই— শুধু ক্ষুধারূপ আছে।

দোলে সবুজ ধুতুরা গাছ
মাটির সরায়,
জারিত উন্মাদ-রস—কালো গোলাপের মতো ফুটে ওঠা আজ এই
শ্রাবণের ভোরে
লুব্ধ মানুষের সমাগম হবে— তাঁরা
দেয়ালগাঁথার নক্সা বানাবেন
তাঁরা পরিখাখনন কাজে দক্ষ ও প্রবীণ
তেজারত তাঁদের ব্যবসা—তাঁরা
নিশ্চয় হাত রেখে পিঠে
বলবেন—সমূহ ক্ষতির আগে আমরা এলাম
জলে দেশ ভেসে গেছে
জলে ভেসে গেছে দেশ—
কার দেশ? কোথাকার জল? কোথায় চলেছে?
সবুজ ধুতুরা গাছ, অনাসক্ত, প্রতিটি প্রশ্নের
সঠিক উত্তর চায়—কেননা সে
নির্যাসে জারিত, নিজ রসে, নিজের শ্লাঘায়
উত্তর-মুখাপেক্ষী
প্রশ্নের রহস্য বোঝে না।

মধ্যাহ্ন সূর্যের
পরকলা মেঘের ভিতরে—
ফের বৃষ্টি এল,
সেতুর উপরে আজ প্লাবন ফুলের
ঝরে জুঁই, শাদা ফুল, স্মৃতি থেকে ঝরে—
নীচে নৌকা, পাটাতনে আঁধার বনের ছায়া,
কালো কাঠ, কালো ছাগ, কালো স্রোত,

গোপী-মাস্টারের চোখ
ছেলেটি জানলা দিয়ে চেয়ে আছে— বৃষ্টি ও গৃহের মধ্যে
অনন্ত বর্ষার
জলে ভেজা মাঠখানি—
জটাফুল হাতের ইঙ্গিতে ডাকে, আমি তাকে ডাকি,
এসো, ধ্যান করো,
ক্ষুধারূপিণীর আঁচলে জড়িয়ে বোসো—

বাঁধ পাঁচ ফুট— বেলে ও এঁঠেল মাটি ত্রিশ/সত্তর
বর্গপাথর চার বাই চার
লোহা-চূর্ণ, মেশ-জাল, সেগুন তক্তার খুঁটি
বিদেশী সিমেন্ট ও বালিচক, গা-ঘেঁষে উড্ডীন
রিলিফ ত্রিপল
কচুপাতা মাথায় জড়িয়ে
আমিও বসেছি
জাতবেদা, আমায় চিনলে নাকি?
বহুদিন পর
এই নদীতীরে দেখা, এই বন্যায়, অনাহারী ব্রাহ্মণের রুদ্ধ পেটিকায়
সতর্কলিখন, মধ্যযুগ শেষ হল— সেনেদের, সামন্ত রাজার,
গত নির্বাচনে জেতা গণপ্রতিনিধিদের
যড়যন্ত্র
বাঁধ আজ রাতে
কাটা হবে—

এসো, অলক্ষিত কাছিম-দেবতা,
পিঠে কালো মেঘ, ফাটা তক্তা, ধ্বংসের. জীবন ও মৃত্যুর
মাঝে যেই বিভাজন
তার সেতু—
পতন-উন্মুখ, ক্ষয়পিতা, পাতা ও শৈবালে ঢাকা গর্তসহ,
ও-অস্তিত্বে বহু ফাঁক, বহু পথিকের জলে-পড়ে-যাওয়া,
জটাফুল তোমার ভক্ষণ—
ঐ বুজে আসা চোখে যে-আলোকবিন্দুটুকু জ্বলন্ত অঙ্গার
তা কি ক্ষুধার স্বরূপ নয়?

বেলা পড়ে আসে।
স্তব্ধ চাষের ক্ষেত, তৈলবীজ-মন্দির ও সরখেল-বাটি—
ছেলেরা স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরছে, শ্রাবণমেঘের তলে হাততালি,
বর্ষার আঁধার বিকেল—
স্রোত বিপদসীমার উপরে বইছে,
গ্রাম প্লাবনসীমার মুখোমুখি,
উলঙ্গের অর্থনীতি, অন্ধের ভূগোল আর বধিরের ইতিহাস—
কে কাকে আশ্রয় দেবে?
আজ রাতে
কাটা হবে এই বাঁধ।

ক্ষুধা-পিপাসা

১
খর্ব, খোঁড়া, পারঙ্গম— তার চোখ আমাতে লেগেছে।
চৌকাঠে মাদুর পেতে বসে থাকি। হাসি নয়। নীরবতা হয়।
গজগমনের রোষে টলোমল নৌকা দু'টি। হ্যাঁ গা, এঁরা কি বাস্তব?
আমি সেনানীর মতো, দেখি এই কাঁকুড়জাঙালে
সহিসবিযুক্ত অশ্বে শ্বেত রানি, কালো রানি,
পত্রহীন ডালে ডালে সূর্যের বিষাক্ত ছাল— কোকিল কি
মরেছে মাদুরে? তার শব উকুনবাস্তব?
—শোনো, সে-ও বলে— হেথা যে-মেয়েটি দেখছ এ তোমার কন্যা যেন,
একে ক্রিশ্চান রুটির মতো টুকরো করো, গুচ্ছ আঙুরে পেষো, মদ হবে,
পুণ্য পান, তুমি হও নিজের পিপাসা— বাতাসে উড়ন্ত এক বীজপশু—
সেই ধর্ম তোমাতে লেগেছে।

২
বীজ সেই, যাকে নাম ধরে ডাকি।
সে জেগে ওঠে খিদের জগতে, পশুহননের সন্ধ্যায়, ধুলোর ঝড়ে,
তুমি তো আমায় বড়ো আতান্তরে ফেললে হে—ঐ তার
আক্ষেপ শোনো। তাকে ডেকে আমি যদি কোনও ভুল করে থাকি
তবে হয়ত তোমাদেরই তার দাম দিতে হবে।

আমি দূরে পালিয়ে যাব ভাতের থালা থেকে—
তেপায়া টেবিলের নিচে লুকিয়ে থাকব আমি—
চেষ্টা করব যাতে খাবার ভর্তি টিফিন-ক্যারিয়ার কোনোদিন না খোলে—
দরজার আড়াল থেকে, ছাদের কার্নিশ থেকে, নারকেল গাছের
মাথা থেকে তাকে আমি দু'বেলা ডাকি
সে একমাত্র আমার ডাকেই সাড়া দেয়
—জানে ইল্বল তাকে ডাকছে।

নয়নতারা আন্তিগোনে

একদিন নিশ্চেতনা এসে ছুঁয়েছিল এ-মোহশরীর। আমার অবাক লাগে। হেসে বলি— 'তুই কাদের দুলালী?' দেখিনি পাশার দান ওর হাতে, দেখিনি সে-রক্তমাখা তীর, চাদরে লুকানো তার প্রিয় পাখি, বাজপাখি, ডেকে ওঠে— 'শালী...'

রেগে ওঠে অর্ধদেবতা যারা। নিশ্চেতনা করেছিল ভুল আমার নিকটে এসে। ভেবেছিল আমি তার সহোদর। ভেবেছিল আমার মতন তারও জন্মের ঠিক নেই। হায়, আমারই মতন তার কাঁচাপাকা চুল, রোদ্দুরে জ্বলে যাওয়া রং বহু পাহাড়ের, বহু এপ্রিলবরণ

উত্তরীয় খসে গেছে কাঁধ থেকে। আমি দু'একটি লেখা শুধু চেয়েছি লুকাতে এই চুলে, এই ভাঁজে। হুরী নিশ্চেতনা চেয়েছিল পাখি কথাবলা। ভুল হয়েছিল তার। যে-ভুলে তোমরা পরো হাতকড়া হাতে, গলায় গভীর ফাঁস। জেনে রাখো,— রোগ, তাপ, বিদেহ জন্মের কলা-

কৈবল্য মানি না আমি। অনুধাবনের মতো কালো দুর্গ আজ তাই প্রহরীবিহীন। মশাল জ্বলেনি রাতে। তাই এত ঘোলা জল কাদা-সমুদ্রের থেকে উঠে এসে পাথরে, দেয়ালে ছিটকে-ছড়িয়ে পড়ছে। 'নিশ্চেতনা, তুমি ভগ্নী, কাদের অধীন? অশান্ত মীনের দল লাফ দেয় উঁচু থেকে, কেন বোন, সুতো ছেঁড়া জালে?'

সংহিতা

১

রঙে ছুপানো হাত এই, হে বৈয়াকরণিক,
জানি, পাণিনি তোমার নাম, ঋকনাথ, দিক
তোমাতে চিহ্নিত হয়, বর্ণভাঙা শ্লেষাত্মক লাল
রাক্ষসরক্তের বুকে মীনাঙ্কন হলুদ সকাল,
দ্যাখো পাথরবালিশ, এই কব্জির উত্থান, এই পাতাছেঁড়া বই
অযত্নে লিখিত, পাশে গালামোহরের উল্কি, কই
চর্চাফুল, স্নেহফল? কিছু যারা দিতে পারে তারা
বুঝি এখনো আসেনি? হায়, হাত দু'টি অন্ধপারা
রঙে লিপ্ত, জ্যোতিহীন, দেয়াল আঁকড়ে ধরে আগুয়ান—
প্রকৃতিপ্রত্যয়বোধে, ধাতুরূপে, যা-কিছু প্রমাণ
মানবউক্তিতে আছে— এই ধন্দে ; তাকে ছন্দের নিয়তি
গুহার গভীরে ডাকে, খাদের খনিজে ডাকে, সতী
জ্বলন্ত আগুনে ডাকে ; আজ কবিতা বা অন্ত্যমিল তথা
শুধু রঙ, চিত্রার্পিত রেখাপাত— নয় কোনো কথা।

২

এ-দেহ সঙ্কেতময়, তুমি পড়ো, তুমি পাঠ করো,
পাঁচটি আঙুলে ধরা অস্ত্রখণ্ড, তবু মন ভয়ে জড়োসড়ো—

ললাট আলেখ্যপ্রায়, ধাতা জগতের এ-প্রতিফলন,
দেহ, যার ক্ষয় নেই, অশ্বহীন রণ,

সেতুহীন নদী, তার ঘাটে ঘাটে জ্বলছে শিবির,
গতরাত্রির যুদ্ধে, ক্ষপণক, তুমি নাকি বীর

প্রতিপন্ন হয়েছিলে? অন্য পাড়ে কারা ছিল—কাদের বিলাপ
এখনও শুনছ তুমি? জানো, যুদ্ধ শেষ। শুধু হিংসার অবলীঢ় তাপ

কিছু অবশিষ্ট আছে। আছে বটবৃক্ষে মানত, বাঁধুনি
এবং দেয়াল ঘেঁষে, মৃত্তিকায়, ফেটে যাওয়া মূর্তি শাক্যমুনি।

বিম্ব যেটুকু দেখায়

১

বাগান, ফলের ক্ষেত্র, শতদল, ভুল হয়েছিল,
শীল হাসির আড়ালে যে-বায়ু ধাবিত হয়
তার নাম পদ্মপাতা, কড়ে আঙুলের বরাভয়,
নিশ্চিত আমি যে তার পাপ-পুণ্য বুঝে ফেলে খাটো চুল,
ধ্বজাধারী, শিহরে কদম্ব, তাকে লোভে পাই, দৃষ্টিক্ষুধায় পাই
বলি— ধন্য গুজবের মতো এত নক্সা ছিটাও বাগানে।

২

গুল্মভেদী যে-কামান— শিকড়েবাকড়ে তার জন্ম হয়েছিল।
পৌরাণিক, অথচ পুরাণে নয়, আম্মার মনগড়া, জারক লেবুর শিশি ভেঙেছিল,
চোর ছিল— আচার, মিষ্টির হাঁড়ি খুলে খেত— এত নোলা,
এখনও কবর তার উচ্ছিষ্টআবৃত,
শালের পাতায় আর মাটির খুরিতে এঁটো,
পচন ধরেছে, তার দেহে, এ-তরফে প্রতিক্রিয়া পচনবিমুখ।

অতিথি

১

শালের মামল্ল পাতা--পিয়ালের কিরাত-বিশ্রাম।
যায় দিন। তুমি কি যাবে না?
দেখি ঐ কূর্মরেখা, শামুকলালার চিহ্ন, গৃহমণি রোদ্দুরে জ্বলছে,
তুমি এদেশে রয়েছ—
যেমন রয়েছে গজ, উড়ুক্কু জামাই আর সফেদ সাবানগুঁড়ো,
যেমন রয়েছে মিথ্যা— অর্ধসত্যের ঘুমে! স্নানের একটু আগে
বাগান খেচরস্তব্ধ। কিছুকাল এমনই ঘটছে—
সকলে জানতে চাইছে তুমি আর কতদিন এদেশে থাকবে।

২

দ্রাক্ষালতা হতে আমি পতনজনিত
এক সম্বর্ধনা

তীক্ষ্ণতম এই যে-শোনিত
তুমি বুঝে নাও

সবাই চলেছে ছুটে জ্বলন্ত পেট্রোলরেখা ধরে
শোধনাগারের দিকে—

পানপাত্র, আমিও বিদায় চাই।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তিম রচনা

জড়িত দিন, জড়িত রাত
চন্দ্র উদয়ে এই দু'টি হাত
সহসা মলিন সাগরবেলায়
চিহ্নে চিহ্নে যাদের মেলায়
তারা ক্ষতবহ, যুদ্ধে বিজয়ী
আনন্দময়, আনন্দময়ী,

বিদ্যুৎহীন এ-লেখা সকল
পাবে কশাঘাত— অশনিফসল—
যখন রাতের উন্মাদগান
মেঘজর্জর রক্তসাবান
জলে ধুয়ে দেবে, ছিঁড়ে নেবে বায়ু
স্নায়ু-যুদ্ধের অধিক যে-স্নায়ু

হেথা কী চাইবে ওগো যূথত্রয়—
হে আনন্দময়ী,. হে আনন্দময়,
আর যারা মৃত— মৃতের সমান?
সৈকতব্যাপী সিন্ধুকামান
গর্জায় শুধু। তার ক্ষমা নাই।
আমি জেগে উঠি। আমি ঘুম যাই।

সলমা-জরির কাজ

[redacted] অন্তর জলে আমি দাঁড়িয়ে দিয়েছি, বিদ্যুৎ সরবরাহ [illegible]
[redacted] কত্থকীর নাচ [redacted] [illegible] দিগন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে বেলে নাচ
[illegible]

আমাকে নাচতে দাও, ওগো ঐ পাথরকুচির 'পরে ছুরিশানের মতো জায়গা
ছেড়ো, নিচের খাদের নদীর দিকে তাকিয়ে দেখার মাথা ঘোরে, সেই
ঘোর, [redacted] সেই অনুভূতি, সেই পড়ে-যাই পড়ে-যাই ভেবে, আমি কুন্তলাকার,
পড়ি ঘুরে যেতে চাই, আমি লোহার লাটিম, আমি উড়ু-কাগজ, [redacted]
জলনিকাশির টান, নৃত্যযোনি, উড়ন্ত, জলকামী ময়ূরকে, নাভিগহ্বর
প্রান্ত, শুধু ঘুরি, চক্রাকারে, নিজের মধ্যে নাচি, বাইরে দ্বিপদে নাচি,
নাচি পেশী ও চিবুকে, নাচি উপবীত থেকে খুলে, আঁচলে, কাছায়,
বোতামঘরের ফাঁকে, নাচি যৌনশক্তি-উৎপাদনে, নাচি গোপাল গোপাল
মনে, নাচি বিস্ফারিত ঘূর্ণিপদে, পাথরকুচির 'পরে স্নান রেখে,
এই নাচ দুঃখাতুর নয়, খুড়ো হাড় কতো না ভেঙেছি জানে, পাটাতনে
ঠিকরে যাই, কাঁকড়ে ছড়িয়েছে হাঁটু, নাচে নেচে নেচে সিঁকে হয়ে উঠি,
দ্যাখো ঘূর্ণিটানে সমস্ত খসেছে, খুলে হারিয়ে গিয়েছে, শুধু নাচ ছাড়া,
শুধু পাক খাওয়া ছাড়া আর কিছু সম্পত্তি বলে কিছু নেই [redacted], নাচি
নূপুরবিহীন পায়ে, পথে ও বিপথে, নাচ ঐ [illegible]-এ বিষতলা
যাবে, পিতা শিকারে গিয়েছে তাই নাচি, মা যে বীন বাজে তাই নাচি,
ঘোর লাগে, বেহুঁশ-নিস্তেজের শোকে ডুবে যাই, টের পাই অসাড়ে-
সলিলে, ছুঁলো ছিটানোর ফোঁটে [redacted] শিখা, জাগে প্রাণ, পোড়ে
পোড়া [redacted] ও গন্ধক, জাগে ঘ্রাণ, মূর্ছা ও মৃত্যু যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে
পাক খায়, বস্তি-বস্তি ভাব, তাদের অজগর ডাকো, আপাদমস্তক
দেখিও আমাকে ঘিরে পাক খাক, উন্মুক্ত যুবতী, নাচুক আমার সঙ্গে,
আমাকে নাচতে দাও, দেশকাপুর নিয়ে, ছুতো ও পৌত্তি নিয়ে, চাই
পারিজাতকুলে নাচি, একতলীসোপানে, মার্বেলপাথরে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
দোষে নাচ [redacted] আসে, সে তো আসবেই, ওগো ও-পাথরকুচির
'পরে যেন নাচ থাকে, সবসাজতির ফাঁকে নাচ গুঁজে দিই,
ডাকটিকিটের পাশে একটুকরো নাচ আঁকি, চিঠি যায় দেশান্তরে,
পাক খায়, ফিরে আসে, প্রাপক-যে কোনকালে মরে-হেজে গেছে,
তাই নাচ, মৃত্যুর খবরে নাচ, ঠিকানা বদলে নাচ, খেলা যদি
করে থাকো নাচ করো, পাখা যদি দিয়ে থাকো পাক খাও,
নাচো আমার দু-হাত ধরে, [redacted] কোমর জাপটে ধরে, এসো
নাচবৃদ্ধি দিয়ে সবকিছু [redacted]
ছেড়ে ফেলি—

‘সলমা-জরির কাজ’-য়ের উৎসর্গপত্র

আমাকে নাচতে দাও, ওগো ওই পাথরটুকুর ’পরে ঘূর্ণিপাকের মতো জায়গা ছেড়ো, নিচে খাদের নদীর দিকে তাকিয়ে যেমন মাথা ঘোরে, সেই ঘোর, সেই অসুস্থতা, সেই পড়ে-যাই পড়ে-যাই বোধ, আমি কুলোপানা, শুধু ঘুরে যেতে চাই, আমি লোহার লাটিম, আমি তন্তু-কাপাশ, তকলিকাটার টান, নৃত্য-যোনি, উভচর, জলবাসী বায়ুভুক, নাভি-পরবশ প্রাণ, শুধু ঘুরি, চক্রাকারে, নিজের মধ্যে নাচি, বাহুতে দ্বিপদে নাচি, নাচি পেশী ও চিবুকে, নাচি উপবীত থেকে ঝুলে, আঁচলে, কাছায়, বোতাম-ঘরের ফাঁকে, নাচি সৌরশক্তি উৎপাদনে, নাচি গোপাল গোপাল বলে, নাচি ধর্মান্তরিত খৃস্ট-পদে, পাথরটুকুর ’পরে স্থান রেখো, এই নাচ ফুরাবার নয়, বুড়ো হাড় কত-না ভেল্কি জানে, কাঁটাবনে বিঁধে যাই, কাঁকরে ছড়েছে হাঁটু, পড়ে যেতে যেতে সিধে হয়ে উঠি, দ্যাখো ঘূর্ণিটানে সমস্ত খসেছে, খুলে হারিয়ে গিয়েছে, শুধু নাচ ছাড়া, শুধু পাক-খাওয়া ছাড়া আর বিষয়-সম্পত্তি বলে কিছু নেই, নাচি ঘুঙুরবিহীন পায়ে, পথে ও বিপথে, নাচ ওই বাস-য়ে ধর্মতলা যাবে, পিতা শিকারে গিয়েছে তাই নাচি, মা যে ধান ঝাড়ে তাই নাচি, ঘোর লাগে, বেঙাপিতলের লোভে পাক খাই, টলে পড়ি আসানে-মুস্কিলে, ধুনো ছিটানোর তোড়ে জ্বলে শিখা, জাগে প্রাণ, পোড়ে সোরা ও গন্ধক, জাগে ঘ্রাণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে পাক খায়, বমি-বমি ভাব, তাহলে ডাক্তার ডাকো, অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি-কে ঘিরে পাক খাক, ভিষক তুফানী, নাচুক আমার সঙ্গে, আমাকে নাচতে দাও, লেপ-কম্বল নিয়ে, ছাতা ও বর্ষাতি নিয়ে, চাই গণিতমুকুলে নাচি, ব্রততীসোপানে, মার্বেল পাথরে, ভিক্টোরিয়া সৌধ দেখে নাচ আসে, সে তো আসবেই, ওগো ও-পাথরটুকুর ’পরে যেন নাচ থাকে, সলমা-জরির ফাঁকে নাচ গুঁজে দিই, ডাকটিকিটের পাশে এক টুকরো নাচ আঁকি, চিঠি যায় দেশান্তরে, পাক খায়, ফিরে আসে, প্রাপক-সে কোন্‌কালে মরে-হেজে গেছে, তাই নাচ, মৃত্যুর খবরে নাচ, ঠিকানা বদলে নাচ, ফেল যদি করে থাকো নাচ করো, পাশ যদি দিয়ে থাকো পাক খাও, নাচো আমার দু-হাত ধরে, কোমর জাপ্টে ধরে, এসো নাচবুদ্ধি দিয়ে সব কিছু জেনে ফেলি।

সলমা-জরির কাজ

১

লিখিত অনুমতি এসেছিল
তরঙ্গসকাশে
চাঁদ তার টুকরোগুলি জলে নিয়ে ভাসে,

দুই পাড় সামান্য রশির
বাঁধনে সংযত
স্থ প্রাণীদের মতো

যা-কিছু চেয়েছি আমি
ঋণপত্রে, প্রত্যয়িত চিঠির নকলে—
তারা চলেছে সকলে

জলে ভেসে—এক সার
অক্ষরের ক্রমে,

চাঁদহাঁস সবার প্রথমে।

২

        কী চৈতন্যসুধা
আমি করেছিলাম পান
            করেছিলাম ক্ষুধা
নিবৃত্তি ও গান
        গেয়েছিলাম সুরহীনা
            হীনমন্যতার—
        সে এক পাহাড়।

        বাঘের আঘ্রাণ
সব্জি ও ভাতে,
            জ্বালানি আঘাতে
                শিখা লেলিহান

ছায়ার মতন দীনা
দৃশ্য ও দৃশ্যমান যার
এ মৌন আহার—

রেখো মা দাসীরে
মনে, শিরোমন,
কপোল প্লাবিত নীরে, এই ধন,
এ-ঐশ্বর্য, এ-সংসারতীরে
বহু ক্ষুধা-সমারোহ, বহু তাপ,
আগুন-উল্কির ছাপ-— যার
ক্রীড়া স্তব্ধতার

তাই গাই গান,
স্ফুট শব্দে— পাঠ-নিরন্তরে
যদি বা কঠোরে
কোমলতা পায় স্থান,
তারার আলোর মতো
এত দুর্গলিত ক্ষত— ভুলো না আমার
দেহ দেবতার।

৩
উজ্জ্বল বালিশ আর মেঘে-ঢাকা লেপ
আঁধার গালিচা, ভৃঙ্গ গুগ্‌গুল রুপালি
আগুনে পুড়ছে, কোটা থেকে এসেছে পাথর,
ভূপালের লাল ইঁট, নিচু জমিতে ত্রিকোণ
গৃহ আজও অসমাপ্ত, গাছ নিম ও ডালিম,
ডুমুরপাতার ছায়া চমৎকার, বাড়ি কবে শেষ হবে?

কান্নাহীন হাসিকান্না— এ নাকি উত্তর?

৪
উড়ন্ত ষাঁড়, গজসিংহমুখ,
শিশুকঙ্কাল, সাগরে অনল,
ফলবান মাছ, কাপড়সারস,

পিয়াসী শস্য, মরুনৌযান,
জন্মবিজন তৃষামন্দির
ঐ দেখা যায়, এসো হাত পাতি,
কৃতকরপুট, বলো : জল দাও,

—এইসব নিয়ে হাসির ফোয়ারা।

৫

মৌলিক স্বাস্থ্যচর্চা করে যারা নাম কিনেছে তাদের সঙ্গে দু-এক বছর আমি হা-হা হি-হি করে বুঝেছি যে নতুন মেম্বারদের স্বেদবিন্দু বলে ডাকলে চটে যায় এবং বলে—রাখুন আপনাদের ও-সব ন্যাকা ন্যাকা বাংলা কথা, আমাদের সার বলুন, মাস্টার বলুন, ওদিকে কোচেন্দ্রমশাই শিখিয়ে দিয়েছেন ওদের ঘাটের মড়া বলে ডাকবি, প্যারালাল-বার ছুঁতে দিবি না আর নিজেদের জামাজুতোর দিকে সর্বদা নজর রাখবি, শালারা মহা হারামি, বাপ চোর, মা চোর, নিজেদের জন্মের ঠিক নেই, সবাই তো আর কেশববাবু নন, (দু-হাত কপালে ছুঁইয়ে) রোজুবাবু নয়, আর এই আরেক শালা কাগের উৎপাতে, নতুন কেনা গামছাটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেল, সক্কালে বড় এক গ্লাস দুধে ছ-টা মুরগির ডিম গুলে, বাপ্‌স, আর বলবেন না গুরু, শুনেই মনে হচ্ছে দেড়-শ কেজি লোহা তুলে ফেললুম, দূর ব্যাটা, ডিমে-দুধে থাকলে লেবুকুমার হবি, আলতা কাত্তিক হবি, এই ফেলা চাটুজ্জে হতে পারবিনে, ছ-মাস শুধু খালি হাতে ডন-বোট্‌কি, আর দুলে-র মালিশ, তারপর তোর মা পর্যন্ত তোকে দেখে ঘোমটা টানবে যেন বাইরের কেউ এয়েচেন, আর আগ্রার দিকে যদি কখনো যাস তো আমাদের মেন অফিসে ছোটো নেতাইয়ের ফটোখান দেখে আসিস, জাতে ছেল কৈবর্ত, পাইকেরেদের ঝুড়ি থেকে কড়ে আঙুল কান্‌কোয় ঢুকিয়ে বাইশ কেজি কাতলা তুলতে পারতো, তা সেই উঠতি বয়েসে উনি বাই ধরলেন তাজমহল দেখবেন, দ্যাখ্ তোর ঐতিহাসিক স্থান, সান্নিপাতিক, দু-দিনের মাথায়, যাকে বলে কিনা প্রবাসে দৈবের বশে, কার লেখা আঁচ করে দেকি, কার আবার, আমাদের রোববাবুর, কুস্তি শিখেছিলেন, উনি, মানে রবিবাবু, রেগুলার সাহিত্যচর্চা করতেন।

৬

ছোটো, চাকালাগানো, তেপায়া, ফোল্ডিং, হাল্কামতো, টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, ঘরে ঘরে, বারান্দায়, বেডসাইডে, ট্রলি-জাতীয়, মাঝারি মাপে (একটু বড়, দাম বেশি) খুলে ব্যাগেও ভরে নেওয়া যেতে পারে, ঐ ভাবে আসে, দোকানে বা ডাকযোগে, নিজেদের জুড়ে নিতে হয়, দক্ষতার প্রয়োজন নেই, একটা ছোটো রেঞ্জ হলেই হল, মেয়েরাও পারে, বাস-য়ে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা যায়, মানে ঐ কার্টন, বাড়িতে এনে খোলা

এবং জোড়া, গায়ে দাম ও সাইজ লেখা, রঙ নীল ও সাদা, (লালটা বাজারে আসেনি, এসে যাবে) একটি মেয়ের ছবি, হাসিমুখ, কোথায় যেন দেখেছি, লিরিল কি, জুড়ে ফেলেছে, দু-হাত উপরে তুলে আনন্দ প্রকাশ করছে, মেয়েটি, ঐ বাক্সের ছবি, উল্টালে ফলঝুড়ি, আনারস, কালো আঙুর, একগুচ্ছ দানাদার শস্য, ছবি আর-কী, উপচে পড়ছে, পাশেই সুরাপাত্র, ভৃঙ্গার, হাফ-চুমুক সাকীগেলাস, সরবত কি, আশ্চর্য, রোগীর মাথার কাছে, আরেকটি ছবি ওষুধ, নাইটল্যাম্প, অ্যালার্মঘড়ি, বাক্সের আরেক পিঠে, একটু বেঁকে, ওরলি (বোম্বে), খুকি কেমন সুন্দর লেখাপড়া করছে, খাতা-বই-রুলার, অঙ্ক কষছে, বাহবা, উত্তর মিলেছে, ঐ ছবিতে এবং আরেকটু ঘোরালেই, অর্থাৎ চতুর্থ দিকে, ঐ বাক্সে, প্রস্তুতকারক বাবাসাহেব অরোরা-র গোঁফে তা দেওয়া রেখাচিত্র, ধর্মভীরু ওম্ এনটারপ্রাইজ, বোম্বে (ওরলি) প্রথম ভারতীয় প্ল্যাস্টিক আসবাবের জনক, ঐ বাবা, কিনে ফেলি তাহলে, রক্ষে করো বাবা, এইটুকু ফ্ল্যাটে আবার একটা টেবিল, আমরা কি সাহেব?

৭

বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই তোমার বাজারে অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা-বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো, বন্ধু।

৮

রাশভারী জল
      কাশভারী তীর
এই নদীটির

ছিপ ও নৌকা
      হেথা কেড়ে নিলে
বোয়ালে ও চিলে

সে তবে এখন
      যাবে চলে কাশী?
—নিরামিষাশী?

নাকি নৌকার
    সন্ধানে যাবে
—সকলের আগে?

বৃথা উদ্যম—
    তাকে দিয়ে আর
কিছু না-হবার

এখানে থাকবে
    যতদিন হয়
ক্ষীর নদী বয়

যতদিন ছিপ
    ফিরে না আসছে
জলে না ভাসছে

সাধের নৌকা।

৯
এইখানে আমি--
অর্ধোন্মাদ, বজ্রকলঙ্কিত,

উলঙ্গের মুখোমুখি
আরেক বিবস্ত্রা, বলি :

ভালোবাসা, সে কি ভুল?
লিখে রাখি দেহতাপ, প্রসারমালিনী
এই ফুলবনে শুয়েছিল,
লিখে রাখি ঘাস
আধিক্য পেয়েছে,
লিখে রাখি কীট
মিথ্যা বলে থাকে, আর

নশ্বরতা বজ্ররূপবান।

১০

যখন বিকেলবেলায় লোকে সিঙাড়া খায়, জিলিপি খায়, জলকচুরি খায়, চায়ের দোকানে ভিড় করে আর রোল-কর্নারে দাঁড়িয়ে পড়ে, যখন কফি-শপ-য়ে জল ফোটে, উষ্ণ নুডল ঝরে গরম তাওয়া থেকে, যখন ক্যাসেটের দোকানে ঝলমলে গান বেজে ওঠে, যখন চুলবাঁধা ফিতেটা দাঁতে চেপে মেজদি ছাদের আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখে— ওমা, ওঁরা সবাই এসে গেছেন, পড়ন্ত আলোর দেবতা, কমলেকামিনী, রাত্রির কিন্নর, বরাহ অবতার, রাক্ষসদল, অশ্বিনীকুমার দু-জন, তাঁদেরও আড়ালে মারাঙবুরু পাহাড়ের সিঁদুরমাখা পাথরখণ্ড, শিরীষগাছের ঝুলন্ত নগ্নদেহ, গায়ে আগুনলাগা অসুরপত্নী—তখন এই পুণ্য শহর কলকাতার উপর, সবাইকে নমস্কার জানাতে জানাতে, ধীরে ধীরে, অন্ধকার নেমে আসে।

১১

জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে
যেন আমার ছেলেবেলার কুসুমপুরে বিয়ে

ন-মাসিমার। হে শুকতারা, হে হিমতারাসকল,
ছড়ায় থাকো, ছন্দে থাকো, রৌদ্রবাহী জল

সাঁকোর নিচে জীবিত থাকো, ট্যাঙরা মাছও প্রাণী,
বস্তু শুধু শাশুড়িমাতা, তাঁর পানের বাটাখানি

বস্তুবাচক। বয়েস হল অনেক, হল বয়েস,
মানুষ বুড়ো, বৃক্ষ বুড়ো, বুড়ো আমার দেশ,

শোলার মধ্যে আগুন, আর আগুনপোড়া খড়,
হেসে বলি ওরে জামাই আমরা যে তোর ঘর

ন-মাসিটি নামেই মাসি, বোনের চেয়ে পাজি,
স্বর্গে যাবে, নরকে যাবে, হায়, কুসুমপুরেও রাজি

জন্মমতো চলে যেতে, যাবেন শ্মশানঘাট দিয়ে,
সেথা জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে।

১২

গিয়েছে ভাবুকবৃত্তি। তাই আজ পশুপাখিদের সঙ্গে
খোশগল্প করে থাকি। গান গাই। ওরা শোনে।
এই তো সেদিন ঈগল বল্লে ডেকে, ‘ঐ কোকিলের চেয়ে
তোমার রেওয়াজ ভালো।’ হয়ত বানানো কথা, খোসামুদি,
কিন্তু আমাকে কেন? শেয়াল বোঝে না গান, অতশত প্রাণপাত,
সে-ও বলে, ‘বিকেল চারটে প্রায়, একটু ছানামিছ্‌রি খাও।’

১৩

এ-দেহ সুন্দর নয়, মন তাকে সাজায় সমৃদ্ধে,
চন্দনবিষয়ে আর সাবানের জলীয় ফেনায়,
ক্ষতমুখ মলমে ঢাকে, কালশিটে প্রসঙ্গে বরফ
কিনে আনে, মন ঐ মতো শরীরকে ভালোবাসে,
উহ্য রাখে কিছু তার বদমায়েসির গল্প, কিছু গোপনচারিতা,
গত একুশে এপ্রিল রাতে কোথায় সে ছিল আজ আমরা তো জানি,
মন বোকা সেজে থাকে, যেন সাতে-পাঁচে নেই,
খুন-দেখা প্রতিবেশীদের মতো, শরীর সমস্ত বোঝে, ঠাট্টা করে,
দু-হাত উঁচুতে ছুঁড়ে গান ধরে— ভোলা মন, ভোলা মন রে আমার।

১৪

শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড় আর বেশি দূরে নয়
নইলে এমন হাঁপাচ্ছি কেন? কেন ওষুধে সারে না?
ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠলে এ-বছর কী দেখব কে জানে—
যে-পাথরে আমরা সবাই নাম লিখেছিলাম সেটি হয়ত
নীচে গড়িয়ে পড়ে গেছে,
যে-জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে ঘুরিয়ে
চাষজমির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল—
যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর তাকে আমি খুঁজে পাবো না,
এইসব ভাবি আর হাসপাতালের বিছানা শুকনো ডালপালায়,
ছেঁড়া কাগজে আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে ভরে ওঠে-
এত জঞ্জাল সরাবে কে? আমি কি সময় করে উঠতে পারবো?
আমি তো ফুলডুঙরি পাহাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছি।
চেপারামের ঘরটা
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পা চালিয়ে
উঠে গেলেই হয়।

১৫
সান্ধ্য উমাকীর্তিবাবুর চরণাশ্রিত সঙ্গীত
গাই, নৃপেননায়েব, নারায়ণ
নাথ, মধ্যপদ নামের যাহার, উমাচরণবাবুর বেয়াই
কীর্তি রায়, হালতুবাসী, বর্তমানে শ্রীকাশীধামে,
আখড়াধারী, বলেন : 'এ-সব গান-ফানে আর ক'দিন যাবে?
মূলাধারে যে-পদ্মটি আছে তাহার ব্যবস্থাদি
কেমন বুঝছো?' 'আজ্ঞে, আপনি ঠিক যেমনটি-সে
রেখে গেছেন তেম্‌নি আছে, অসূর্যম্পশ্য,
নাকি ঐ-জাতীয় বিভেদকথা,'
বাবু, মানে কীর্তিবাবু, প্রীত হলেন, এ তো দোয়ারকিদের
ফাজলেমি নয়, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রাগ-য়ে বসলেন,
বাঁয়া-তবলায় এই শ্রীযুত, নৃপেন্দ্রনাথ, সারেঙ্গীতে
বেষ্টুপুরী অঘোরচন্দ্র বাবাজীবন, দীর্ঘজীবন,
হেতুবাদী, যন্ত্রে দড়, বাঈজিদের ভেড়ুয়া ছিলেন,
বছর দশেক আগের কথা, এখন ওনার স্বাধীনবৃত্তি,
মেটেবুরুজে জাহাজ নামান, নিজের বাড়ি,
উমাবাবুর গাড়ি ওঁকে পৌঁছে দেবে, আমি কিন্তু
হেঁটে ফিরব, কাছেই নিবাস, আকাশে ঐ অত তারার
ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরব—
কারণ আমার কীর্তিবাবু জীবিত আছেন, উমাবাবুর অর্শকষ্ট,
তবে ও কিছু নয়।

১৬
এই যে তোমরা যারা লাউপাতা হয়ে জন্মেছ তোমাদের মধ্যে এক হিলহিলে সবুজ সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার হাঁকডাকে লোক জড়ো হয়েছে। ইঁট, লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসেছে ওরা সাপটাকে মারবে বলে। আমি আঙুল তুলে স্পষ্ট তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ঐ, ঐ যে চলে যাচ্ছে, দ্যাখো, লুকিয়ে পড়ল, আবার মাথা তুলছে, দু-একটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে আমি এ-ও বোঝাতে শুরু করি, দেখতে পাচ্ছ, ঐ সাপ, লাউডগা, কেমন রঙে রঙ মিশিয়ে বেঁচে আছে, প্রকৃতির রহস্য। কিন্তু উপস্থিত সবাই হাসতে থাকে, দূর দূর, কোথায় লতাপাতা, কোথায় সাপ, ও তো গোপালদের বাড়ির লোকেরা, ঐ তো সারদা বাজার করে ফিরছে, জনার্দনবাবু কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন...

আশ্চর্য। আবার ভুল হল!

১৭

মনে হয় সত্য-মিথ্যার যমজজন্মের আগে গান ছিল।
তারা লায়েক হয়ে ওঠার আগে, চুলে টেরি কাটতে শেখারও আগে,
পাশের তাঁবুর মেয়েটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকার অনেক অনেক আগে,
অর্থাৎ, এক দূর পতাকাবাহী ইতিহাসে—
যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের ফাঁকে ফাঁকে তারা আড়চোখে নিশ্চয়ই দেখেছিল
বাগানের এই ছোট্ট জলের পাম্পটিকে—
দুপুরের রোদে মালীদের ঘরের লাগোয়া ঐ মেশিন সেদিনও
গুনগুন করে ঘুরত, গান গাইত— আর তার শেড-য়ের উপর
ঝরে পড়ত অসংখ্য শাদা, গন্ধহীন, করবী ফুল।

১৮

আমিষ, তুমি প্রশংসনীয়
ফল, তুমি লোকায়তিক
বচসা, তুমি বিদ্যুৎবাহী
আমি গীতময় এক সৃষ্ট জগৎ

চঞ্চলতার নামগানে ভাসি
কৃষিকাজ আমি নিভৃতে জেনেছি
নিরামিষাশীর মুখোমুখি এই
উদ্ভিদপ্রাণ রটনা গাছটি

নটেশাক, তুমি অকূলপাথার
বুনো ওল, তুমি আমাকে বলো
সত্যবাদিতা কেমন আঁধার
মাটির নীচের শিকড়বাকড়

ছোটোভাবে হাসি, নিজেকে বোঝাই
'তুমি দেহাতীত, কূটভাবনার
প্রাকারসন্ধ্যা, বিরতযুদ্ধ,
দুর্গ অটুট, অস্ত্র অটুট

তুমি পাখিপ্রাণ, তুমি উদ্ভিদ,
কৌশল আর কুশলতা টিয়া

নাও, খুঁটে খাও পুরপিতাদের
হাতে ধরা ফল রক্তঠোকরে’।

১৯
ওঠো প্রাণ, জেগে ওঠো প্রত্যন্তপ্রদেশে,
খোলামেলা হাসিগানে, কালীপ্রসন্নের শ্লেষে,

জেগে রও দিনমান কর্মে ও ভাষায়
বৃষ্টিনাশা ধানক্ষেতে যতদূর চোখ যায়

কাঁঠালে ছায়ায় জন্মে, কাঁঠালছায়ায়
বঙ্কিমের প্রেতবিম্ব লুটোপুটি যায়

দীনবন্ধু সৌধে চড়ে, হরিশে মধুপ
ঈশ্বর চেনালে ভাষা, আলোড়িত কূপ

শিবনাথে নমস্কার, প্রণাম ভগিনী
জোড়াসাঁকো ধূলিকণা স্বর্ণতৌলে কিনি

রয়েছেন এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয়,
পিতৃকুল মাতৃকুল পরম্পরাপ্রিয়,

গেয়েছি সামান্য গান, হয়েছি উদ্বেল
পাঠান্তে দান্তে-কবি, আর্নো দানিয়েল,

শত নাম উহ্য থাকে স্মরণসকাশে
শ্রেয়তর অন্ত্যমিল সহজে না আসে

জাগো প্রাণ, তুষ্ট হও, যদি চাও আরো
কঠিন বিচারে এই বিহগে বিচারো

রেখেছে শারদশশী নৌকা ভাসমান
বিচারান্তে নিয়ে যাবে পশ্চিম মশান।

অগ্রন্থিত কবিতা

১

এই যে বাতাসটুকু বইছে আজ আষাঢ়ের সকালবেলায় কোন্ দূর সমুদ্রের ভিতর এক গাঙচিলের ডানার ঝাপটে তার প্রস্তাব হয়েছিল— সে ছিল এক নাবিকের প্রার্থনার উত্তর— জলযান ক্ষিপ্ত হয়েছিল— তুঙ্গ ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল পাথুরে সৈকতে— গর্জনকারী চল্লিশা ঐ বাতাসের প্ররোচনায় মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবাহী সঙ্কেতবার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল 'চলো, নামি'— আরেক দিগন্তে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘোষণা করেছিল 'আষাঢ় আসিয়াছে'—সে ছিল দ্রষ্টা, বৃষ্টিভেজা সূর্যঘড়ি, বালুসময় পাঠে দক্ষ, নক্ষত্রচিহ্ন মুছে ফেলে আবার নব নব জ্যামিতি তৈরি করায় আতঙ্ক ঐ মেঘা মাস্টার, হায় তৈলবন্দরের বায়ুস্রোত— সে-ও বলে কিনা চলো আমরা শহরে যাই, গ্রাম দেখে আসি, ছিঁড়ে ফেলি রোদে শুকানো মাছধরার জাল, টান দিই নৌকাবাঁধা দড়িদড়ায়, তুলসীমঞ্চের উপর ঝুলিয়ে-রাখা ঐ জলের হাঁড়িটাকে একটু দুলিয়ে দিই, দেখো যেন খুলে না পড়ে— বাঁশবনে ওনার মরণোত্তর পুরস্কারটি দেখে আসি— সেখানে প্রেত-নিশ্বাসে কাঁপিয়ে তুলি ডালপালা, আসুন ঐ সাইকেল-আরোহীকে একটু টোকা দিই, উল্টে ফেলি— বলে এই বাতাস, এই আষাঢ় সকালের বাতাসটুকু অমনই বলতে বলতে এসেছে, প্রতারণায়, অভিযোগে যাদুমৃত্যুর স্বপ্ন মাথায় রেখে, পা ঝুলিয়ে বসেছে লাউমাচায়, অল্পক্ষণের জন্য, শিউলি ঝরিয়েছে কি? ভয় দেখিয়েছে কাঁথায় জড়ানো শিশুটিকে? না, সে-সব করে নি, জাগিয়ে তোলে নি ছোটো এজলাসের হেড মুনসেফ নরোত্তম সিংহরায়কে কেননা আজ অতঃপর ওনাকে শহরে যেতে হবে মিথ্যে সাক্ষী দিতে, বউ রাঁধছে, এত ধোঁয়া কেন লা, তূষ্ণীভাব, সাতসকালে ঝোড়ো বাতাস, আষাঢ় আসিয়াছে, ভেজা চেলাকাঠ পুড়ছে, তার উপর উথলে পড়ছে ভাতের ফ্যান, আঁশবটিটা সরিয়ে রাখো ধনি, নয়ত আমি উল্টে দেব, বেড়ালল্যাজে ফুরফুরানি, কুকুরকানে টুকটুকানি, হাঁসডানায় জলগড়ানি এই বাতাস, চলো নামি, আয় বৃষ্টি— মেঘলোকে সুখী লোকের বাস— তমসা নদী দেখেছি, দেখেছি বাল্মীকির কুটির, বাতাস আমাদের ঈর্ষা জাগায়— আর কী দেখেছো? দেখেছি পৌরাণিক নদীপ্রপাত, গিরিগর্ভ, এত উঁচু থেকে ঝর্না নামে যে আমি তার সমস্ত জল উড়িয়ে নিয়ে যাই, মাটিতে ছড়ায় শীকরকণা শুধু, তাই এত গুল্ম ও উদ্ভিদ, গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘন বাষ্প-সম্পদ, শ্বাপদ শত শত—পিঁপড়ে-অধ্যুষিত রেলিং অঞ্চল, উঠে মাদুরে বোসো, বাবার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দে, স্টেশন থেকে সারিয়ে আনবে— হাঁ রে অ মেয়ে, তোর কি কোনো আক্কেল নেই, উঠোন থেকে শাড়িটা তুলে ফ্যাল, রোদ কোথায় আর, বকতেও পারো বটে, ও' বাতাস তোরও কি কোনো ভব্যতা আছে?

২

যা-কিছু গ্রহণ করো ঢাকা থাক মাটিতে এখন
সাহসে সাজানো ফুল, বুনো মালা, অপরের ফেলে যাওয়া হাসি

প্রকৃতিতে কল্পনায় জ্বলমান চূড়ান্ত হেঁসেল,
মাটির স্বচ্ছতা কাঁপে, ভেবে দ্যাখো যারা অবিনাশী
তাদের স্থাপত্য কতো, ভাঙাভাঙি, ডাল থেকে ডালে
খুঁড়ে চলা, নিচু থেকে নিচে, কিছু তো পেয়েছে ঐ জমাদার,
তুমিও পেয়েছ, মাটির ভিতরে নামি, আনি তোমার সম্মানে
বনের দু'মুঠো ঘাস, যা-হোক সাজিয়ে নাও, জেনে যাও যারা কারুণ্যে জীবিত
তাদেরও সন্দেহ আছে, ভয় আছে। কেউ নয় ততখানি মৃত।

৩

কুব্জা, এসো পৃথিবীকে খুচরো ভাবে গুনে দেখি।
কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই কেন এ-ভাবে দেখা।
নৌকা তীরে লাগেনি। টিকিটঘর এখনও অন্ধকার।
শুধু আমার আঙুলের আংটিগুলির পাথর জ্বলজ্বল করছে—
যেন বাঁশবেড়িয়ার আলো,
তবে কি আমরা কোনো উৎসবের বালুচরে পৌঁছে গেছি?

৪

কামান ও বন্দুক তৈরি প্রণালীতে, নালন্দায়, বিহারশরিফে,
পণ্যের বিরুদ্ধে পণ্য, লণ্ঠনের গোপন সংকেত,
মাটি খুঁড়ে অস্ত্র পাই, ধন্যবাদ, তীর্থ ও উদ্যান
গ্রীষ্মের আগুনে জ্বলছে, রাতভোরে, সূর্য ওঠার আগে,
পোড়ামুখ দানবের, রক্তের বিরুদ্ধে রক্ত, জাগো, জেগে ওঠো,
ত্রাস-ক্ষমতার নীচে যম ছুরি, মাংসল ক্ষুধায় কাঁদছে,
খাটে বসে আছে চার জন, ওরা সকলের চেনা, আজ নয়,
হাজার বছর ধরে, এই পথে, কুকুর ডেকেছে
সারা রাত, জেনেছে ওদের ফিরে আসা নির্ধারিত,
জেল ভেঙে, জেলার কুপিয়ে, চোখ তুলে নিয়ে,
হিংসার আবর্তে স্রোত, শোণিতপ্লাবন, ধায়
যেন ধূলা, যেন মরুভূমিবোধ, আট কব্জি শিকলে বেঁধেছে।

৫

তুমি তো বৈচিত্র্যে নও, একটি নির্দিষ্ট রঙে স্থির আছো
যার নাম ধূপছায়া। এ-রঙের প্রকৃতি কেমন
তা যদি জানতে চাও তবে একদিন প্রবল

বৃষ্টির শব্দে জেগে উঠতে হবে। দেখে নিয়ো
জানলা খোলা। হয়ত বা বন্ধ আছে, কোনোটারই
কাচ নেই। কাঠের চেয়ারটেবিল জলে ভাসছে।
আজ ছুটি। ছাত্ররা উধাও। তুমি একা বেকুব মাস্টার
ক্লাসরুমে ঘুমাচ্ছিলে। জেগে উঠলে এইমাত্র।

৬

রাত্রির প্রান্তে জ্বলে জ্যোৎস্নাময়ী সিঁথি যার,
সেই মেয়ে, আমার প্রেতিনী, কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ-মরজগৎ
শুনি বাঁশবনে ছুটোছুটি, প্রচণ্ড হুল্লোড়, কান্না—
আসীন বুদ্ধের জটিল নিদ্রা ভেঙে যায়।

৭

স্ফীতি। মাটির আড়ালে। যেখানে হরিণমাংস পোঁতা আছে।
ফোটে জল। নুন ও হলুদে দ্রব। গন্ধ পাই। ধোঁয়ার উপরে
ঝরে বুনো পাতা, পাখির ঠোঁটের ছাল, শুখো শাখা, 'যাই' ব'লে
সাড়া দেয় ব্রিজের আড়ালে ম্লান ভেসে-যাওয়া নৌকোগুলি,
'এসো' বলে দুই তীর।

এই দ্বীপে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই বালুচরে। একদা গেয়েছি গান দৃশ্য-জগতের। চোখ ছিল। চক্ষুষ্মান পুরুষের বাচালতা ছিল। আজ দেখি না কিছুই। শুধু শোনায় উদগ্রীব। এই কাশবনে গান আছে। অন্ধে যার অর্থও বোঝে না। না দেখলে।

উজ্জ্বলমরকত তৃণমণি,
যূথহস্তী প্রান্তরে খেলছে,
উজ্জ্বলমরকত ব্যাসমণি নীল,
সারসাঙ্গ শ্বেত,
কৃপা বায়ুচাঁদ, বিঘ্নিতসুন্দর
সূর্যখুর হ্রেষা—
শকট ভেঙেছে পথে, পথের নির্ণয়
আছে পত্রস্নানে, বনবিপর্যয়ে
উপহসিত আমি এক স্বপ্নচারী,
আমি যুদ্ধকেশ,

ধনেশ পাখির মতো অপ্রাকৃত,
হ্রদের হলুদ সমষ্টিরণ,
বহনিশান, ধারারক্ত, বসাকোষ—

রাত্রি এবার নামবে।

৯
ঐ মেঘেঢাকা, সূর্যের আলো ঠিকবে-পড়া উচ্চতা থেকে তুমি আমাদের দ্যাখো
শিমুলমাতা, তুমি দ্যাখো নিচে জনপদ বেড়ে উঠেছে
বাজারের অনেক ক-টি ঘর ভেঙে ফেলার পর নতুন দালান তৈরি হল
সেখানে পুরনো দোকান আর পুরনো মালিক আর পুরনো ক্রেতা
বিদেশ থেকে সিঙ্গিবাড়ির ছেলেটা এবারও পুজোয় দেশে আসতে পারল না
আকাশে চিলের ডাক শোনা যায়
আর শিমুলমাতা তুমি আমাদের ছেড়ে দিয়ে খড় কুটো ধুলোর স্বরূপে
উড়ে উড়ে ঘুরতে থাকো
ঐ পাখির পিছু পিছু—
তখন আমরা দূরত্ব কাকে বলে জানতে পারি
তখন দেখি ত্রিশির কাচের গর্তে বহু রঙ একই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রতিফলিত হয়।

১০
বাঁশপাতা বাতাসে উড়ছে, আমিও উড়ছি, দেখি কে আগে পৌঁছায়
ঐ হল্কার কাছাকাছি,
আমি ফেলে এসেছি শহর, তার ভুলভ্রান্তি, রাজ্যপালের নিমন্ত্রণ
আর পৌরপিতাদের কেলেঙ্কারি,
আমি দৌড়তে দৌড়তে দেখে এসেছি বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে নামল ওষুধ
আর জাহাজবন্দরে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে চাল ও আকরিক লোহা।
আমি এত দৌড়বাজ কী করে হলুম
এ-নিয়ে যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে
তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়াতেই
আমার যাবতীয় দক্ষতা—
স্কুল থেকে দৌড়, কলেজ থেকে. অফিস থেকে, হাসপাতাল থেকে,
গঙ্গাতীর ধরে দৌড়েছি বৃষ্টির মধ্যে,
ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেছি প্রায় সূর্যের কাছাকাছি,
ঐ হল্কার দিকে উড়ে যেতে যেতে দেখি

বাঁশপাতা পিছু নিয়েছে,
সে-ও উড়ছে— তবে তার কারণ আলাদা।

১১

চিতাবাঘ আখরোট গাছের 'পরে নজর রেখেছে
ঐ গাছে ফুল
ঐ গাছে ফল
ঐ গাছে ঝুলন্ত মানুষ
তার নীচে ঘাস ও কবর— সেখানেও মানুষ।
ভাঙা-ছিপি বোতলের গা দিয়ে গড়িয়ে ঝরে মদ
ঝুড়িতে অলিভ
'ছিলেন অন্নদাতা, আমার সে-পিতার নাম জোসেফ' জেকব হাসছে
কেউ তাকে বিশ্বাস করে না
কেউ তাকে মান্য করে না
কেননা জেকব একটি ভাঁড়— মিথ্যাবাদী ও শপথমুখ নপুংসক,
আমরা জেনেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতার নাম রসায়ন
আমাদের বেঁচে-থাকার অপর নাম ভূতবিদ্যা
বৈদ্যুতিন চোখ বটে আমাদের
যতদিন বেঁচে থাকি মৃত পশুপাখিদের শরীরে বিচালি পুরি
তাদের জীবন্ত, স্থির ও অন্ধ করে রাখার দায় আমাদের
তেমনই একটি পশু— ঐ চিতাবাঘ—
তাকে জেকবের দৃষ্টিহীন সন্তান বলে ভুল হতে পারে
কিন্তু সে সকলকে নজরে রেখেছে।

১২

আবার উড়ছি আমি, জল ছেড়ে, জলাভূমি ছেড়ে
এ-ডানা মোমের কল্প, এই হ্রদ প্রতিফলনের,
এই গাছ শুভবুদ্ধিজাত, এই দেহ দূর আকাশেরে

দৈত্যশিশুর মতো ঠেলা দেয়। ছিল পায়ে কারাবাসী-বেড়,
আণব-ধোঁয়ার স্তম্ভে ছিল খেলা, যাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি
তিনি মূর্খ ও কপট— বহু রূঢ় অনুশাসনের

তিনি নাকি লেখকর্তা— ভাঁড় ও সাধকপ্রায়
তাঁর হাসি, লোকাচার। মানবজীবনে তিনি এক ধূর্ত মাছি—
শতচক্ষু, ক্ষিপ্রগতি, যাঁকে গড় করেছ কি, হায়,

তিনি অন্য কোন্ কাঁকুড়ে আসীন, আরেক কষায় ফলে।
পাশাপাশি আমাকেও ভেবে দ্যাখো, আমাকে ভাবনা করো,
এ-মোম গলেছে তাপে, রৌদ্রতেজে, শুধু ওড়ার ধকলে—

শতেক যোজন ঊর্ধ্বে আমার পুরুষদেহ— প্রকৃতিবিহীন,
উড়েছে তো দেবপুঞ্জে— একদা ও-মেঘের আড়ালে। স্মর
তার কীর্তিগাথা, যার জন্ম এই হ্রদে, ঐ গাছে ছিল যে বিলীন।

১৩
নশ্বরতা, তাই চায় প্রাণ।
চায় কাচের বাসনপত্র, মাটি দিয়ে তৈরি ফল,
কাপাসের মণ্ড আর ছাঁচ সন্দেশের, মিঠাইওয়ালা এই
কর্মীপ্রাণ, কাগজওয়ালা, রিফুকর্মী, সূচের ব্যাপার
জানে, বৃষ্টির ভিতরে দেখি একটি ছাতার নিচে
কুঁজো হয়ে বসে, সে যা সেলাই করছে তা একটি
ছাতা ছাড়া অন্য কিছু নয়—

ফুলের আক্রোশে আজ ছিন্নভিন্ন তাই তার ঘর।

১৪
গ্রন্থ-অবমাননার রাত এসে গেল। যাদুপট বাতাসে দুলছে।
না হে না সাগরপাখি ও-সব আমার গ্রাহ্যেই আসে না—
তবু চাঁদ তার্কিক, প্রত্যেকের গায়ে পড়ে কথাকাটাকাটি করে।

কী হবে সৌন্দর্যবোধে যার খুঁটে দু-পয়সা গচ্ছিত নেই? ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে
মেয়েদের হাতছানি নেই? চোরাগোপ্তা বালকেরা
পুরুষের আবদারে জবানবন্দীর জন্য খ্যাত হয়ে নাই বা রইল—

মন সুখদুঃখের কথা ভাবে। এ-রকম পূর্ণিমায় হাবিলদারের সঙ্গে
দেখা হয়। সে আবার পরিচয়পত্রখানি দাবি করে, দেখে নেয়

আমার মুখের সঙ্গে খাতায় ছবির কোনোও মিল নেই দেখে সে-হারামি আশ্বস্ত
হয়েছে—
সুন্দরের পূজারী তুমি, তাই হেন ব্যত্যয় দেখছ— এই বলে আমি তার পিঠ চাপড়াই,
অনেকটা নৈকট্য বাড়ে, হাসিঠাট্টাও চলে, ইদানীং শুধু হাত নাড়ি,
ওতেই যা হবার তাই হয়ে থাকে, পাঁচিল টপকে যাই,

রোলকলে ফিরে আসি, ছ-ছটাক দুধ পাচ্ছি ফি-হপ্তায়, কাঁড়া চাল, ছাঁট নেবু,
জানালায় বসন্তবাতাস, ঘরে জ্যোৎস্না, যাদুপট কর্তব্যে অস্থির,
বেশ আছি বাঞ্ছাহীন, বইগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে তরঙ্গে ফেলছি।

১৫
জল থেকে উঠে আসে জলপোড়া পুরুষের দেহ, প্রকৃত শরীর
জলের ভিতর থাকে, ওখানেই থেকে যেতে চায়—
এই নিয়ে খণ্ডযুদ্ধ,

যে-শরীর নিশ্চেতন তাকে কেউ জাগাতে পারে না,
যার কোনো আর্তি নেই তাকে আর জাগিয়ে কী লাভ—
সে-ই ভাসে প্রচণ্ড সাঁতারে।

১৬
আজকে এই ভোরের আলোয় হাসান-উজ্জ্বল
আমার হাতে মানুষ মারার কল

আজকে এই ভোরের আলোয় হুসেন-হত লাল
আমার হাতে মানুষ মারার ফাল

রাস্তা দিয়ে গাড়িয়ে আসে শবের ভাঙা গাড়ি
আমি পতাকাগুলি নাড়ি

আমি পতাকা দিয়ে ঢাকি
আমি পতাকা দিয়ে ছাঁকি

কফির জল, শোধন জল, বারুদপোড়া ছাল
অনুশোচক করোটি-কঙ্কাল

আমার বুক ভরে ওঠে ভোরের নিশ্বাসে
আজকে এই আগুনরাঙা ঘাসে

ভস্মময় পার্কে আর চাবুকটানা খালে
জড়িয়ে পড়ি একেশ্বর জালে

ছিটকে পড়ি আপন বাহুটানে
অস্ত্রহীন আলোর সন্ধানে

দেখি দূরের জানলাগুলি খোলা
বেতের খাটে হাজার শিশুর দোলা

ধাত্রী-প্রেত দু-হাত তুলে থামায়
দুধের ট্রাক রক্তমাখা জামায়।

১৭
বানাই বিরেতে-রাতে সুটকেশ, হাতলওয়ালা ছড়ি, লোহাট্রাঙ্ক,
চামড়াকাটার খুরে শান পড়ে, স্ফুলিঙ্গে পুড়েছে চোখ, গুণসুতো
এ-ফোঁড় দিয়েছে শুধু, অন্যদিকে গর্তহীন গালায় মাখানো চাবি,
ফুটো হবে, অতঃপর ক্রমান্বয়ী, রাঙ-ছাল প্রতিরোধ দেয়,
ফুলে ওঠে হাজার ডিগ্রী তাপে, অগ্নি-কুয়াশায় চোখ যা-দেখেছে
তা জেনো রাত্রির দেখা, কাল মেঘে-ঢাকা দিনের ইস্পাতে
এ-তোরঙ্গে দাঁড়াবে গঠন— কিছু কোমলতা— তাকে দেশান্তরী করো,
তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

১৮
ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি মাথা রেখে সহজ ভূগোলে
ঝড়ের পাখির মতো— এত ঝড় ছিল বা কোথায়
হয়ত গ্রন্থে ছিল, মলাটে ও গভীর মার্জিনে,
ঐ দেখা যায়

মহাবিষুবের রেখা, ছেঁড়া-পাল তরণী ডুবেছে
স্থলপথে, কৃষিমাছ, কেরোসিন-পিয়াসী মীনের
পাশাপাশি রক্তে বেড়ে-ওঠা পেঁপে গাছ, ঢেউ

পেন্সিলবাহিত, যেন ছবিতে তৃণের

কোনো শেষ নেই, শস্যক্ষেত তেমনই সবুজ
নতুন সাহিত্যপত্রে, শুধু কাটা-ছেঁড়া জিভ
আজ মানুষের— অস্বর, বোবা চেয়ে আছে—
ন্যাংটো আদম আর পাশাপাশি রোগাক্রান্ত ঈভ।

১৯

একদিন ঐ বিশাল বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমরা যে-গান গেয়েছিলাম তার
নাম কোরাস
আজ আমরা গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে যে-গান শুনি তা একাকিত্বের বা অবহেলার
তোমাদের এই সংবাদ এনে দিই, তোমরা শুনে রাখো,
শোনো গাছটি একা একা গান গাইছে হাজার পাতায়,
বৃষ্টির দিনে, রোদের দিনে সে ঠাহর করতে পারছে আমাদের,
'ক্ষমতার দরকার। তোমরা তো ক্ষমতা পেয়েছ' সে বলছে আমাদের,
'তোমরা যারা পঙ্গু নও, জড় নও, তারা কেন পেড়ে নিচ্ছ না উড়ন্ত পাখির বাসা
যা আমার
শাখায় জড়িয়ে আছে, আরো বহুকাল ঝুলবে, বা হয়ত আজই বৃষ্টি এসে
ভিজিয়ে দেবে তাকে, বাতাস ছিঁড়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে রোদ, ততক্ষণ
তোমরা শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছবে,
অফিসেও যাবে হয়ত,
তোমরা না সামাজিক, লোক আনো, মিস্তিরি লাগাও, টাকা ঢালো,
পেড়ে নাও যত ইচ্ছে, যা মন চাইছে,
একদিন বড় হওয়ার গান গাইতে, ঈর্ষার খেলা খেলতে, অবিশ্বাস করতে
চেয়েছিলে সব কিছু,
আজ তার কী হল?'

২০

ওষধির ক্ষেত আর শ্মশানভূমির
মাঝামাঝি
ছোটো রুক্ষ মাঠ
বাতাবিলেবুর ফলে ভরে আছে
ঐখানে ধোঁয়া
আছাড়ি-পিছাড়ি করে

পুরুষের রূপ নেয়
অবিনাশ পুরুষের রূপ
ত্যক্ত চাদরে মোড়া, জরদ্‌গব, উল্টানো গোড়ালি
এই ক্ষীণ মাঠে
আমি আসি—
কিছুদিন
গান শিখে নিতে
ফাঁসিকাঠে একদা যে-গান
গাওয়া হয়েছিল
জীবন্ত বলির আগে যে-সংগীত উৎসারিত হত
সেই সুর
স্তব্ধতায়
ছাই ঝরে চতুর্দিকে
আমি থেকে থেকে
চমকিয়ে উঠি—
আকাশ-ফাটানো শব্দে
বারুদ ও বাতাবিলেবুর সুবাতাসে।

২১
রাত্রি তুমি। রসবৃক্ষের মতো মোমটুকু জ্বলে।
হায়, নিজের আঁধারখানি ঢেকেছ অঞ্চলে।

বাতাস বইছে আর কাঁপে প্রেত শিখা
নিচে ম্লান, সামান্য পরিখা

যাবে কি গোপন রাখা, আলোহীন তাকে রাখা যাবে
প্রভাত ও সন্ধ্যার মিলিত সদ্ভাবে?

এই দেশ ছোট, তবু বড় তার দেবদেবীগুলি—
রক্তমুখ, রূঢ় ত্বক, নখে আবৃতঅঙ্গুলি,

দীর্ঘ কঠিন পথ, শীর্ষে বাঁক, এসেছ বিস্ময়
ঐ উপাস্যের হাসি যেন— জন্ম নেয় ভয়,

পরিখার প্রান্তে খাদ, আরও নীচে উল্টে আছে যান,
বর্ষার দুর্ঘটনা, গ্রীষ্মের আগুনবাগান,

কোন্ শতাব্দীর কথা? কত লোক মরেছিল? তুমিও ছিলে কি?
তুমি ও রাত্রি এক। একাত্মমরণ। মোম জ্বেলে রাখি।

২২

গল্পের প্রথম বর্ণনা—
সেইখানে রুপালি, ধার্মিক পোকা উপস্থিত
'কিছু খেতে দাও
ওগো তোমরা বিদেশযাত্রী, ওগো তোমরা স্বদেশপ্রেমী, কিছু গঁদ দাও,
ময়দার রেণু দাও, দাও বালুকণা,
মালবেরী বিষ দাও'
এই সে-বিদায়
যা আমাকে জাগিয়ে রাখে সারা রাত, কিছু তার চোখে দেখা, কিছু আকস্মিক
জলের মতন এসে ছুঁয়ে যায় পায়ের আঙুল,
রাত্রির ঢেউএর মতো ছুঁয়ে যায় খাটের কম্বল,
শীত করে,
আমি গ্রন্থের ভিতরে নেই তাই শীত করে,
আমার চাদর নেই
তাই শীত করে, আমার
যথেষ্ট বর্ণনা নেই তাই শীত করে,
বই-পোকা সহজে মরে না,
রৌদ্রহীন, চাষহীন, বিষাক্ত সুদূরে
জন্ম তার, ছিঁড়ে-খাওয়া, গর্ত ও ফুটোর পাতালদর্শন
এবং আহার
ইচ্ছে মতো, যত পারো, মোছো মুখ, ঝাড়ো লালা,
'হও পরিচ্ছন্নতার মতো প্রকৃত নির্ভার'

তাই বলে—
বই-পোকা অন্তত বলেছে। যেন বাঙ্ময় কীট ও পতঙ্গে
আমার আপদকাল ভরে আছে, যেন লালাময়
আগুন-জলের উপরে উড়ছে তারা—
সারা রাত ওড়ে।

২৩

কেন মানুষ নিজেকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে পারে না? তার পাল্লা কেবলই একদিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ পশুরা পারে। পাখিরা পারে। আমি বাগানে নেমে গিয়ে দেখেছি আধখানা পায়রা পড়ে আছে। পুকুরপাড়ে ঐ কারা মরা মোষ ফেলে গেছে। তার দশের-পাঁচ শকুনে খাচ্ছে। ছয় দড়ির শিকের তিনটি মাত্র ছিঁড়ে গেল আজ ভোরবেলায়। তাই এত দুধ মাটিতে। বেড়ালে খেয়ে গেল। পিঁপড়ে খেয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে তুমি এত বুদ্ধমান হলে কী করে হে? তুমি কি নিক্তির ওজন জানো। ফিতে দিয়ে সবকিছু মেপে দ্যাখো?

২৪

কাল সকালে গাড়ি আসবে। আমরা রাজনারাণপুর যাব। হয়ত সেখানে দেখতে পাব উইঢিবি। আলকাতরা-মাখানো বাড়ির দেয়াল। জমিদারবাটীর সিঁড়িতে যে-ধরনের শ্যাওলা জমে থাকে তা-নিয়ে আমার গবেষণা খানিকটা এগোবে। ছিল বটে সে-সব দিন— বলতে বলতে আমাদের চোখ কালোপাখির ছায়ায় ভরে যাবে। কাঁদছ কেন গা তোমরা? তোমাদের হল-টা কী? স্থানীয় লোকেদের এসব প্রশ্নের জবাব আমরা আগে থেকেই গাড়িতে যেতে যেতে স্থির করব।

২৫

পোকারা আমার সঙ্গে কোনোও তর্কে যেতে রাজি নয়। তাদের ঘোরাফেরার পথের উপর ঝুঁকে পড়ে আমি চিৎকার করছি—দ্যাখো, আমি কত বড়ো, আমি হাত দেখতে জানি, মৃণালবাবু আমার বন্ধু, তাঁর ছোটো ছেলে বিলেতে ডাক্তার—ওরা আমার কথা শুনেও শোনে না, যে-যার কাজকর্মে ব্যস্ত। কেবল দু-একটা মোটাসোটা পোকা সামান্য চিন্তিত বলে মনে হল। কেননা দূরের ঐ পাঁচিলে-বসা রোগাটে পাখিটা বারবার এদিকে চাইছে।

২৬

লাল হলুদ কাচের জানালার দিকে তাকিয়ে
সেদিন অকস্মাৎ
বিকেলের অপরিচ্ছন্ন মুহূর্তে আমি
জটিলতাহীন
সূর্যরশ্মির দিকে চোখ মেলে—
'পোপের সাম্রাজ্য আর
তাঁর অসুখের
রহস্যময় বীজাণুর স্থিতিস্থাপকতা'

আঙুলে একটি বড়
গ্লোব পৃথিবীর
বর্তুল পরিধি দেখিয়ে
আমি কলকাতায় তোমাকে বলেছিলাম—
'পোপের সাম্রাজ্য
আর তাঁর অসুখের রহস্যময় বীজাণুর স্থিতিস্থাপকতা
কতখানি দেখা যাক।'

বীজাণুর সঙ্গে তুমি চাও না কি যুদ্ধ হোক?
অন্তত আমি তা চাই না
কারণ সে যুদ্ধ যদি ধর্মযুদ্ধ না হয় তাহলে
কুরুক্ষেত্রে কার মুখব্যাদানের অন্ধকারে
আমি ছোট পৃথিবীর, গ্লোবের, প্রতিচ্ছায়া দেখে
হতচকিতের মতো
কৌরবের খেলার পুতুল হব?
আমি কি নিজেই নিজেকে থলির মতো
নাড়া দিয়ে ভিতরের
বীজাণুর, সন্ত্রাসের, সিকি-আধুলির শব্দ,
গড়াগড়ি তোমাকে শোনাব?
অন্য বহু
পুরুষের মতো এই সাতাশ আটাশ
বছরের ছোট, খিন্ন জীবনের কেবলই
ঝিল্লি শিরা অস্ত্রবহুল
ঐকান্তিক শরীরের প্রেমে
বারবার নেমে এসে
আমাদের দ্বিধা হল কেন?
ধর্মজ্ঞানী, সাধু ও চোরের সঙ্গে মাখামাখি হল না তেমন।
নৌকায় বেশিদূর বেড়ানো হল না
ভালবাসা জোরালো হল না
খালপারে বিবাদ হল না—

পাঠক এখন,
রোমের চত্বর থেকে
দূর জানালায় চোখ রেখে

দেখা গেল দ্যুতি নিভে যায়
ক্যাথলিক মিশনের কাছে
আমি ভারতের
অপুষ্ট শিশুর জন্য
গুঁড়ো দুধ চাইবো আয়াসে
উনচল্লিশ পোপের মৃত্যুর পর

চল্লিশ পোপের
জীবাণুমুক্ত আয়ু ফিরে আসে—
এই বোধে।
কিন্তু আমাদেরও
অন্য বহু পুরুষের মতো
আরো কুড়ি-বাইশ বছরের আয়ু বাকি আছে।
ততদিন বিমানবন্দরে গিয়ে বসে থাকি
উড়োজাহাজের ওঠানামা দেখি
অথবা ছাপার কলে
গিয়ে বলি আমার কবিতাগুলি
ছেপো না বা
বুড়ো আঙুলের দাগ ছেপো না, বা
ল্যাজের খুরের দাগ
ছেপো না, বা
আমাকে বদল করো
রহস্যের মূল জানালায়
অন্ধকারে—
যখন হলুদ, নীল, ভিন্ন রং
মুছে গিয়ে পোপের সাম্রাজ্যে আজ
বীজাণুর মতো ছোট
সংখ্যাহীন ধূর্ত ও কোমল
মাতব্বর ঈশ্বরের আবির্ভাব হল সদলবলে।

২৭

পা নামিয়ে উড়ে আসছে ধূসর বকপাখি
ঠাণ্ডা মেঘের গা বাঁচিয়ে
রানওয়ে দুই
খালি হল—

উপরে ভাসছে জলকণা
ডাবগাছের মাথায় ঈষৎ ঘূর্ণিঝড়
নীচে এক স্তর ধোঁয়া
রুটি-কারখানার কালো ছাদ—

আরো নীচে দুটো মিলিটারি বিমান
তেল ভরছে
জ্বলছে-নিভছে আলো
কয়েকজন মানুষের ডানার মাথার হলুদ টুপি
তারা হাঁটছে—

আমরা শতরঞ্চির উপর বসে আছি
জুয়া খেলছি
আমাদের চুল ছুঁয়ে নেমে এল বকপাখি,
ভাজ-করা শরীর, গুটিয়ে-ফেলা পালক, লম্বা পা
দোলাতে দোলাতে সে লাফিয়ে নামল
রানওয়ের স্তব্ধ শাদা দাগে

—সফল অবতরণ, হাততালি।

২৮

তৃতীয় দিন আমরা জানলা দিয়ে দেখলুম দূরে
একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে—
চৌকাঠের ভিতর নড়ে উঠল হাড়ের পাশা
পেরেকে ঝোলানো জামা বাতাসে ফুলে উঠল
বহু রাত্রি আগের উৎসবের একটা বেলুন সুতো ছিঁড়ে এদিক-ওদিক উড়তে লাগল
আমরা যাকে নররাক্ষস বলে উপহাস করে থাকি সে বলল—
আজ আমার তেমন খিদে নেই

সাইকেল-পিয়ন হাত নেড়ে বলে গেল আজ আপনাদের কোনো চিঠি নেই
সুখময়বাবু টাক-মাথা থেকে রুমাল খুলে ফেলে বললেন আজ আর বিশেষ রোদ নেই

ঐ তৃতীয় দিনে পশ্চিমের বড় ঘরটা খালি হল। নতুন সংসার এল। তারা
মালিককে বলল— আমরা বাইরে খাব।
ছেলেটি খুব বিশ্বাসী— উনি হেসে বললেন— চাবি তালায় থাক।
আমরা সারাদিন কলে জল পেলুম।

বেশ মেজাজে কাটল বাকি সময়টা। নিজেদের চিনে ফেলেছি সন্দেহ নেই।
মেয়েরা সিগারেট টানছে অনেকের সামনে। ছোটদির বরের পাশের খবর এল
জোর খাওয়া-দাওয়া হল সবাই মিলে—

এক সপ্তাহ ছুটির অবকাশে আমরা কেবল একদিনই দেখেছি
দূর সমুদ্রে জাহাজ ভেসে চলেছে—
অল্প কিছু সময় দেখা গেল তাকে। তারপর ঢেউ। শুধু ঢেউ।

২৯

লিখছি বহু দূর থেকে রুইদাসকে আজ দেখেছিলাম— সে দৌড়ে আসছে,
তার পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গেঁড়ি-গুগলি
বর্ষার জল ঘোলা হয়ে উঠেছে—
কেননা সে ক্রমাগত লাথি মারছে জলে-ডাঙায়
মাটি ধ্বসে পড়ছে
আমাদের এই ছোটো খড়ের ঘর কাঁপছে
বাদলা দিনে কেনাকাটার লোক নেই
সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি
মেঘের নীচে এ-ভাবেই প্রত্যেকটা দোকান চিহ্নিত হয়
বৃষ্টির ফোঁটা লাগলেই হারিকেনের কাচ ফাটে
কাচের উপর দিয়ে জল ভেসে চলে
মানুষের মাথা সমান উঁচু।

৩০

জেকবনক্ষত্র আমি। উলমুলুক গীর্জার গান।
কিশলয়তায় আজ গাছগুলি ঢেকে আছে, দ্যাখো,
লজ্জা থাক, ঘৃণা থাক, কিছু ভয় ছড়ানো ছিটানো

অবশিষ্ট পড়ে থাক। রুটিকুঁড়ো টেবিলের নীচে,
মাখনসন্ধির ছুরি, ভাঙা কাপ, ফাটা ডিম,
অর্ধেক খাওয়া ফেলে চলে-যাওয়া পুরুষের এঁটো পড়ে আছে

মৃত্যুর পর শুধু মৃত্যুভয় বিছানায় শুয়ে থাকে একা,
গীর্জার ইঁটগুলি ভেসেছিল সেবার বন্যায়— আজ তাকে শীতের বাঁধুনি
খাড়া রাখে— কুয়াশায় কিছু-না-কিছুই পাবো— এ-ও ঠিক—

যে-প্রাপ্তি গাছের মতো— ফাটলের বট-চারা যেন,
যে-গাছ সংগীতে বাড়ে— মৃত পুরুষের কোরাসসজীব
এ-শীতভূমির ঊর্ধ্বে কাল এক নক্ষত্র উঠবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিই।

৩১

আমিও ভেঙেছি কিছু, ছোটো মাপে, এই ধরো জলের গেলাস
বৃষ্টির ভিতরে হেঁটে শ্রাবণের কিছুটা ভেঙেছি
ছাইকুঁড়ে মোরগ দাঁড়িয়ে— তার চলচ্ছবি ঝুলছে আকাশে
আমি অত কিছু নাগাল পাই না।
হোটেলে, তীর্থের পথে, সমকাম মানুষ এসেছে—
আমরা আমিষভোজী, আমরা তো একাহারী, আমাদের তৃণজ পানীয়
কোথায় চাদর পাতি, কোথা শুই, কোথায় মশারি—
তারাও ভাঙছে কিছু, এই ধরো, সমাজ রয়েছে
আমি অত কিছু নাগাল পাই না।
মাধবীলতার স্রোতে ছিল একদিন ভাসমান গল্প মোটরকার বালিকার, জাতকের,
ভাঙা অশ্বশক্তি এক কিম্বা দেড়, যেন বহুদূরগামী
ওদের বিছানা-বাক্স, যাবে পাশের উঠোনে,
ছোটো হাত ভাঙছে সবুজ ইঁট, এদের নির্মাণ,
আমি অত কিছু নাগাল পাই না।

অকূল জোনাকিময় এই মাথা, এই পিঠ, এই তর্কহীন
বিছানায় শুয়ে থাকা, তুমি আছো, হাত বেঁধে রাখি,
যেন আর কিছুই না ভাঙে।

৩২

শুধু সৈন্যদেরই প্রশ্ন করি তোমাদের শরীর ভালো তো—
গ্রহবীজ একদিন এই দেশে পড়েছিল
আজ শুধু গহ্বর, হা-হা খাল, লালাবিষ দেয়ালে মাখানো,
অঙ্কুর গাছের মতো যে-অঙ্কুর তাতে কোনো গাছ নেই,
যে-বাল্যে মানবজন্ম ঘটেছিল সে আসলে কেউ নয়—
এ-সব দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে প্রত্যয় ঘটেছে
হয়ত আমিই সেই ভুল মাটি, অন্য গ্রহের থেকে
উড়ে আসা ধূলিকণা, আপাতত শাসনে রয়েছি
সৈনিকের— এরা ভালো আছে।

৩৩

মাংসপাখি ডাকছে বসে গাছে—
সুসমীচীন। আমার হাতে ছুরি
দেখছে তবু ওড়ার নাম নেই
অমন পাখি একটি শুধু আছে

আমার বনে—আমার খিদের বনে
লালায় মাখা, পিত্তস্রোতে খর,
হলুদ নদে স্নানাতিরেক আমি
দাঁতের চাপে, পেশীর অনশনে,

দু'বাহু তুলে নিয়ত তাকে ধরি
হয়ত পাখি আমায় ভালোবাসে
বোঝার ভুলে পরস্পর-চেনা
ইহজীবন রিপুতাড়ন ঘড়ি

'দুপুর যায়'— সময়মতো বলে,
আমিও মানি। 'খিদে পেয়েছে তোমার'
—পাখিটি গায় চমৎকার গীত,
গাছের নীচে আগুন ধূ ধূ জ্বলে।

৩৪
দিদি, ধন্যবাদ। আমি হলেবীদ্ মন্দিরের
স্ত্রী-যক্ষ মূর্তিটিকে হেসে বলি,
এসো, আমাদের সামান্য আশ্রয়ে একদিন
থাকো, আতিথ্য গ্রহণ করো, আমাদেরই সংসারের
উত্থানপতনে ভ্রষ্ট হও, জয়ী হও,
আমাদের আলনা শেয়ার করো, এই তাকে বই রাখো,
কার্তিক সন্ধ্যার প্রথম শ্যামাপোকা দেখে বিষণ্ণ হও,
আমাদের সংসারের উপর চিরদিন কালো মেঘ, অনেক ঝড়, অনেক বজ্রপাত-
দ্যাখো, সে-সৌন্দর্য তোমার চেয়ে কিছু কম বিষাক্ত নয়।

৩৫
কাটারিদাগ... ভোজনপাথর
এই শিল্প
ঠাকোর... রান্নাঘরে দেহজ কেরোসিন
দাহিকা-মা... ভিজে সলাই
দু'এক কাঠি জ্বললে ধূ ধূ
আগুন নামে...
চাদরে আর ধুতির পাটে
আগুন... আমার গেঞ্জিভরা আগুন
আমার ভুরুর মধ্যে আগুন
ওখানে বাঁকা
কাটারিদাগ... চোখের পাশে...
এই শিল্প
সুখে থাকবো জেনেছিলাম
উনোনভরা সুখ আর
হাতের ভিতর বাতাস
শোনো... পোড়ামুখের গান
যে-যার মতো জ্বলে
সব্জিভরা... আগুন...
খাও... দু'হাত পেতে-খাও
আগুন দিয়ে ভাতের দলা মাখো
হল্কা...
ঐ ফুলের মতো... জ্বলন্ত গাছ...

বাগানভরা পোড়ামাটির উনোন
শুধু আগুন... আর ছাই...
ভোজনপাথর গড়িয়ে নামে পথে।

৩৬
ছবি দেবতাদের, আমার জন্য শুধু লেখা।
শুধু ভাষা ও প্রতীক
সমুদ্র-পথের রাত্রি— অকম্পাস, অনিশ্চিত দিক।

ঘর দেবতাদের। আমার জন্য শুধু বাণী।
যেন তাৎক্ষণিক
সামান্য লুণ্ঠনে ভাঙে বন্দরের জানালার শিক।

পট দেবতাদের। আমার জন্য শুধু রেখা।
কিছু অপচয় আর অনেকটাই ঠিক
স্রোত থেকে সরে আসা। বুনো, পদাতিক

ভূমি দেবতাদের। আমার জন্য শুধু জলযানখানি।
কাপড়ের পাল আর কাঠের বাসন আর মৃত্যুর অধিক
হুল্লোড়ে রাত্রিকাল। করতালি শোনো হে নির্ভীক।

৩৭
নভ, প্রভূত কিরণ ও অটুট
ঝিল্লি, তুমি কর্ণিকার, চোখ মর্ষ
ধাতুখণ্ড, জলধৌতি, পুণ্য

শ্লাঘা, নাম ও দুইটি বীজে
যোগাযোগ, ক্রিয়ারূপ দ্রব্যদণ্ড
গহ্বরখোদিত

ধায় উঁচু শব্দে বেজে-ওঠা, নিচু শব্দে গীতময়
পিতলঘণ্টা, ছুটে আসে ঘামঝরা পুরুষ ও
লম্ফমান দুধঝরা রমণী,

তোমাদের ত্বকের চেয়ে শুভ্র এই যে কাণ্ডবাহী রস
তোমাদের ঘামের চেয়ে বিষময় এই সুরাসার

কর্মফুল ঐ দেহতাড়িত গাছে

যখন এক আকাশ থেকে নামে শিশির এবং
আরেক আকাশ থেকে নামে আগুন
তখন আমরা সবাই ফুলের গন্ধ পেয়ে থাকি
আমি, হরীতকী ফল ও বৃদ্ধ গোসাপ—
ঈর্ষাসবুজ এই কৃষিক্ষেত, অন্ধকার আতস কাচের বন,
এরাই শস্য উৎপাদন করে, বৃষ্টি আনে, শীত চায়।

৩৮
যেন প্রাণ, যেন আকিঞ্চন,
কে না জানে অনৃতকথন!
কে না জানে অপলাপী ভাষা—
শিকারির বাঘের প্রত্যাশা
শিকারির পিছু পিছু ধায়
ছায়া-বাঘ, বনের ছায়ায়,
হে সন্ধান, প্রাপ্য ও প্রাপক,
এসো চাটি রক্তমাখা নখ।

৩৯
পাখিরা যে-গান গায় সে কি সদুপদেশের গান—
সে কি শবের সম্মান
সে কি আহ্বান করে
উড়ে এসো অতৃপ্ত আহারে
এই মৃতদেহটির পাড়ে
এসো এর রক্তে করো স্নান
ছিন্ন করো পেশির বাগান
উৎখাত করো যত ফুল
ঐ কোষ, ঐ স্নায়ু, ঐ কালো চুল
ওর বীজ করো বিষময়
স্তব্ধতার এই তো সময়

স্তব্ধতায় কানা করো হাত
অঙ্গহীন এরই লেখপাত।

৪০

দিন যায়। রাত্রি নেমে আসে।
বল্লভপুরের মাঠ ভরে ওঠে তৃণের নিশ্বাসে।
বাঁকা শিক, তুমি আজ কত না আদরে
জড়িয়ে ধরেছ গলা—
দ্যাখো, ফুলে-ওঠা ত্বক,
দ্যাখো, কুষ্ঠের ছোঁয়া-লাগা ছুটন্ত তক্ষক
আমার দু'পাশে।

৪১
রাগ থেকে জন্ম নেয় স্বতন্ত্র মাদুলি।
দূর্বা আগুন থেকে ঝলসানো মাংসপাখির
পিণ্ড হৃদয়সম— তাই হাতে বাঁধি,
যে-হাত অদূরে ছিন্ন, কাটা পড়ে আছে।

৪২
হ্যাল্লো, জে. ডি. ঘোষ, মাই ফ্রেণ্ড, হাউ আর ইউ,
বাড়ির সব খবর, ছেলেপিলেরা বৌমা,
এ-শর্মার কথা না হয় উহ্য থাক, সল্টলেকের
ও-সব ঠেকে যাচ্ছে-টাচ্ছে, হ্যাঁ, যা খরচ,
শালা গভরমেন্টের ইয়ে মারি, সিগ্রেটে ট্যাক্স,
লীকারে ট্যাক্স, সার-য়ে সাবসিডি, হাঃ, হাঃ,
গোবরে আবার ভর্তুকি কী হে, তা তুমি জে. ডি.
চেহারাখানা জবর রাখলে, এই বয়েসে, হবে না কেন,
কত বড় বাড়ির ছেলে, তোমার মেজদাবাবু
জার্মানিতেই রয়ে গেলেন, ছোট বোনটি কোন্ প্রদেশে,
টাটা-ভিলাই, নাতি হয়েছে, ভাবা যায় না,
সেই শ্যামলী, আমাদের সেই ছোট্ট শ্যামা, তবে তোমায়
খুলেই বলি, সেই বয়েসে, মানে সেই যেবার
নাসিক গেছি, শ্যামার সঙ্গে একটু ইয়ে,

না, না, প্রেম-ট্রেম নয়, সুদ্দু চিঠি,
মনের কথা নীল কাগজে, দু-এক ফোঁটা কোলন-ছোঁয়া,
শেষ চিঠিটার জবাব দেয় নি, ভারী দেমাক,
আমিও কিছু কম যাই না, শ্যামার মতো সাত-দশটা
মেয়ে তখন পিছু নিয়েছে, পিতৃদেবের আলিপুরের
বাগানবাড়ি হাতে পেলুম, এয়ারলাইনস-য়ে নতুন চাকরি,
শ্যামার সঙ্গে দেখা হলে তবু আমার শেষ চিঠিটার
কথা তুলো, অবশ্যই সময় বুঝে,
ওটা কি হারিয়ে গেছে, নাকি পৌঁছেছিল, জবাব দেয়নি,
গ্রীষ্মের এই নীল আকাশটুকু দেখলে কেবল মনে পড়ে,
ঐ-মতো নীল, হাল্কা কাগজ, বাঁয়ের দিকে বুটিকাটা।

৪৩

বহুদিন পর স্বপ্ন দেখলাম লুকোচুরি খেলছি—
সেই আশ্চর্য বনপ্রদেশে যেখানে আজো জলচাকি ঘোরে
সূর্যমুখীর তেল গায়ে মাখে মানুষ
আর ছোটোরা আব্দার করে— বলো, সেই মাছেদের গল্প যারা জাল ছিঁড়ে
পালিয়ে গিয়েছিল।
স্বপ্নের ভিতর এক বাস্তবতা লেজ গুটিয়ে শুয়ে থাকে—
সে-ও স্বপ্ন দ্যাখে গলির মুখে কলতলা, জল এসেছে, একসার ঘটি-বালতি-টিন,
অল্প ঝগড়া, মুখটেপা হাসি আর গয়লানী-মাসীর নতুন গয়না দেখে
সেই বাস্তবতা, সেই উল্লুক, খুব চেঁচামেচি করে।

৪৪

কথা-ভুলে-যাওয়া গানগুলি, তার মনে পড়ে সুর,
অশ্বধাবিত প্রস্তরপথে লোহার শব্দ, ছুটন্ত খুর,
রাত্রি বারোটা, শহরে মাতাল, পানের দোকান, সোডা ভাঙচুর,
আমি ভুলে গেছি কথা, সর্বজনীন এ-গান তাহলে স্মৃতিভারাতুর
উড়ন্ত ফুল
কোন্ কাননের? লতা দোলনার? জ্যৈষ্ঠরাতের? সমস্তিপুর
ছেড়ে গেল ট্রেন, ত্রিতল কামরা, স্বল্প আসন, যাত্রী সুদূর,
লিখে রাখি, প্রিয়, অন্য ভাষায়, লুপ্ত ছায়ায়, আলোকবাদুড়
ঠোঁটে নিয়ে আসে ঠোঙার কাগজ, ভাঙা পেন্সিল, শায়িত শিশুর
একমাথা চুল

শহরে শিখেছি যথার্থ গান, প্রতিটি সুরের অন্ধ-বিধুর
শোকার্ত ঘর চিনেছি শহরে, গলি ও বাজার, কষিত আঙুর,
যামিনীচারিতা ; গ্রাম থেকে আমি কী-ই বা এনেছি, কথায় প্রচুর
পিছুটান ছাড়া এবং এনেছি স্মৃতিবিভ্রম ভাষা বিন্দুর
এতগুলি ভুল।

৪৫
কেলা, কেলাসিত, কেলামঞ্জরী, জলকেলী, আমি একেলা, কারবাইট
কেলা, মিলিয়ে ফেলা, কেলাবেচা, রথদেখা—

আজ ত্রিশ বছর জাতির সেবায় নিয়োজিতম্, ত্রিস্কোমালী বেকারিভ্যান,
সনেট মাইক, রুটিওয়ালা ওয়া-ওয়াসিম, দর্গা রোড, বাবাবনেট,
টায়ারতন্ত্র, গোপন গ্যারেজ, ঝুঁটিওয়ালা পাখপাখালি, রথবাজার,
কাচের কাপ, কাপের প্লেট, গয়গবাক্ষ খাঁচার মধ্যে, ট্যাপের জলে
কপোতাক্ষ, দাঁড়ে-বসানো কপোত আর চঞ্চুহীন বুড়ো সারস—

হায় স্ফটিক, বহুমাত্রিক, রৌদ্রকেলাস, রাসায়নিক স্বজনদ্রবণ, নেতাজি
সুভাষ, মাটির মানুষ, সুতোর জুতো. খড়ের চালে সূর্যকিরণ, বাঁদর
খেলায় সহ্যভালুক—

তেমন ক'রে আসতে বলেছিলে?

যা-কিছু বলো বিকেলবেলায় স্বীকার যাই, মেঘের আলো, জলের
জাঁতা, বৃষ্টিভেজা, রৌদ্রভেজা স্বচ্ছ থালে শুকোতে দেওয়া রক্তটুকু.
জানলা-সিলে, আজও সরল, আলোতরল, না শুকোলে কে জানবে কোন্
বীজাণু, কোন্ চুম্বন, কোন্ কবিতা।

৪৬
জিভ বের করে আমি দু-একটি বৃষ্টির ফোঁটা ধরে ফেলি।

সিকি ভাগ চামচে আমার পাচকপ্রতিম প্রাণ
ঐ-ভাবে ঝোল টানে, বৃষ্টির সুরুয়া চাখে, বলে
আরেকটু হিঙ দিও, তারপর দমে রাখো, ততক্ষণে
কুসুমপুরের বনস্থলী অন্ধকার হয়ে যাক, কাঠকয়লার আঁচ

নিভে গিয়ে ছড়াক বিদ্যুৎ।

দূর মাঠে গ্রীষ্মসন্ধ্যা সরে গেলে, ভাবি
সেই সব সাপেরা কোথায় যারা শুধু জিভেই ছোবল কাটে।

৪৭
একদিন আমরা এইখানে মৃতদেহ সমাধি দিলাম আর এই রাষ্ট্রে ফিরে এল
বসন্তকাল
বিস্ফারচোখ মেয়েরা আর ধাতবকণ্ঠ পুরুষেরা গান গাইল—
ওরা অভিশপ্ত বলেই ওদের গান গাইতে হয়,
ওদের গান শুনতে চায় আঁশ ও ঝিনুকের পাহাড়, প্রবালহাড় ও
জলে ভেসে-আসা নাবিকহীন, পরিত্যক্ত নৌকা—
কোথায় সে-সব লোকেদের মুখ
যারা ছিল অবিনশ্বর, একক এবং তুলনারহিত,
আমরা যাঁকে নিবারণবাবু বলে ডাকছি উনি সে-ব্যক্তি নন,
শর্মিলাদি আমাদের দেখেও হাত নাড়ছেন না কারণ উনি
শর্মিলাদি নন,
হেয় বাতাসে ঝরে-পড়া পাতার সঙ্গে দলে দলে উড়ছে
সঙ্কেতবাহী পতঙ্গ,
তারা অক্ষর সৃষ্টি করে— উড়তে উড়তে তৈরি করে বাক্যবন্ধ
যা আমরা পাঠ করি,
পাঠান্তর হয়
উড়ন্ত অনেক সংজ্ঞা তৈরি হয় যারা পরস্পরকে নাকচ করে,
আমরা তাই নিয়ে তর্ক করি
সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পেরেছি ওরা কারা
যারা আমাদের আগে আগে এগিয়ে চলেছে—
বনবাসী অভিনেতা... যক্ষীপাথর... পিতলের মানুষ।

৪৮
বৃষ্টি নামল আর আমিও এক আশ্চর্য সত্যকে আবিষ্কার করলুম—
দেখলুম, এই লাইনটানা পাতার উপর বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরছে,
গত মাসের মুদির হিসেবের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের ক্লাস-পরীক্ষার নম্বর
বেমালুম মিশে গেল, পাটনা যাতায়াতের ট্রেনভাড়ার অঙ্ক কালো
সুতোর রেখায় ভেসে চলেছে, গৌতমের টেলিফোন নম্বর আর কি কেউ

পড়তে পারবে, ও-টি এখন এক নীল পুষ্করিণী, আমার অবচেতন মন যা যা চেয়েছিল তার প্রতিটি রহস্য দেখছি এই গ্রীষ্মশেষের বৃষ্টি কোনও এক কৌশলে জেনে ফেলেছে। সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানে কিনা ভাবতেও ভয় হয়।

৪৯

শিশুটি উঠোন ধরে দৌড়াচ্ছে— 'মাইয়া গে'।

অবতারণের ঘড়ি (টেবিল ক্লক) ঝুলছে ছাদ থেকে, সুতো-বাঁধা।
ওকে মন্দিরের মাথায় বসাও— কেউ কেউ বলেছিল।
খাঁচা ছিল, খাঁচার ইঁদুর ছিল, গাছে ছিল বাঘ,
চালে ছিল চামচিকে-- সে গিয়েছিল অফিসের কাজে
হেড-অফিসে।

এদের চোখ আজ আকাশের মেঘের মতো স্তরীভূত—
যাকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে পিঁপড়ের সারি
মধু ও মেঘ ও জলের ফোঁটা এবং কাঁঠালিচাঁপা ফুটেছে।
জেল-ফেরত শেয়ার-দালাল বলছে 'আমি নিরপরাধ', তিনজন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম কাল-পরশু জানা যাবে—
অবতারণ নিশ্চয়ই ততক্ষণে ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে তো বটেই কিন্তু কাদের সে সঙ্গে আনবে
তাই ভাবো।
সেকি তার মৃত বাপ মা-কে ফিরিয়ে আনবে?
দেযালে ঐ যে স্বামীজির ছবি ঝুলছে— উনি কি আসবেন
ওর সঙ্গে?
বৌ-য়ের পেটে যে-বাচ্চা রয়েছে সেকি ওর হাত ধরে
দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে?
'মাইয়া গে'
আর বুধনী গোরুটার কী হবে যাকে সে পাঁচ বছর আগে
পশু-আদালতে বেচে দিয়েছিল—

এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ঐ ঘড়ি (টেবিল ক্লক)
এবং কনকস্বরূপ, কিছু ঠোঙার কাগজ, বাতাস বইছে,

মগধ থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি—
যাবো তক্ষশীলা
মগধ থেকে ঋণের দায়ে পালিয়ে যাচ্ছি,
আমি, যে কিনা দড়ি-বানানোয় বিশেষজ্ঞ, তৈলবীজ সরবরাহকারী,
বৈশালীতে জমি ছিল— পাহাড়ের গা-ঘেঁষা,
স্থপতি ও বর্ণনাকারীর মধ্যে তাহলে তফাৎ কোথায়?
পাথর কুঁকড়ে যাচ্ছে। দুই নদী এদেশে মিশেছে।
উত্তর থেকে নেমে এসে সেই প্রথম দেখেছি হ্রদ—
দক্ষিণে জঙ্গল। পাথর ও টালিপাথর নেই।

জলের উপর দিয়ে আলো ক্রমে সরে যাবে—
কিছু প্রতিফলিত হবে মেঘে ও উদ্ভিদলতায়,
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ কিন্তু শাণিতউজ্জ্বল,
চারুবাক (পদস্থ কেরানি) হাঁসগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবছে সন্ধে হল,
ঘরে ফিরি,
বৈঠকখানায় বাজার আর এন্টালিতে যানজট—
কুড়ি বছর বনমালীর কথা মনে পড়েনি,
তার বাড়িওয়ালা দুই ভাই নিশ্চয় এতদিনে মরে গেছে,
কেসটার কী হল—
বুড়ো উকিলটাও নিশ্চয় মরে গেছে— সে কী আজকের কথা!
আর তার নাতনি, হুঁ হুঁ, সারনাথে দেখা।
কাশীতে কেন লোকে আসে বলতে পারেন?
সে-কাশী আর নেই— দিদিমার ঐ আক্ষেপ শুনতে-শুনতে
আমি জামার ভাঁজের মধ্যে রাখা কৌটিল্যের সাংকেতিক লেখাখানি
চেপে ধরেছিলাম— আমি পত্রবাহক,
গ্রীকদরবারে এই শর্ত পৌঁছে দিলেই
হাজার গ্রন্থি জমি এবং এক হাজার গ্রীক স্ত্রীলোক
মগধ ও লিচ্ছবিরাজ্যে বিতরিত হবে,
—সুরেশ সরকার রোডে শান্তি ফিরে আসবে।

প্রকৃতিতে যেসব রঙ এবং রঙের পৌনঃপুনিকতা আছে—
তাদের পশুআত্মা আছে।
যেসব জলপরীরা সমকামীদের ডাকে, বলে এই স্রোতে ঝাঁপ দাও,
পাহাড়ে যেসব মিথুনমূর্তি অন্য পাহাড় থেকে হাতছানি দেয়—

তারা নিদ্রাহীন।
আর সাপ ধুলোর মধ্যে জেগে ওঠে।
বাতাসে ধুলো, ঝরাপাতা, খড় আর রামধনুর সাত রঙ উড়ছে।
এখন আমারও জেগে-ওঠার সময় হল—
বিকেলের জলে সাঁতার কাটলে হাল্কা হয় মাথা। ভাবি, গান গাই।
তখনই লজ্জারূপ আলো পড়ে উলঙ্গ শরীরে— সোজা আকাশ থেকে,
দেবস্থান থেকে শ্বেত আলো আমাকে ডাকে, বর্ণিত করে,
হলুদ আলো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।
ঐ পথের শেষে শুয়ে আছে নীল সাগর,
তার রক্তাক্ত মাথা, তার কালো মুখব্যাদান।

আমার পশুআত্মা একদিন স্নানশেষে ঐ ঢেউ থেকে উঠে আসবে।
পিছু-পিছু উঠে আসবে এক বিশাল শোভাযাত্রা—
গন্ধবণিকদের, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারকদের, যারা মোমবাতি বানায়,
যারা উল্কি কাটে, বঁটি শান দেয়, যারা শাঁখারী— তাবা আসবে
যারা পিতল পেটে, সোনা গলায়, যারা জাল নোট বানায়,
যাদের হাতের লেখা ভালো আর যাদের হাতের লেখা ভালো নয়,
যারা জলচাকি সারায়, যারা সাশ্রয়ী, যারা অস্মৃত,
যারা অতিপ্রজ, যারা দেউলিয়া, যারা আবাসী,
যারা ফাটকাবাজ, যারা চোটাখোর, যারা উদ্‌বংশীয়, যারা জারজ,
—সবাই আসবে।
যেভাবে উঠে এসেছিল আদি প্রাণ জল থেকে, জলের বিভাজন থেকে।

৫০

শরত ইন্দুর মতো শাদা নৌকা জলে ভাসমান।
প্রিয়, তোমাকে গাইতে বলি গান—
স্রোতের মতোই
তুমি জানো সুর, জানো স্বপ্নের বহু বিসর্জন,
জলে ডুবে আছে মই।
. ভেঙে পড়ে আছে কোঠাবাড়ি, বারান্দা, দালান—
প্রিয়, তাই আজো গান।

আমি চাঁদের কিনারে গিয়ে বসি,
দড়ির আড়ালে

সহজ রান্নার গন্ধ উড়ে যায়—
    শীতের বাতাস
        যে স্মৃতিতে গঠন করে তার মতো এমন নির্মাণ
            আর কে জেনেছে বলো—
                কে দেখেছে বছরে বছর
তরল আগুন লেগে পুড়ে যায় শ্মশানের ঘাস।

৫১

বাথরুমে কে গাইছ গান?
ধরা আছে যত জল অপর্যাপ্ত বালতি ও মগে
তা কি সাংসারিক হবে? তা কি তরঙ্গসমান?

স্নানঘরে তুমি কবিয়াল।
বাঁশবন নুয়ে আছে। হলুদ পাতার ঝড়ে
উড়ে যায় পুরনো তোয়ালে— আমাদের ছেঁড়াখোঁড়া পাল।

রোদ এসে পড়েছে সাবানে।
এ-ঘাট পিছল।
দু-ধারে রেলিঙ নেই। নামো সাবধানে।

ফাল্গুনে কেনা হবে ইস্পাতনোঙর।
ততদিন যেয়ো না সাগরে—
এই ব্রজে বাঁধো তুমি ঘর

এইখানে গাও তুমি গান
ইলিশের, কালিন্দীর, মৃত নাবিকের—
সংসারী, পেতে আছি কান।

৫২

কোথাও-না-কোথাও আমার ভিতর এক ফুটবল-সমর্থক লুকিয়ে আছে,
সবুজ মাঠ দেখলে সে লাফিয়ে পড়ছে বাস থেকে—
নিশান কাঁধে ঘোরাফেরা করছে পুবে-পশ্চিমে—
সে গেটের সামনে লাইন ভাঙছে,
ঘোড়ার তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে নদীর পাড় অব্দি,

হাঁটাপথ ভালো লাগছে তার—
ভালো লাগছে হাত-গোটানো জামা, পা-গোটানো প্যান্ট,

ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্নতা দেখা যাচ্ছে তার, সে-ও সামাজিক
হয়ে উঠতে চাইছে, কিন্তু নিজের শর্তে,
আর এইসব খেলা দেখার জন্য মিথ্যে-ছুটির দরখাস্ত লিখে-লিখে
তার সাহিত্যবোধও বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আজকাল।

৫৩
যে-পাখি দৌড়ায় শুধু মেঘ ভরে আছে তার ছুটন্ত ডানায়।

৫৪
অনতিউচ্চ সুরে গান করো— পাথরভাঙার গান।
আমাদের বাড়ি আজো অসমাপ্ত। সম্ভবত যথেষ্ট সম্মান
তোমাকে হল না দেওয়া। চুনের গোলার পাশে কর্মরত ভূত
দেখে আমি বুঝেছি শৈশবে কেন এত ম্লান, অপ্রস্তুত

বাড়ির আড়াল দিয়ে আমাদের পথ বেঁকে যায়।
আয়নার সূর্য লেগে সহসা বিরল চিল বটের মাথায়
অপমানিতের মতো মাথা তার নীচু করে বসে আছে স্থির—
এ-পথে গিয়েছে যোদ্ধা, শান্তিদূত, কত অবক্ষয়ী বীর।

আজ ফুল হতে জন্ম নেয় প্রেত। ডিম হতে নখের আঁচড়ে
দুর্বল আঁধার এক হলুদ পাটল রসে মৃত্তিকার 'পরে
গড়ায় অনন্তকাল। দেখি ক্লান্ত ভিক্ষার টিন

উজ্জ্বল তামার মতো, বৃষ্টি লেগে, ঘাসে পরাধীন
ধান, ঋতু, রক্তমাখা হাত ফেলে রাখে—
দেখি জ্বলন্ত উনোন ঘিরে রোদ নামে বাড়িটির ফাঁকে।

৫৫
পাগল ঝর্নার ধারে পড়ে আছে আমাদের বাজারের থলি।
তুমি যা বলেছ সে তো মিথ্যা শুধু— তবু মনে পড়ে হাঁ জী
ঘোড়াটির দেখাশোনা প্রয়োজন। তাকে মন খুলে বলি
নিজের দুঃখের কথা। সাজি

সেনানীর মতো। সাজি ভুলে-যাওয়া রানির পোশাকে।
বহুকাল জমা আছে আরকের তিক্ত পাতা উত্তরের জানালার তাকে।

আমার বাঁশিটি
হীরা ও পান্নায় গড়া। তার উদ্ভিদকরোটি
থলি হতে উঁকি দেয়। অপব্যয় করেছিল সেবার বৈশাখে
ঐ উপহার কিনে, যাকে রাখো সেই রাখে।
মেলায় হারানো শিশু— তারো হাতে ছিল বাঁশি
মাথায় গুঞ্জার মালা, ওকে খুঁজে ফেরে দাসী।

তাকে ঢেকে রাখে বালি
কাদা ও মাটির তাল— বাঁশবন ভুলে যায় সব
ভুলে যায় ফুলডিঙি— জানে বাংলোর মালী
তোমার ঠিকানালেখা চিঠিখানি পড়ে আছে কুয়াশানীরব
কাঠের বাক্সর নীচে। কে তাকে উদ্ধার করে!
সাধ্যমতো একদিন সে বলেছে হানা দেবে প্রতি ডাকঘরে।

ঐ ঝর্নার জল
বইছে বছর জুড়ে— বাইশ বছর তার ভিজে করতল,
এখনো জ্যোৎস্না রাতে পরী নামে, মুণ্ডহীন দেহভারে নত
ঘোড়াগুলো পানি খায়, স্রোতে ভাসে পিতল নূপুর, যেন শত-শত
চেরীফুল জন্ম নেয় চাঁদের বাতাসে আর ঝর্নার টানে—
এরও বেশি ফুল ফোটে যারা মৃত তাদের বাগানে।

৫৬

পোড়া চোখ, হৃৎপিণ্ড, ডোমের দু-হাতে ধরা লোমশ আঙার—
তুমি কার কথা বলো? নদীর আঁধারে আজ পদশব্দ শোনা যায় তার,
জলের, বানের হাঁক— ধ্বসে পড়ে হাট, গ্রাম— স্রোতে অহর্নিশ
ভেসে যায় মরদেহ— আটাত্তর ডুবে যায় যেন দূর বেয়াল্লিশ
সাল— ভুলি নাই— দেবতার পাঞ্জা ছাপ উলঙ্গ পাষাণী
পোড়া চোখ, হৃৎপিণ্ড, বন্যায় দেখা হল— না দেখাই ভালো ছিল জানি।

আজ দশমীর চাঁদ ওঠে পুবে কী পশ্চিমে তারও নিশ্চয়তা নেই
ব্যারাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্মশানবট বুকডোবা জলে নাড়ে সেই

মানতের টুকরো ন্যাতা, পাখির হুতোম নীড়, তিনহাত রজ্জুভ্রম— কিনা
এমন স্থাবর আর কেউ নয় প্রকৃতিতে, তার্কিক— যার মতো দৃষ্টিশক্তিহীনা
এমন শিকড়ও কার-বা আছে ব্যবসায়, উৎপাদনে, দাম দেয়, কেনে
পোড়া চোখ, হৃৎপিণ্ড। এবারের বন্যায় দেখা হল। না দেখাই ভালো ছিল জেনে।

সামাজিক দুঃখ আছে। নীতি আছে। ঝুলে ছিল এতদিন ন্যায়পরায়ণ
কেতুগ্রাম হোটেলের কালো কাঠ— ভাত প্রথমে তিরিশ পয়সা, পরে দশ—
আজ নেমেছে প্লাবন।
শ্রাবণে গভীর বৃষ্টি— আশ্বিনের জলোচ্ছ্বাস— বাঁধ ভেঙেছে নিম্নচাপে— যেমত
ছিঁড়েছে নোটিশলেখা। নিরুদ্দেশ যাত্রীদল। গ্রামে কেউ হত। কেউ বা নিহত।
কেউ শুধু-বা শ্মশানতক যেতে পেরেছিল। এনেছিল সামান্য জ্বালানি।
বাঁশ ও চন্দনপাতা, পোড়া চোখ, হৃৎপিণ্ড— না দেখাই ভালো ছিল জানি।

৫৭
যে-সারল্য কবিতার কাছে আমি খুঁটে খাই, তুমি
কিছু তার ভেঙে নাও। হাত পাতো। দূর বনভূমি
তুরগতুরঙ্গ রবে ভরে যায়। তাদের পায়ের শব্দে
পাথরনদীর তীর কেঁপে ওঠে। এই অব্দে
যা-কিছু উৎপন্ন হল ক্ষেতে, মাঠে কামারশালায়—
প্রবাসী দস্যুরা এসে অকাতরে কেড়ে নিয়ে যায়।

কবিতার কাছাকাছি বসে থাকি আমি আর শুধু সরলতা।
এই যুদ্ধ শেষ হলে, এ-আগুন নিভে এলে লতা,
সাপ ও বৃশ্চিক-সার বিক্রি করি। উপার্জন কম
তাই অপব্যয় আমাকে সাজে না। জেনো, যাদের বিভ্রম
রণে, রক্তে, অশ্রুপাতে ক্রমশ প্রকাশ হল— তারই বংশধর
আমি দূত, গোপনসংবাদবহ, উভয়ত চর।

গন্ধ শুঁকে ওঠে আসছে একদল রুপালি কুকুর
পদচিহ্নে নাক গুঁজে, সন্দেহতাড়িত ভূত, দ্বিমুখী অসুর,
সেচজমি বাঁয়ে ফেলে. উত্তরের টিলা ও পাহাড়
পর্যবেক্ষণ শেষে—জানি, মেনে নেব হার
এ-মুহূর্তে পরের প্রহরে, নয় উৎসবে কাল
দেখো কেমন বাতাসে দোলে আমাদের মরণান্ত ছাল।

আজ কবিতার কাছাকাছি বসে আছি লিপিকার। ঐ সরলতাখানি
আমার প্রাণের 'পরে নুয়ে আছে। কিছু ফুল ঝরছে সন্ধানী
ফলের, বীজের সাথে। খাদ্যসম তুলে নিই তাকে—
খুঁটে খাই, হাত পাতি, বিষের আত্মাকে
মানুষ যে-ভাবে জানে অপমরণের আগে, জেনো, সেই মতো স্থির
সারল্যের পাশাপাশি শুয়ে থাকি আমি আর কবিতার অটুট শরীর।

৫৮

তোমাদের রাজনীতি ভালো।
তোমাদের সমাজবিজ্ঞান
বড়ো উপকারী।
তোমাদের দার্শনিকতাও
স্বাস্থ্য-নদীর তীরে
জীবন নামক ঐ
জটিলতার
ছোটোখাটো প্রতিষেধক
নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে একদিন।

আমি এই
সজনেগাছের নীচে
চায়ের কেটলি হাতে
বসে থাকি।
ঢেলে নিই।
মাথার উপরে
সজনেফুল খসে পড়ে
চৈত্রের বাতাসে।
চায়ের কাপের
উপরেও ঝরে তারা।
আরো ঝরে
অন্তহীন শুঁয়োপোকা।
ওরা
আমারই গায়ের 'পরে
নেমে আসে নিরুদ্বেগ।

৫৯

আধকাটা গাছ, গায়ে তার রক্তদাগ আছে।
কাল লরী আসবে। সঙ্গে যারা মানুষ আসবে তারা ভূতুড়ে মানুষ।
ধুলোয় ভর্তি এক বিশাল নালির পাশে শুয়ে-পড়া ঐ গাছটিকে
আঙুল দেখিয়ে আমরা নিশ্চয় বলতে পারব, 'উনি একদিন
অপদেবতার মতো ফিরবেন এই গ্রামে। কেননা উনিই শ্রেষ্ঠ।
উনি জল খেতে চান বলে মাটিতে উপুড় হয়ে ছিন্ন ও প্রবল।'
কাল গমপেষা চাকি নিশ্চয় এমনই ঘুরবে—
শুধু শস্যহীন ঘূর্ণিপাত থেকে তার ঝরে পড়বে আগুনের দানা।

৬০

এই চোখ একদিন চেয়ে থাকত— দেখেছিল বহু কিছু।
সেতুর আড়াল দিয়ে সকালের খড়ের নৌকা ভেসে যেত
তা-ও তার হিসেবে পড়েছে—
জমির উপর থেকে চোখ দুটি বুঝে নিত
কোথায় লুকানো আছে স্বর্ণভাণ্ড আর কোথায়-বা ছড়িযে রয়েছে
পশু চলাচলের সুড়ঙ্গ।
রাত্রে যারা সীমান্ত জুড়ে ধ্বংসবীজ পুঁতে যেত তাদের গ্রাহ্য
করেনি এই চোখ।
তুচ্ছ এ-সব ব্যাপারে কোনোও উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক ওদের,
মানে, ঐ চোখ দুটির—
কেবল একদিন মানুয সমান উঁচু ধানক্ষেতের ফসলের ভিতর
নেমে পড়েছিল গফুর মিঁয়ার ছোট বিবি—
তাকে আর দেখা যায়নি,
চোখ দুটি এখন কেবল তাকেই ভেবে বেড়ায়।

৬১

অনিঃশেষ ভালোবাসায় আমি তোমার বাহুর অভিলাষী
মর্ত্যে গাঁথা ঘরে-ঘরে হাহাকারের দারুণ চিতা জ্বলে
অনিঃশেষ ভালোবাসায় আমাকে দাও স্পন্দমান বাহু।

চারিদিকের নীলিমা আজ হিরণ্ময় তোমার মুখপানে
দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে ভাসে শাদা পালের তীব্র আশাগুলি
সংগ্রামের প্রহরে ভাবি কোথায় পেলে অমন তরবারি

নিরঞ্জন জয়ের ধ্বজা হয়তো পুড়ে যাবে।
সে-কথা তুমি জেনেছিলে নীরবতার আনত আঁখি দেখে
অন্ধকারে প্রত্যেকেই ওপারে চলে গেল।

একটি তারা যদিও জ্বলে তোমার ম্লান করতলের মাঝে
চারিদিকের নীলিমা তাকে লুকাবে কোন অন্ধকার ফুলে
পাহাড়ে আর বনে-বনে কল্যাণের আগুন প্রতিবেশী

না-হয় ঐ বাসনাগুলি জাগাও তুমি আবার রণদেশে
প্রত্যেকের অচেনা দেহ মিলিত করো অন্য শত দেহে
অনিঃশেষ ভালোবাসায় আমার সাধ স্পন্দমান বাহু।

৬২
এ তো তোমাব আকাশ পানে চেয়ে থাকা
দু-হাত ধরে মিলিয়ে দেওয়া শাদা-কালো
আকাশ জুড়ে বিদ্যুতের আগুন হানা।

ঝড়ের রূপ পথে-পথে খোঁজে তোমায়
কোথায় তুমি? মিলিয়ে দিয়ে শাদা-কালো
জ্বলবে দেখো রাতের দ্বীপ উন্মীলিতা।

পৃথিবী তার কুটিলতার পঙ্ক মাঝে
একটি তীর লুকিয়ে রাখে সংগোপনে
আমরা তাই বর্মতলে প্রদীপ ঘিরি।

বুকের মাঝে আগুন আছে— এই তো ঋজু
তোমার রূপ: তবে কেন পথে পথে তোমায় খোঁজা?
উন্মীলিতা রাতের দীপে অবিশ্বাস?

৬৩
আলো আর অন্ধকার দুলছে শাদা দেয়ালে।

তুমি ফিরে আসছ অন্ধকার থেকে আলোয়, আলো থেকে অন্ধকারে,
ছায়া গড়ছ রোদ্দুরে, নিজেকে টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছ তমোহীনতায়

রুপোলি ডানার মতো তোমার বাহু ছিনিয়ে আনল তরঙ্গের ফসল
তাকে ভাঙল বুকের অবরোধে
ভাঙল একটি কথায় একটি সুরে, যখন তারা বলল, জাগো,

নগ্নতায় জেগে উঠলাম।
আমার দেহ তখন কালোমাটির মতো ছড়িয়ে ধরেছে তোমার রোদ্দুর,
নিশ্বাস নিচ্ছে তোমার নিশ্বাসে,
তার হাতে রয়েছে শিল্পীর দণ্ড
আঘাতে-আঘাতে গড়ছে মুখের পর মুখ
তাদের কখনো বলি সম্ভোগ— কখনো বলি প্রেম—
এখন বলি বিতৃষ্ণা।

রুপোলি ডানার মতো তোমার বাহু ছিনিয়ে নিয়ে গেল তরঙ্গের ফসল
তারা যাবার আগে বলল : ঘুমোও, ঘুমোও,
যতদিন না আবার ফিরে আসি, ততদিন।

৬৪
পৃথিবীর সব ঋজু নিয়মকে তুচ্ছ করে
স্রোতঃপ্লাবী মন—
একবার এই ঘরে নামো তবে। দাঁড়াও শিয়রে।
আকাশে কেমন করে ভোর হল, জানালায় স্বচ্ছ আলো এল—
এই ঘরে অন্ধকার তবু যদি চোখ টিপে ধরে
শেফালিগুচ্ছের গন্ধ বারবার বলে ওঠে :
মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কোনও।
হায় মন, তুমি হাহাকারে বারবার কেঁদে বলো—
মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কোনও।

●

অন্য দূরচক্রবালে সরে গিয়ে মন
যতবার হেসে ওঠে— ততবার করেছি স্মরণ
তোমার দুহাত জুড়ে ঘুরে চলে জন্ম-শেষে আনন্দের মালা
দ্বীপের নিরালা
সমুদ্রের আত্মমগ্ন মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে-ধ্বনিতে
কেঁপে ওঠে। ভীরু পাখি দারুণ উত্তর শীতে

দুঃস্থ হল—
অন্য দূরচক্রবালে সরে গিয়ে মন
যতবার হেসে ওঠে— ততবার এই কথা করেছি স্মরণ
মেঘান্তরে দিন যায়— রৌদ্র মেঘ আলোবর্ষ সব
আমার স্বগত সুরে আনন্দের শ্বেত-আলিপন
এঁকে দিল। রৌদ্র মেঘ আলোবর্ষ সব
হাত ধরে নেচে চলে... আমার স্বগত সুরে
আনন্দের শ্বেতপুষ্প বৃষ্টি নামে...

মনে এল কবে এক আদিগন্ত মাঠে-মাঠে অন্ধ বৃদ্ধ চাষি
দূরলক্ষ্য কাকে ডাক দেয়।
তবু সে তো অবজ্ঞাত— অন্তহীন, ক্ষমাহীন আকাশে নীরব
সূর্য হয়ে জ্বলে।
স্থবির কণ্ঠের সুর পৃথিবীতে বেদনার রাত্রি-মোহ আনে।
আকাশে কেমনে কবে উচ্ছ্বসিত সন্ধ্যা হল
তুমি এলে
আকাশগঙ্গার পথে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের আলো উৎসবে
প্রমত্ত নটিনী হয়ে।
হায় মন, তুমি অন্ধকারে একবার কেঁদে বলো
মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কোনও!

৬৫

আমাদের কাঠের বাড়িটি আজো বেঁচে আছে, জেনে রাখো, তুমি জেনে রাখো।
লুপ্ত দ্রাবিড় বনে তাকে জড়িয়ে রয়েছে নীল গুল্ম আর স্বপ্নে-দেখা ফার্ন,
শামুক পিছল দাগ রেখে গেছে ঐ মুখে, ঐ পোড়া ঠোঁটের কোনায়,
চোখের জলের চিহ্ন যদি বেঁচে থাকে তবে আমাদের কাঠের বাড়িটি নিশ্চয়ই
বেঁচে আছে।
আমাদের কালো গরুটির গভীর ঝড়ের রাত্রে বাচ্চা হয়েছিল।
তখন কঙ্কাল তার পড়ে আছে এক ধামা, খ্যাপা বাছুর চাটছে মৃত জননীর হাড়,
যা আমরা স্বপ্নে দেখি, যুগ্মতায়— তাই ঠিক। পরিপাটি চুল

পর্বত আরোহী দল, প্লাস্টারমাখা গাল, হাতে ছিপ, নিদ্রা থেকে উঠে আসা
বাস্তবের মতো ঘিরে আছে বাড়িটিকে, সহজিয়া গুল্মের মতো, জানতে চাইছে দাম,

কে মালিক, লতিয়ে উঠছে তারা জানালায়, ফেলে যাচ্ছে জলের বোতল আর
পাতাগুলি টিফিনকোমল,
হয়ত-বা ঐ নুলো বাছুরও জানতে চাইছে আমাদের কাঠের বাড়িটি আর
কতকাল বেঁচে থাকবে।

৬৬

বসন্তের কত দেরি? আর কত ক্লান্তি নিয়ে কেটে যাবে এত হিম রাত
চারণ খড়েরা বলে : একদিন ছিল ছিল এমন প্রভাত—
আশ্বাসে বেঁচে থাকো। মৃগশিরা তুমি আর আমি,
তাই যেন বেঁচে আছি— আমাদের কাল যেন মন্থরগামী।

তবু এই হেমন্তের প্রান্তরের রিক্ততায় পাখি এক আসে ;
পাত্র যত ভরে তোলে কোলাহলে, সকালের ঘাসে—
স্মৃতি তার পড়ে থাকে বিস্ময়ের চিহ্নের মতন—
ফাল্গুন পলাশে আর মানুষের চোখের গভীরে নাচে তার মন।

সেই পাখি স্বপ্ন দেখে পৌষের কঠিন প্রহরে— স্রোত আছে লীন ;
ডেকে ডেকে ঘুম তার ভাঙাবেই— সুর হবে ক্ষীণ।
নিরুত্তাপ অন্ধকারে আনবেই কোনো এক প্রাণের আলোক ;
পৃথিবী ভুলবে তার হেমন্তের রিক্ততার যত দুঃখ শোক।

মৃগশিরা! ভাবো মনে একদিন অয়নান্ত সূর্যের তাপে
এত নীলে— এত গানে— গানের আলাপে
ঘাস থেকে ঘুম ভেঙে উঠবেই সোনার সকাল ;
পাখির ইচ্ছা যেন হয়ে যাবে বসন্তের কাল।

৬৭

নদীর স্রোতে তুমি আমায় দেখালে
একটি পদ্মপাতা আপন মনে ভেসে চলেছে।

ক্লান্ত পায়ে মাঠের ধুলো মেখে ঘরে ফিরে এলুম।
কেউ স্নেহ দিল, কেউ ভালোবাসা,
তুমি ক্লান্তিহর আঙুল বুলালে রুক্ষ চুলে

হঠাৎ চোখে দুলে উঠল অন্ধকার স্রোত
তীব্র আবেগে প্লাবনের জল এল ধানক্ষেতে
ভাসল সাধের গোয়াল

উঁচু আশ্রয়ের মাটি থেকে আশ্বাস দিল প্রতিবেশী
বলল : ও পথে নয়, পালিয়ে এসো,

আমি হিমস্রোত কেটে এগিয়ে গেলুম পদ্মপাতার দিকে
সে ভেসে চলল আমার মুখোমুখি—
অন্ধকারে নিশিডাকের মতো।

৬৮
শুধু অন্যদের কথা ভাবি, বলি : বোসো, স্থির হয়ে বোসো,
তটস্থ লোককে বলি— দাও ডুব, ডুব দাও জলে,
নদীর ভিতরে যারা শুয়ে আছো সেইসব অন্তিমসাঁতার
যুবাপুরুষেরে বলি : দেখা হবে, নিশ্চয় প্রতিযোগিতায়, খেলাধুলো হবে,
বড় পশুদের কাছে ছোটো-ছোটো অদ্ভুত প্রাণীর আমি আনাগোনা দেখি,
জানি যেখানে ধ্বংসের বীজ পোঁতা আছে— সেই মাঠ— সেই রুগ্ন মাটি
মারীউদ্ভিদ তৃণে ভরে যাচ্ছে, খুঁড়ে যাচ্ছে অ্যাসিড-লতায়।

৬৯
সতর্ক আমিও চাই আধখানা ডাল ভেঙে নিতে। কখনোই পুরো গাছ নয়।
ডাব ও নক্ষত্রপুঞ্জে উড়ন্ত কুড়াল তার বিঁধে আছে অর্থাৎ কেশরী রয়েছে
এই বনে এবং আমরা আছি, ডাক্তার-উকিল আছে, সেতুবিশেষজ্ঞ আছে,
কেশরীর ট্রাকখানি জলে ডোবা, কয়েকটি গোল কাঠ গড়ায় নালিতে,
ডাক্তার হাসছে এই চমৎকার সন্ধ্যায়, কর্মচারীণ শীতে উকিল হাসছে,
নদীর ওপারে গিয়ে আলো নাড়ে সেতুবিদ্, আমি হাঁকি আধাআধি মাপো,
অর্ধেক ব্রিজ টানো, অর্ধেক গাছ কাটো, পুরোপুরি কোনোটাই নয়।

৭০
পোড়া কাঠ স্বতন্ত্র আগুন
ডানাঅলা মোমপাখি খুন
তোমার ঘরের পাশে ঘর
ছিল তার, জানি অতঃপর

জীবনে হবো না সুখী আর
পাবো না যথেষ্ট দুঃখ— যার
ঠোঁট-লাগা মানুষে কুশল
সন্দেহগান জাগে, জল
এইভাবে টেনেছিল দাগ
যেন কোন্ জমির বিভাগ
আগুন সুস্থ আছে আজো
সংসারী যেখানে বিরাজো
মাঝামাঝি বসেন ঈশ্বর
গৃহসম এই তাঁর ঘর
ঝাঁপ-ফেলা রাত্রির দোকান
গণিকার নিষ্প্রদীপ স্নান
দাঁড়িয়েছে বাহুহীন ধড়
যৌনের আছোঁয়া অক্ষর
অন্ত্রের ভিতরে পিপাসা
রক্তমুখ মেদকাটা ভাষা
পাখি কই, বুড়ো ভাম, পাখিটুকু কই,
বাতাসে দুলছে খাঁচা উপচানো বই
আঁধারে উড়ছে কাঠ, আধপোড়া খড়,
জ্বলছে আগুন নীচে, তিনপুরু সর,
দুধ-বালতির বেত, ঘাসের আসন
আমাদের মুখোমুখি স্তন
আমাদের মুখোমুখি কাত
টলোমল নবনীপ্রপাত
শায়া ছেঁড়া ধান-চাল-গম,
এ-দোকান যথেষ্ট আশ্রম।

৭১

আমাকে ডাকার আগে পাখিদের ডাকো। যে-গুপ্তবিদ্যার
আনাচে-কানাচে. ওরা লুকিয়ে রয়েছে, চোরাডাক সেখানে পৌঁছাক-
আমরাও ফিরে পাই পুরনো রান্নার পুঁথি, জল-
শোধনের অভিজ্ঞতা, ভাঙা মদ—

আমাকে ডাকার আগে সেনানীকে ডাকো যে সে-দুয়ারে ঘুমায়,
তোমরাও খুঁড়ে দ্যাখো কেমন শক্ত কাঠে প্রস্তুত ওনার পাঁজর
কোন্ বায়ু শরীরের ভিতরে বইছে, আজ কী ছিল আহার ঐ সৈনিকের,
ঐ ফটকের পাহারাদারের,

আমাকে ডাকার আগে মেয়েদের ডাকো যারা রোদ্দুর কাপড় মেলেছে
ঐ দড়ি চরম বিপদসীমায় আরেকটু নত হোক, দেখা যাক আফ্রিকায়, দক্ষিণ প্রদেশে,
এত কেন মানুষের শোভাযাত্রা, ডারবানে, জোহানেসবার্গের গভীর
টেবিলে কী চুক্তি মেলা, কাপড়েরই মতো, আজো রক্তে জলে ভেজা,
তার লেখাগুলি পড়া যায়, এত দূর থেকে, যদি কেউ ইচ্ছে করো— পড়ো।

৭২

নেই গ্রীষ্মদিনের ছুটি— শুধু তত্ত্বকথা আছে।
ভেঙে-পড়া এই তালগাছে
সামান্য একটু ছায়া, ভরা রৌদ্রে এখানে দাঁড়াই
যেন নিষ্কৃতির চেয়ে বড়ো, দুর্দমনীয় টানা ছুটি চাই—
শোনো নিমন্ত্রণ
ক্ষমার অধিক তীক্ষ্ণ, উপহারজাত বীজ করেছি বপন,
তার ছায়া একদিন ছায়া দেবে— এই অভিলাষ,
দেবে সাহায্যবটের মতো নাশকতা, পুরুষের গলাবন্ধ ফাঁস
কিছু তার গল্প হয়ে থাকে
সে-ই শোনে, যাকে
দাওনি এখনও ছুটি, শুধু দিয়েছ বিরতি,
গ্রীষ্মদিনের মাঠে ডাকিনের উল্টে-পড়া গতি।

৭৩

নরুন ঝাউয়ের বনে কাঁচির আঘাত লেগে আছে।
দু-পাশে নাপিতবাটি, জলাশয়, ছোটো, কিন্তু পরিপূর্ণ নয়—
কিছু ফেনা, বুদ্বুদে জ্বলন্ত সূর্যের ঘোর কালো ছায়া প্রকাশ পেয়েছে,
আক্রান্ত ছুটছে নর, নারীর সঞ্চার, আর ঘেয়ো পশু— শিশুর আরোহ,
পিছু নেয় ক্ষুরধার অস্ত্র কত— ছাঁটে চুল, দাড়ি, মাথা শিখাহীন,
ধায় আরো জরদ্গব শল্যের বিচার,
যা শরীর বিদীর্ণ করে, স্নায়ু ছেঁড়ে,
মেদ ছিটকে লাগে প্রকৃতির মুখে।

৭৪

প্রভু, এখানে বিস্ময়।
নদীতীরে দেখি এক ভাসমান শিলা
যেন কলার মান্দাস
তবে কি রাজার চর সংবাদ এনেছে
যুদ্ধের আয়োজন দু-দেশে প্রস্তুত,
—এবার হনন?
লিখে রাখি অন্তহীন রাত্রি আর দিনের বিভাগে
কৃষিজমি শস্যে ভরে আছে, গোচারণ ফেনদুগ্ধময়,
প্রভু, আমার বিস্ময়।

রক্তে যে সামান্য বিষ মিশে থাকে
তাই রাজদ্রোহিতার তেজ, অভিশাপ, যে-কোনো যন্ত্রের প্রতি
গভীর সন্দেহ—
লিখে রাখি তোমাদের ভুল পথে চালিত স্বদেশ
একে ধ্বংস করো
একে ঠেলে ফেলে দাও
যেন বাস্তবতা হয়
যেন জলে ভাসে শিলা
প্রভু, এখানে বিস্ময়।

৭৫

অবেলায় ঘুম পায়। জেগে উঠি। তা-ও অসময়ে।
দেখি বিকেল গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যার ঢালের উপর
দাঁড়িয়ে দু-জন মেয়ে প্রাকৃত ভাষায় কথা কইছে, আমিও হাসছি,
যেন কত বোঝা গেল, অনর্থের তুকে বশীভূত
অর্থপূর্ণ মাথা নাড়া আমাদের, কর গোনা, সম্মতি দিয়েছি কিনা
মনে নেই, অথচ ব্যবসা হল, মেলামেশা হল, 'আসিস তাহলে...'
বলে বাঁ-দিকে তাকিয়ে দেখি গোরুর গাড়িটি একা পূর্ণিমার রাতে
চাঁদের মতন এক ভারী বস্তু বয়ে নিয়ে চলেছে নিঃশব্দে।

৭৬
সর্ষেহলুদ সূর্য অন্ধকার নামার আগেই, যখন মাঠের কিনারায়
বসে পড়েছে, তখন আরেকটু হলেই আমার জুতোয় ঠোক্কর খেত—
আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছি, প্রায় দৌড়াচ্ছি বলা চলে,
পার হয়ে এসেছি ধর্মকল, সুবিচারের জাঁতা।
অনেক পতাকা অর্ধনমিত দেখে এসেছি—
যে-দুঃসংবাদ আমি বহন করে নিয়ে চলেছি তা সামনের সদরে
পৌঁছানো মাত্র ওখানেও ছুটি ঘোষিত হবে, হয়ত আগামীকাল,
তারপর পরশু ঢুকে পড়ব রাজধানীতে।
তাহলেই আমার দায়িত্ব শেষ—
আগামী সোমবার বেলা এগারোটা তিন মিনিটের জন্য
আপনারাও মোটামুটি প্রস্তুত থাকুন।

৭৭
রাখী অগ্নি খুলেছে। কী-ভাবে খুললো আর কেন-বা খুলেছে
তা আজ মনেও পড়ে না। আমি তো স্বভাবদোষে দুষ্ট আছি।
টাকা ধারি, মিথ্যে বলি, ভাড়া বাকি রাখি। জানি ওরাও নিশ্চয়
খুলে পড়ে যাবে। স্নান সেরে এসে আমি একদিন হঠাৎ
লক্ষ্য করবো আমার দু-হাতে কোনো রাখী নেই। অযত্নে গা-মাথা মুছে
পাতে বসবো আমি এক ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, ঘুমন্ত পুরুষ।

৭৮
আজ স্পষ্টত মনে হয় যা-কিছু বলার ছিল আমিও বলিনি
অন্য কবিদের মতো। ঐ অধোমুখ রহস্যের ধ্বনি
অংশত মেঘে ঢাকা, অংশত যদি গান গাই
এ-দিনের ঠাণ্ডা রোদে। ভোর হল। ফাঁকা ট্রাম ফিরছে ফাঁকাই
গঙ্গার জল ছুঁয়ে। কাছাকাছি খেলা করে ঢেউ
প্রাকৃতিক। পাড়ে পাড়ে, উৎসবের শেষে, কেউ
ক্ষেপণাস্ত্র সাজিয়েছে। লোকালয় থেকে দূরে বৃত্তময় ঐ চাঁদমারি
জয়ের গোপন খেলা পরাজিত পুরুষের। জিতি কিম্বা হারি
আকাঙ্ক্ষার তীর ঘেঁষে উড়ে আসে শুক পাখি, কথা বলে, ডাকে
অন্য কবিদের মতো।
সে কি ধরেছে আমাকে
এ-দিনের ঠাণ্ডা রোদে? ফাঁদ পাতা নদীর দু-ধারে—

উর্ণজালসম তার উজ্জ্বল প্রসার, তার ছন্দোময়তারে
ভুল বুঝি। হ্লাদ হয়। সংক্রামক হাসি
ট্রামের দু-একটি লোক লক্ষ্য করে। তারা হাসে। কাশি,
হাসির প্রবল বেগে। 'জয় হোক' বলে সাধুকর
'কার জয়'— এই শ্লেষে গালবাদ্য, প্রচণ্ড রগড়,
ভাঁড়ামি, অশ্লীল গান শুরু হয়, বাড়াবাড়ি হতে থাকে
বৎসরে বৎসরে, প্রেমে, বিরহে ও দৈবদুর্বিপাকে—
তার যেন শেষ নেই। এ-আনন্দের, এ-উল্লাসের
কোনো পিছুটান নেই। তাই স্পষ্টত মনে হয় যদি আসি ফের
বিজয়ীর ফুলসাজে— তবে কবিপুরুষের মতো
মাথা নিচু হতে হবে, রুদ্ধবাক, বেদনাআহত।

৭৯
'নিজের ছায়ার চেয়ে তুমি বাস্তবিক বড়ো নও'-- আমি কবিবন্ধুটির
কাঁধে হাত রেখে বলি। স্টেশন-ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা আটাশ।
মেচেদা লোকাল এইমাত্র ছেড়ে গেল। 'আরো উর্ধ্বশির
যদি হতে পারো তবেই দেখাবে ঐ ধরাশায়ী লাশ
যাকে অতিরিক্ত মনে হয়, সে আসলে তোমার সমান—
একটি বন্দুক থেকে আগুয়ান দু-টি নল, তোমরা দু-জন, একই গৃহবাসী,
কিছুটা কৌণিক, তবু একটি ট্রিগার, একটিই কাঠের বাটান,
তুমি ও তোমরা ছায়া একই বন্দুক থেকে ছুটে-আসা শিশুদের হাসি।'

৮০
ধানুকী নেমেছে একা ধানক্ষেতে
তার দুই হাতে তীর
দেখছে পাড়ার যত নরসিংহ মেয়ে
সবে হেসেই অস্থির

দেখছে কেমন ঘোরে আংশিক
ঐ পিছনের ডোল
মৃদঙ্গের সমতুল হামাগুড়ি
স্নেহময়, গোল,

তুমিও দেখছ জানি, প্রিয়তমা,
তার বাঁকা শিখিপাখা
কোমরের লাল ঘুন্সি, রক্তকোষ
লজ্জাস্থান ঢাকা,

ব্যাধ নয়, নয় অবলীল
সে তো ভাঁড় ছদ্মবেশে
নিত্য শিকারি সাজে, নিজের শিকারও,
অবস্থাবিশেষে

আজ ওর ভূমিকা বা খেলা
কেউ জানে না নিশ্চয়
হাততালি স্থির করে রোজ
ঐ পরমুখাপেক্ষীর জয়।

৮১

পেয় জল, কঙ্কনবাদিনী, গভীর বাষ্প থেকে উঠে আসি
আমরাও, ডাক শুনে
আনি তাপ, ঐ গান, ঐ সমারোহ,
চীনার বনের দীক্ষা—
দেখি এক টুকরো পাতা
তার সমস্ত সন্ত্রাস নিয়ে ঝরে পড়ে
অগ্নিমান গাছের ভিতরে,
ঘুরে ঘুরে পড়তেই থাকে,
পাঁচিলের ওপারে কামান, ফাটলের এ-ধারে বন্দুক,
চুল যেন পল্লব, তার দেহস্পর্শ— তারপর মৃত্যুর বিহার, উৎস জল।

৮২

মেঘ করে আসে।
অন্ধকার কচুবন।
পানাপুকুরের ঘাটে এক বৃত্ত ক্ষিপ্ত জল। ডুবেছে পেটিকা,
ডোবে বউ, কোলে শিশু, রান্নার উনোন, কড়াই,
পাখির শূন্য খাঁচা— তা-ও ডোবে—
পাড়ে হাবাগোবা স্বামী।

দিঘি অতঃপর শান্ত হয়, থাবায় থাবায়
আকাশের সামান্য দু-টুকরো নীল
লেহন করছে, তৃপ্ত ক্ষুধা,
বৃষ্টি নামে—
যুবা মেলে ধরে ছাতা।

৮৩

বাউলব্যাগ, আর কতকাল ঝুলবে স্বামিন্ কাঠপেরেকে?
জানলা দিয়ে দেখছি আমি সরল গাছ—
পাতায় পাতায় সুখী লোকের নামগুলি সব লিখিত ছিল,
অপরদিকে অসুখী লোকের,
আজকে এই ঝড়ের দিনে উল্টে যাচ্ছে পাতায় পাতায়,
সুখী এবং অসুখী লোকের সুনামগুলি পড়ছে ঝরে চতুর্দিকে—
বাউলব্যাগ, এসো আমরা পাতা কুড়াই, কারণ প্রিয়
গাছটি চেনে তোমায়-আমায় ছদ্মনামে।

৮৪

দোয়েল আমাকে বলে ঝটিতি এ-সব লেখা ধুয়ে মুছে ফ্যালো।
ছন্নছাড়া পাখি ঐ, আমায় বলেছে কিনা বাঙ্ময়,
শ্লেটে নাকি বাজে কথা লিখি।
আমি চাই সে এসে দেখুক, ক্রমাবনতির অক্ষর পড়ে নিক,
জেনে যাক লোহার বালতি কেন নামছে কুয়োর জলে
যে-গহ্বর জলহীন। কাকে বলা!
ফিরে দেখি পাখি নেই, চাঁদ নেই, তারাও ওঠেনি,
—শুধু রাত্রির তপ্ত বাতাস বইছে।

৮৫

আমি আজ
অনেক ভোরে উঠে পড়েছি—
উঠে দেখি হাতে কোনো কাজ নেই
শুধু ফরাসি বিপ্লবের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখব বলে
কাল যে-খাতাটা কিনেছিলাম
শুধু তার পাতায় পাতায়
রক্তের দাগ লেগে আছে—

পাশের ঘরে
মা কাকে যেন খুব বকাবকি করছে।

৮৬
ঝড় আসে, কাঁপে গাছ, ছায়াসুদ্ধ, শিকড়েও পাল্লার মতন
টান লাগে, তারপর স্তব্ধ হয় সব কিছু—
গুম স্তব্ধতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে মেঘ তার শ্রাবণসমেত
বাক্স ও পুঁটুলি নিয়ে
যাত্রী যেন
স্টেশনে অনন্তকাল,
ট্রেন মাঝরাতে, এখন দুপুর,
খোকা বৃষ্টিপাত, ছাউনির নীচে
ধুলা ও কার্পেট,
গ্রীষ্মের অতীতে শুক্‌নো— বাইরে জলের ধারা—
কেউ নেই।

কবিতাসংগ্রহের শেষ কবিতা

আমি সেই সরোবর, একটিই, রাক্ষসহীন ও জলহীন ও দগ্ধ উদ্ভিদদন্ত
হাঁ-মুখ বিশাল জরিপের জন্মদাতা,
দয়া ও করুণা তারা দুই বোন এই দেশে খেলা করে, স্ফুলিঙ্গে ইস্পাতে
জ্বলে তাদের বিদায়ছায়া পৃথিবীর ঢালু ও-বর্মরেখা বরাবর, প্রতি সন্ধ্যা,
যেন তারা আমাকে চিনেছে, হাত নাড়ে, সাবধানী অথচ আত্মঘাতী দুই বোন,
দয়া ও করুণা।

সুখ-দুঃখের সাথী

ভূমিকা

সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি আমার সঙ্গে চলো।
বাতাস বইছে বেরিয়ে-পড়ার বাতাস, গাছের কাছে বলো
আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুক, পথের কাছে বলো
আমার ফিরতে অনেক রাত্রি হবে—যেন অপেক্ষা না ক'রে
সদর দরজা বন্ধ করে।
তুমি গাইতে পারো গান
কিন্তু সে গান মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। তুমি অনেক রূপকথা
মাথার মধ্যে বয়ে বেড়াও—কাকে বলবে? শুনবে কারা?
শোয়ার আগেই ঘুমে ঢুলছে মানুষ-জন, পশু ও পাখি, চন্দ্র, তারা।
এমনি করেই জীবনভর কত সময় নষ্ট হল।
এবার সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি অন্য কোথাও চলো।

১.
ছিল বটে সেই সব দিন।
বুদ্ধি ছিল প্রতিবন্ধ,
ছিল ফুলহীন পুষ্পগন্ধ—
ঐতিহ্যে নবীন।

আষাঢ় মেঘের আজ ঘটা—
প্রাকৃতিক, স্বভাবকাজল।
বার্তা যেন বৃষ্টির জল,
সূর্যাস্তের ছটা।

এসে তো পড়েছ এই গ্রামে,
মানচিত্রে ধৃত।
ক্ষুধাশান্তি তণ্ডুল, ঘৃত
পেয়েছ বেনামে।

আরো পাবে। বহু কিছু চাই—
ঢেউ আর বায়ুর বিহার,
ত্বক পরিচর্যাকারী ক্ষার,
রাত্রির রাশিচক্র, ছাই।

এই কয় পংক্তি পারে না
ধরে দিতে প্রাপ্যের তালিকা।
নিভে গেল শিখা।
অস্তচাঁদ বনের ঠিকানা।

যদি এলে সফেন অক্ষরে—
দাবি করো জলপথ,
অন্ধকার নৌ-রথ,
—সৈকতে, সমুদ্রের স্বরে।

২.
অল্পই লিখেছে তারা, পরবাসী, বাণিজ্যব্যাপক এই উপকূলে,
সৈকতে, ছাউনি ফেলে, বালুকণা বাতাসে উড়িয়ে, দিক-
নির্দেশ পেয়েছিল তারা, লিখে গেছে, সামান্য দু-একটি শব্দে,
সংকেতে বা জলের ফলকে, কোনো জ্ঞান নয়, কোনো
অধিবিদ্যা নয়, শুধুই ব্যবসাবার্তা, যাও দেশ-দেশান্তর,
এমনই বলেছে, মেপে রাখো জ্যামিতিপ্রবাহে, টানো
বীজগণিতের সুতো, মাথার সমান্তরাল, ক্ষণকাল-মহাকাল
এ-সব স্বার্থের গ্রন্থি, চাও যাত্রাপথ, সমুদ্রে কি নদী-মোহানার
বুকে, পাতো জাল, আঁকো ভূমি-বিভাজক, নাব্যতা
কঠিন, কিন্তু তারো চেয়ে দুরূহ নয় কি প্রকৃতির
কুটিল লিখন—বৈপরীত্যে, যুদ্ধের পূর্বাভাষে, জোয়ারে,
টানের মুখে?

জাগে নিদ্রাহীন, নিরুত্তর শত শত প্রাণবৃক্ষ সৈন্য-প্রসবিনী।

৩.
অঘোর চৈতন্যোদয়। মূলে তার এক কাঁটা জল।
স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠো রাগত মানুষ। আমি তো জেগেছি
বিনা রাগে, বিনা কৌতূহলে।

ও কে ও নূপুরধ্বনি? নাকি পথে পথে কুকুর ডাকছে?

৪.
যে-বীজ ভাসছে শূন্যে আমার কর্তব্য তাকে মিছে কথা বলা
তাকে হেথা টেনে আনা।
যে-প্রতীক সিঁদুব মাখা তাকে লেহনযোগ্য বলে গুজব ছড়ানো
তাকে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
দীর্ঘ ও লম্বিত ফুঁ-য়ে চারিদিকে নাচিয়ে বেড়ানো
চিৎকারে-কোলাহলে তাকে অবিরাম প্রতিযোগিতার
শেষ সাঁতারুর মতো
দিনরাত অনিদ্রিত রাখা

ঐ বীজ জেগেই রয়েছে। জেগে জেগে ঘুমিয়ে বয়েছে।

৫.

আমি দেখছি হোটেলের টিফিন-কৌটো খুলে তুমি আমাদের
ভাত বেড়ে দিচ্ছ। সব্জি গুছিয়ে দিচ্ছ থালার ওধারে। ডাল আছে
অন্য পাত্রে। তা-কি দু-চামচ ভাতের উপরে দেবে? ও কিশোর,
আমি তো সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মাছ আসবে এর পর, হায়, লেবু দিতে
ভুলে গেলে, নুন-লঙ্কা পাতেই রয়েছে, আছে টক কাচের বাসনে,
জল স্টিলের গেলাসে, এসি চলছে, পাখাও ঘুরছে—

আমি চাই এসব কাজের শেষে, দুপুর-দুপুর, তুমি মহিষের পিঠে
চড়ে নদী পার হও, আষাঢ় মেঘের নীচে প্রবাহিত হতে থাক
তোমার বাঁশির শব্দ আর সুদূর বর্ষার গান। পূর্বজন্ম থেকে
এইটুকু স্মৃতি আজ প্রতিদানে তোমাকেই দিতে চাইছি।

৬.

এ-কলঙ্করেখা ধারায় নিবদ্ধ।
অসাড় সমুদ্রবাসী মানুষেরে ভালোবেসে
দ্বীপান্তরী হয়েছিল—

চেয়েছিলে বাণিজ্যে জীবন
আর লক্ষ্মীর বসতি।
বনরাজি নীল
বেলাঞ্চলে রৌদ্রের আভা ছিল—
ছিল নীল লবণাম্বুরাশি
ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস।

তুমি তো গিয়েছ, সখা, জল কেটে, নৌবহরে, হে মীনকেতন।
স্বপ্ন-দেখা মানুষ যেভাবে যায়, কালান্তরে—
আমিও চলেছি, ঐ মতো, মরুযাত্রী, পশ্চিমের দিকে, ভূ-গোলকে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পদাঘাত। বুঝি-বা বিশ্রাম।
অন্ধত্ব ও অপেক্ষার গান গাই। বালকেরা শোনে।
তারাই প্রবহশক্তি। হঠকারী সাবধানতা। করুণ যৌবন।

৭.

এখনো জাগিনি যেন ঘুম থেকে—এখনো চাটছি ঘুমের মাংসখণ্ড,
বুঝি এ-শ্বাপদ চিরদিন ক্ষুধার্তই রয়ে যাবে সামান্য নিদ্রার জন্য।
দু-থাবায় জড়িয়ে ধরবে শক্ত নিদ্রাহাড়—দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে
ঝিমোবে অনন্তকাল—কখনো কখনো জেগে উঠবে কবিতা লেখায়
—স্বপ্নাকুল নিদ্রাহীনতায়।

৮.

কবিতায়, আগ্রহাতিশয্যে, আমি আরো অনেকের মতো
দু-চারটে ভুল-টুল করে ফেলি। ছন্দের ব্যাপারে তত
অবহিত নন উনি—কোনো মাস্টার বলেছিল।
শিক্ষার অভাব আছে—এমনও শুনেছি। সব কিছু
ঔদাসীন্যে মেনে নিই। কারণ, সকালে, বাজারের পথে,
সব্জির দোকানে, আড়চোখে লেটুস পাতাটি
দেখেছি এবং ভেবেছি যদি ওর মতো লজ্জায়
কুঁকড়ে যেতে পারতাম—জলের অভাবে যদি শুকাতাম—
খুঁড়ে নেবার কিছুক্ষণ বাদে যদি বেঁকে যেতাম, ছিঁড়ে
পড়লাম স্তব্ধতায়, হলুদ-সবুজ স্যালাডের প্লেটে।

৯.

কতই না অভিমান বাক্সে লুকানো থাকে, বাঁধা থাকে বিছানায়।
চেকিং-য়ে পড়েনি ধরা, বৈদ্যুতিন কৌশল এড়িয়ে এসেছে,
বিমানবন্দর তারা অকাতরে পার হয়, এমনকি দেহরক্ষীদের
বন্ধনী ছাড়িয়ে বহু হতবাক প্রেসিডেন্ট—মুখ্যমন্ত্রী—নগরপালের
সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, হেঁকে বলে—এই তোরা ভেবেছিসটা কি?

সৈন্যরা বৃথাই বন্দুক ছোঁড়ে, কৃপাণ নিজেরা লড়াই করে, ক্রোধ অদৃশ্যই থেকে যায়।

১০.

কেবল তুমিই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হও। ছোটোখাটো ভাঙচুর তোমাকে নিয়েই।
তুমি ট্রাম থেকে পড়ে যাও। দরজায় মাথা ঠোকে। ব্লেডে আঙুল কেটেছে।
ওই ছেঁড়া শাড়িটার নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কোনো এক গল্প রয়েছে
যা বিশ্বাসহীনতাকে অসুন্দর করে তোলে—
স্কুলব্যাগে এত কালি কে ঢেলেছে?

লেখা? কতদিন চুপ করে আছি।
এইবার বেরিয়ে পড়ব। জেনে রাখো। তুমি জেনে রাখো—
সব দুর্ঘটনা সঙ্গে নিয়ে। এই থলিটায় বহু কিছু ধরে।

১১.
কিছুটা রহস্য থাকে; কিছু অব্যয় আর দু-একটা প্রশ্নের চিহ্ন,
ছিটে-ফোঁটা ভাঙা শব্দ যা-দিয়ে সহজে সমাস বানানো যায়,
আর একমুঠো ক্রিয়াপদ; সিঁধ কাটা হয়েছিল—সেই দাগ;
ফাঁক ও ফোকর, আকাশ দেখার জন্য, বটগাছ
জন্মিয়ে ওঠার জন্য হাঘরে ফাটল—
আমার কবিতা হয় ঐ মতো। ও-রকম বাবু সেজে থাকে।

১২.
খুলে দেখি ফেঁসে গেছে, ফেটে গেছে কাঁধের কিছুটা,
এই জামা পরে আর বেরনো যাবে না, একে ফেলে দিতে হবে,
ভাঙা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়েই রাখছি তাহলে, বারান্দার এক কোণে।
পুরনো জুতোর সঙ্গে—ডাঁই অব্যবহৃত হাঁড়ি-ডেকচির মধ্যে
মঞ্জরি বেড়ালটির ফেলে-যাওয়া আশ্রয় খুঁজে পাই,
ঝুড়িব মধ্যে থাকত, কখন আসত-যেত কেউই জানে না,
ভূমিকম্পের এক আতঙ্কিত রাতে সেই সে বেরিয়ে গেল—এখনো ফেরেনি।

তার জলের বাটিতে কাঁপছে কালপুরুষের ছায়া, বাঁকা ভাবে, ঈষৎ খর্বিত।

১৩.
খাই প্রচণ্ড খিদের মুখে, শীতসকালের রোদ চা ভিজিয়ে।
খাই কুয়াশা-মাখানো মুড়ি, ধোঁয়াগন্ধ গাছপালা, স্মৃতি নাম্নী ফেনাভাত,
এমনকি মাংসের দোকানে বেঁধে-রাখা ছাগলগুলিও খেতে ইচ্ছে হয়—
কিন্তু বাহানা করি—হয়ত খাবো না—খাওয়া কি উচিত হবে—
হায় কুম্ভকর্ণ জেগে উঠছে এই মাত্র—তারও খাদ্যাধিকার নিয়ে ইতস্তত আছে।

১৪.

গিয়েছিলাম মনে মনে
মথুরাভ্রমণে
যেন-বা উড্ডীন পাখি
নিজেকেই ভেবে রাখি—
অথচ আসীন
আমি কৃষ্ণের অন্তর্গত, যেন জলাশয়ে মীন,
অক্ষরে নিযদ্ধ কবি,
যেন শৃঙ্খলিত চিত্রী ও ছবি
দুই দূরান্বয়ী গ্রহ—
তবু এক স্থিতি, অস্থিরতাসহ।

আনন্দবায়ু, তুমি আমার সারথি।
ফুলে ঢেকে রাখো পথ—আমি আজ সে-পথের পথী।
উড্ডীনে ভরে আছে আমার আলয়।
ঝড়বৃষ্টি হয়
সূর্য ওঠে এই ঘরে, রাত্রি নামে।
তর্কে ও বিশ্রামে
এই যেন বুদ্ধি পাই
প্রকৃতির অন্তর্গত আমরা সবাই—
রোদ্দুরে পুড়েছি কত—বর্ষায় ভেসে গেছে গেহ,
তবু যায় না সন্দেহ
আলৌকিক দেহযন্ত্র কেন ভ্রমে কাজ করে,
কেন মিথ্যা আমার সাক্ষরে?

১৫.

গাছে উঠে বসে থাকি। ফল খাই। ব্যক্তিমানুষের দিকে
আঁটি ছুঁড়ে মারি। নীচে হাহাকার পড়ে যায়। বেশ লাগে।
মাঝে মাঝে বাউল সংগীত গাই। ওরা শোনে। বাদ্যযন্ত্র
নিয়ে আসে। তাল দেয়। বোধহয় ছবিও তুলেছে। সেদিন
এক গবেষক বাণী চাইল। ভাবলাম বলি : আমার জীবনই
আমার বাণী। কিন্তু সম্ভবত এটি বলা হয়ে গেছে। অতএব
নিজস্ব ভঙ্গিতে, কিছুটা আপন মনে বিড় বিড় করি—
'দেখেছি পাহাড়। দেখে জটিল হয়েছি।'

১৬.

চলো নামি দুর্গের বাগানে। খেলা করি। সূর্য
বসে পাটে। বিকেলের ভ্রমণকারীরা অস্তলীন।
ঐখানে অবিনাশী পাথর রয়েছে। মূর্তি আছে
যোদ্ধাদের এবং অনেক ঝুলন্ত টায়ার-দোলনা—
ফিরে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়া শহরের দিক থেকে।
আরো নীচে বধ্যভূমি, ফাঁসিকাঠ, লোহার কয়েদ।
শুনি আর্তনাদ—হাহাকার—পাখির উল্লাস। ঐখানে আজ
আমাদের খেলা ও খেলার গান। আমাদের খেলার লড়াই।

১৭.

ঘুমাই, নিত্যবিরোধ ব'লে. খাজনা দেব না ব'লে, অনুতাপে
জেগে উঠি, ভয় পেতে থাকি, দিন বাড়ে, আকাশ প্রখর হয়,
ছাতা নিয়ে অটো-স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই, দূর দেশে যাওয়া
যেতে পারে, পালিয়েই যাবো, রংপুরে, গ্রামেব দিকে,
ছোটো পিসিমার জমির একটা ঘর খালি পড়ে আছে,
কুযো আছে, আমের বাগান আছে, কুকুরের ছানাগুলো
এত দিনে নিশ্চয়ই অনেকটা সভ্য হয়েছে, শেষ কবে
চিঠি এল ঐ গ্রাম থেকে, সে তো পার্টিশনের আগে, এতদিন
ঘুমিয়ে কাটলো বুঝি, হাসি পায়, আয় তোরা সরকারি
দাবি-দাওয়া নিয়ে, আমি ততক্ষণে, সীমান্ত পেরিয়ে,
বনগাঁ ছাড়িয়ে, দৌড়ে চলেছি।

১৮.

চলো মর্মরসাথী, চলো ভ্রমণে, কান্তারে,
চলো বিদেশীর বেশে কেউ যেন কাউকে না চিনি—

ফলিত জ্যোতিষরূপী, তুমি গানের দেবতা, তুমি জানো
আমার লেখার খাতা অজ্ঞান অনিশ্চয়তায় ভরে গেছে,
এসো নতুন প্রজন্ম হয়ে, এই ভুলভ্রান্তিময়
লেখাগুলি পাঠ করো, অর্থ করো, পর্বতবাসীদের মতো
বিশাল প্রান্তর প্রথম দেখায় অভিভূত হও।

এ-অববাহিকা, বস্তুত জমির ঢাল, ধীরে ধীরে নদীতে নেমেছে।

১৯.

অনন্ত বৃষ্টির মধ্যে জেগে উঠলে। তাহলে কি কাল এই প্রান্তরেই ঘুমিয়ে থেকেছ? সর্বাঙ্গ ভিজেছে জলে। স্রোত বইছে শরীর ভাসিয়ে দিয়ে। মাথার চুলের মধ্যে বর্ষা নেমেছে—বুঝি প্রফুল্ল কদম্ববন, হাঁটু বেঁকে গেছে—যেন টানা দিগন্তের ঢাল, আপাতত মেঘাবৃত। গ্রীষ্মের ফোড়াগুলো ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, জলের ধারায় মিশে বয়ে যাচ্ছে কাঁকর, মাটির স্রোতে। দূর থেকে যে-কেউ দেখলে বলবে ঐ সেই টম সাহেবের টিলা, জংশন স্টেশন আর আমুদীর চায়ের দোকান—হেন ভুল বোঝা শরীর নিয়েই তুমি, আবার বৃষ্টির মধ্যে, স্বস্তিতে ঘুমিয়ে পড়ো।

২০.

তার আশা ছিল বহুদিন
একদা কর্তব্যহীন
    হাতে পাবে কিছুটা সময়—
অগ্রাহ্য বইবে দাবি
যত সব অবশ্যম্ভাবী
    হতে থাকবে শুধু অনিশ্চয়,

চেয়েছে স্বদেশ হোক
অফুরান বিশ্বলোক
    ফুলে-ভরা ফুলে-ভাঙা ডালে—
সহ্য কি করবে অন্যে
ঘরে-ফেরা ঐ জন্যে
    ঝর্নায়, অবসরকালে?

সংশয়ে এগিয়ে থাকি
জঙ্গলের জলচাকি
    বহুদিন অব্যবহৃত—
জন্মেছে গুল্মলতা,
কিছু কথা, নাশকতা,
    শবদেহ হেথায় প্রোথিত—

যদি দিতে শান্তি, ক্ষুদ্র নীড়,
রণ-আর্তনাদে স্থির
কালরাত্রি, শাশ্বত উপমা—
হিংসাময় রক্তপাত
অঙ্গহীন এর হাত
কী ভাবে বা নিতে পারতো ক্ষমা?

২১.
দেখে এলাম সবুজ, সুন্দর রথ।

জ্বর চৈতন্যে ছড়ায়। বুঝে এলাম বাজারের
বীণাপাণি ভাণ্ডারের বাৎসরিক লাভক্ষতি—
কর্মচারীদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কথা হল,
আকাশে তখন বর্ষার জোড়া মেঘ—
জলবাহী, কৃপাকণাবাহী।

আমি শুধুই পথের কথা বলতে এসেছি, অন্য কিছু নয়—
আদিত্যবর্ণ পুরুষটি জানিয়েছিলেন।
তাঁর ছাতার নীচে আমি আশ্রয় নিয়েছি।
ঐ বৃষ্টিভেজা অপরাহ্ণে আমরা একসঙ্গে রাস্তা পার হলাম।
উনি রথে উঠে গেলেন—
আর আমি তিনটে তিরিশের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরলাম।

২২.
তুমি সেই গুহাচিত্র, তুমি সে-ধানুকী, ধৃত মহিষের প্রতি
ধাবমান ক্ষুধার্ত মানুষ, কাঠিসার, বল্লমবাহক আরো অনেকের সঙ্গে।
তোমরা তো সমুদ্র দ্যাখোনি, চলো পুজোয় দীঘায়
যাই, আমরা সকলে, নতুন বিজ্ঞান শিখি—নৌকা
বানানোর আর মাছ শিকারের আর জাল বুননের।

২৩.
দুঃখের দিনে তুমি আমারই লেখার কাছে ফিরে এসো।
দূর থেকে শোনা যাবে মেহবুবা ব্যাণ্ড বাজছে—কুকুর ও ঘোড়া
খেলা, দেখানোর জন্য প্রায় তৈরি,

ভিনদেশি মহিলারা জালের আড়ালে গেটমানি গুনে দেখছে—

আমার কবিতাগুলি সারিবদ্ধ—কেউ কেউ কাঠগুঁড়ো মেখে থাকে,
বিপন্ন মানুষ দেখলে লাইনের বাইরে এসে ডিগবাজি খায়—
ঐ হাভাতে ক্লাউন আর তার পরিবার, ছেলে-মেয়ে, কোলের খোকাটা,

দুঃখের দিনেও জেনো সবাইকে না-হাসিয়ে তারা ছাড়বে না।

২৪.
পোকামাকড়ের কাছে নীরবতা শিখি। যেভাবে গাইছি আজ
'হায় হায়' তার সুর ও-অঞ্চলেই শেখা। বহু কিছু জানার পরেও
মাঠের প্রান্ত দিয়ে যে-লোকটি হেঁটে গেল কেন বা সে
ছাতা খুলে এগিয়ে চলেছে—আমি তো বুঝি না। অথচ
কই বাইরে তো বৃষ্টি নেই। রোদ নেই। উনি কি পাগল?
ভাবনার এই কূট, মানুষ হিসেবে আমার নিজের।

•

২৫.
প্রথমেই জ্বলে ওঠে রোম, যেন
তাকে আগে
যেতে দিতে হবে—
তারপর মেদ, ঐ গলন বিস্ফার,
শরীরের মধ্যে থেকে গান ওঠে : পতিতকে উদ্ধার করো।
ডোমশিক দেহে নাড়াচাড়া দেয়, গ্রন্থি ফাটে,
শ্লেষ্মা ও ঝিল্লিকোষ পশুজোনাকির মতো উড়ে যেতে চায়,
মনে পড়ে কাল রাত্রে কী কী খেয়েছিল,
আহার বাষ্প হয়, যেন-বা উদর চিরে সরে যাচ্ছে মেঘ,
ঐ কি লসিকানালী, মাটী নিজেই হাসছে,
অংসফলকের নীচে হৃৎপিণ্ড, পঞ্জরাস্থি এতকাল যত্নে রেখেছে যাকে
সেই হৃদয় নামক এক স্বপ্নের চারিদিকে ধু ধু অগ্নি, বায়ুচাপ,
—সে-হৃদয়ও, সকলের আগে, অভিমানে
পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চায়।

২৬.

ফল—বৈচিত্র্যের মতো,
দূরাগত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো,
সামরিক অস্ত্রের মতো,
টেবিলে রয়েছে।

কেউ রেখে গেছে
তোমাদের না-জানিয়ে।
হয়ত বা গাছ হেঁটে এসেছিল
এই ঘরে—কোনো ভাসমান পশু—
কোনো খসে-পড়া তারা।

বহু সংবাদ ঐ ফলগুলি নিতে চাইছে।
নাস্তিকের সঙ্গে আজ বিশ্বাসীর বোঝাপড়া হয়ে যাক।
উকিলের মুখোমুখি ওদের ক-জন।
একদিন বাড়ি ভাঙা হবে, জমি কাটাকাটি হবে,
অস্থাবর সম্পত্তিও নিলামে উঠবে—
আজ তৈরি হও।

তুমি জাগতিক,
নিয়মাবলির কাছে।
তুমি সেরে উঠবে একদিন—
সেই বার্তা নিয়ে ফলগুলি টেবিলে অপেক্ষমাণ
—যেন ভোরের সংবাদপত্র, আধখোলা চিঠি আর
বিমানযাত্রার টিকিট এসেছে।

২৭.

ফিরে এসেছে গান তার ভুলভ্রান্তি নিয়ে।
হেথায় কোনো ঠাঁই হবে না—স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম।
কোথায় তোমার মৌলিকত্ব? উত্তরে সে দেখিয়েছিল—
আকাশে মেঘ, মেঘের নীচে রৌদ্রজ্বলা সারস।

ফিরে এসেছি আমি আমার বিষয়বুদ্ধি নিয়ে।
সমস্ত ঠিক। দেখার মতো হিসেব। পাইপয়সা নিখুঁত।

দু-তিন পাতা সঙ্গে আছে। তোমরা যদি চাও। কিন্তু শুনি
লোকের অন্য রকম দাবিও থাকে। যেমন ধরো, গান।

তবে কি ঐ বুদ্ধিহীন পাগল গানটাকেই
সঙ্গে আনা উচিত ছিল। এখন কোথায় তাকে পাবো?
এই তো পথের উল্টো দিকে সারাটা দিন সে বসেই ছিল,
কোলে কুকুর-ছানা জড়িয়ে ধরে। রাতে অন্য কোথাও উঠে গেছে।

২৮.
বাড়ি ফিরে দেখি, বারান্দায়, টবের গাছে, ছোটো এক
শাদাফুল ফুটে আছে। এ-ও কী সম্ভব। আমার অবিশ্বাসী
দুই চোখ জলে ভরে যায়। আমি চুপ করে ওখানেই
দাঁড়িয়ে থকি। বহু ক্ষণ। যেন কত কাল। এই প্রসূতি
এবং তার শিশুটিকে নিয়ে কী করব ভেবেই পাই না।
প্রতিবেশীদের খবর দেব না তো বটে। কাগজের লোকদেরও
ডাকব। কিন্তু আমাকে যে অবিলম্বে এদের জন্য রৌদ্রের
ব্যবস্থা করতে হবে। চাই বাতাস এবং জল সুশীতল। এবং
কিছুটা খাদ্য। সে কোথায় পাবো। আপাতত অস্ফুটে বলি
আমি একটু ঘুরে আসছি। তার আগে তোমাদের এক সীমাহীন
ভালোবাসার কথা জানিয়ে যাই যা মানুষকে কাঁদায়,
নয়ত কবিতা লেখায়, নয়ত বাজারে পাঠায়।

২৯.
ফিল্মি দুপুর। বড়ই আরামপ্রিয় এই চোখ।
পুরনো নায়িকা খোঁজে। সে তো বহুকাল মৃত।
গভীর উপত্যকা। উঁচু থেকে দেখা এক রুপালি স্রোতের প্রায়
তার দেহ জ্বলন্ত খাঁচায় গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

৩০.
বেশ শীত-শীত করছে, রঘুনাথপুর থেকে
ঝালদা যাওয়ার দিন বাসস্ট্যান্ডে পথের দেবতাকে
দেখি যাত্রীদের গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন আর কুশল
জিজ্ঞেস করছেন প্রত্যেককে—কী খবর, সব ভালো তো;
এক মহিলাকে (শিশুসমেত) বললেন—হ্যাঁ, প্রথম দুটো সীট

আপনাদের; কয়েকজন স্কুলের ছাত্রকে বললেন—বারো থেকে
বাইশ তোদের, সামনের সিরিজে ইন্ডিয়া ভালো খেলবেই,
বৃষ্টি হবে না, বাজি রইল; এক বৃদ্ধাকে হাত ধরে
তুলে দিলেন ঐ এক্সপ্রেস বাসে, ড্রাইভারের সঙ্গে
হ্যাণ্ডশেক করলেন আর কী নিয়ে যেন (উভয়ের মধ্যে)
একটু হাসাহাসি হল; জনৈক মাঝবয়েসী লোককে বললেন—
তাড়া নেই, সিগারেটটা শেষ করে উঠুন; আমাকে দেখে
বললেন—ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, গায়ে জড়ানোর মতো
চাদর ব্যাগে আছে নিশ্চয়ই; আশ্চর্য, এটাও তো ওঁর
জানবার কথা নয়; বাস (ঠিক সাড়ে আটটায়)
ছাড়ল, রোদ উঠছে, উনি নেমে গিয়ে আমাদের
বিদায় জানালেন; শুনলাম সামনের সীটের
ঐ ভদ্রমহিলা শিশুটিকে বলছেন—ওঁকে বাই বাই করো,
ওঁকে বাই বাই করে দাও।

৩১.
ভুলে গেছি কোন্ গান—কোন্ সুরে গেয়েছিলে।

আজ বিস্মৃতিই প্রিয় পরিচারিকার মতো ঘরদোর সাফ রাখে,
আলনায় গুছিয়ে রাখে পরিধান। সামান্য সাহায্যে তার
চারিদিক সূর্যাস্তে যেন ভরে ওঠে—ফুলটবে এতগুলি ফুল।

ভেবে দেখি পরাবিদ্যা। জড়বাদী হে বস্তুপৃথিবী,
উড়ন্ত পাখির ডানা যেই মতো গাছের পল্লব ছুঁয়ে যায়—
বহুতল পাহাড় যে-ভাবে অন্য শৃঙ্গের হয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে—
সেই মতো তুমি স্বস্তি আনো, আকিঞ্চন সন্ধ্যার আঁধারে

ঢেকে দাও অধীত জ্ঞানের জামা, কূট বস্ত্র, মেধার পাদুকা।
অতিরিক্ত ধনমান কী রইল? কী-বা তুমি দিয়ে গেলে? কোন্ পরম্পরা
তুমি রেখে গেলে সংসারে? শুধুই কি বিস্মরণ? দাসীবৃত্তি শুধু?
রেখে গেলে এই সব ভাঙা কবি—আরো ভাঙা ওনাদের পাঠক-পাঠিকা?

৩২.

ভোরবেলা পার্কে বেড়াতে গিয়ে কী দেখব কে জানে—এই ভয়ে
রাত থেকে কাঁপি, ভুল পায়ে জুতো পরি, ছাতা নিতে
মনেই থাকে না, হায়, সেই দুর্ঘটনার গাড়ি থানার
সামনে তেম্নিই পড়ে আছে, মরচে ধরছে, চাকায় বাতাস নেই,
গাছ থেকে ঝুলন্ত দড়িটা ওখানে কী ভাবে এল, ফাঁস নাকি,
লক-আপের জানলা থেকে দুটো পাখি উড়ে আসে,
ভাঙাচোরা এঞ্জিনে ওদের বাসা, আপাতত ডিমহীন, নীড়ে
শাবক আসেনি, আজ ঝড়ের আঁধার মেঘে দিন শুরু,
—এলোমেলো বৃষ্টি নামছে।

৩৩.

ভেবেছিলাম মুখে নিতে হবে। দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে হবে—
মানবজন্ম নামে আবর্জনাপূর্ণ এই পলিথিন ব্যাগখানি,
ভ্রূণের মতোই তাকে ময়লার গাদা থেকে টেনে আনতে হবে
আরো বহু কুকুর-বেড়াল পার হয়ে, বহু চিল-শকুনের চোখের আড়ালে,

মহিমা, আত্মস্থ কুণ্ড, নুনজল নিজেই ফুটছে,
শোধনযোগ্য, যদি আজ আমাকেও রান্না করো।

৩৪.

মেঝের ভিতর থেকে জেগে ওঠে চিন্তালতা—জলহীন, মেঘরৌদ্রহীন।
কোনো ঘুম গাঢ় ঘুম নয়।

এই ভাত আবার গরম করো· উনোনে বসাও।

চাই সব কিছু লিখে ফেলি, টুকরো কাগজে, খামের উলটো দিকে—

যেমন বিশাল গাছ, কেটে-ফেলার বহু আগে,
ছায়ায় ছায়ায় তার অভিশাপ লিখে যায়।

দেহ, বিগলিত যমুনা। কোন দূরদেশে বইছ তুমি হে সেই নদী?
সূর্য উঁকি দিচ্ছে শিয়ালদা মেনের সামনে।

৩৫.

যারা পথে বেরিয়ে পড়েছে তাদেরকে জনে জনে
প্রশ্ন করি—তোমরা আমার ছোটো ভাইটিকে
দেখেছ কি। আমার কুকুর-ছানাটাই বা গেল কোন
দিকে, বলো দেখি। আরো নানাবিধ প্রশ্ন করাতেই
আমার দক্ষতা ও কৌশল। যেমন, জানতে চাই—
আজ কোন্ বার, কোন্ সাল, বাংলা না ইংরেজি,
পুজোর কতটা দেরি। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় প্রশ্ন করি—
কাল উপোস দিয়েছ। ক্ষতবহ ভিখিরিদের প্রশ্ন করি—
বোরোলীন লাগাচ্ছ তো। গতকাল এক মাস্টারকে
ধরে ফেলি, বলি—ফল কেন মাটিতে পড়ে হে,
আকাশে ওড়ে না কেন। এর উত্তর সবাই জানে—
আমি ছাড়া। চিড়িয়াখানায় আমি পশুদের প্রশ্ন করি,
ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়াদের। কুচকাওয়াজের আগে
সৈন্যদের কাছে আমি বহু তথ্য জেনে নিতে যাই।
কিন্তু হায়, বিধানসভার গেটে আমাকেও বোবা হয়ে
যেতে হল। এত মিথ্যেবাদীদের, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে,
আমি একসঙ্গে কখনো দেখিনি। ওদেরকে কোনো কিছু
প্রশ্ন করা অর্থহীন। লোকে আমাকেই পাগল বলবে।

৩৬.

যাবো, তাই বাক্সবিছানা বাঁধি, নইলে ওসব এমনিই
পড়ে থাকে, সৃষ্টিছাড়া—‘দেশত্যাগ কাকে বলে
জানো নাকি?’—আমাকে শুধায়। আমিও তেমনিই বাপের ব্যাটা
তাল ঠুকে আগুয়ান, ‘জানি মানে? তোমাদের
শিখিয়েও দিতে পারি। অধিকন্তু...’ তারা চুপ মেরে যায়।
বাক্স সহজেই ভরে ওঠে। বিছানাও ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে পড়েছে!

৩৭.

শীত এসেছিল। শীত চলে গেছে।
একটি অতীত। আরেকটি সে যথার্থ সুদূর।
দু-দেশেই লেপতোষকের গল্প। তাই ভাবি। রোদে বসে।
তাপ বেশি হলে দেয়ালের কোণে সরে যাই।
ছোটোরাও ঘোরে-ফেরে। সঙ্গে থাকে।
দুই অতীতচারিতার মাঝে আছে এক হানাবাড়ি।

সেইখানে আমগাছ। রাতারাতি মুকুল ধরেছে।

৩৮.

রাখী বিষয়বস্তুর আগে হেঁটে চলে—
        বসে পড়ে পথেরই উপরে।
বলে 'এই আমি বসলাম, কাউকেই এগোতে দেব না
এ-আমার সত্যাগ্রহ, এ-আমার মৃত্যু-বিরোধিতা।'
অঙ্গন পর্বত হয়, চার কাহারের ডুলি থেমে যায় অকস্মাৎ।
আরোহী ফৈয়াজ খান নেমে এসে গান ধরে
                'বাবুল, আমার নৌকা যে ছুটে গেল
        অবরোধ তুলে নাও, অন্তত আমাকে এগোতে দাও।'

৩৯

শুয়ে থাকি, শুয়েই কাটিয়ে দিই সারাদিন, আহারনিদ্রা ভুলে শুয়ে-থাকা
এই যেন জাগতিক কাজ, দিব্যোন্মাদনা, চারদিকে বহু কিছু ঘটে যায়,
পাতা ঝরে, ডালপালা বাতাসে উড়তে থাকে, তারা হায় অল্পেই বিপর্যস্ত,
ফুলের অট্টহাসি ঐ ছেলেমানুষিকে ঘিরে, মাথার অদূরে চাষজমি, লাঙলের
ফালে পাথর উঠেছে, গায়ে তার এটা-সেটা লেখা, কিছু সাল-তারিখের
জটিলতা, যেন ছিল শুভ ইচ্ছার শাসন একদিন পাথরের সংসারে, ও-সব
এখন আর বুঝে উঠতে পারবো বলে মনে তো হয় না, লেখাপড়া ভুলে গেলে
কার ক্ষতি, অক্ষর মাড়িয়ে-ফেরা অনেক তো হল, আজ শুধু ঘাসে শুয়ে থাকি,
খড়কুটো ডালপালা নাতি-নাতনির মতো পাশে শুয়ে থাকে।

শরীর চিহ্ন

জড়ুল

একদিন কে যেন আমায়
    ধাতুবিভ্রমের দিকে ঠেলে দিল—
আকাশে দৈববাণীর মতো বেজে ওঠে;
                                        মর, তুই মর,
                    আমি কাচকে কেশর বলে ভুল করি
দেখেছিলাম জীবাশ্মের অন্ধকারে আগুনের শিখা—
    যাই : বলে উত্তর দিয়েছি
এসো : বলেছিল বেতসের পাতাগুলি, ক্বাথ-অষুধের বাটি, খল-নোড়া।

আঁচিল

সৌন্দর্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—চলে গেছে ঢোলওয়ালির দল—
যারা গান গেয়ে থাকে, নাচ করে, তারা বিদায় নিয়েছে,
ফুল দিয়ে সুসজ্জিত এই রথে একা বসে আছি,
ওরা ঘোড়াটাকে নিয়ে গেছে—আমার নিজের ডানা দুটো খুলে নিয়ে গেছে—
এ-ও জানি দূরে ঐ টিলায়, উৎসবে, পশু নাচছে, পাখি উড়ছে,
বিকলাঙ্গদের ঘিরে নৃত্যপরবশ পুরুষরমণী নাচছে,
সৌন্দর্য আকাশে উঠেছে খুব, পূর্ণিমার আলো ঢেলে চারিদিক গালিয়ে দিয়েছে।

যব

কবিতায়, মেঘের ভিতরে, আমি পেতে ধরি করপুট, জল পড়ে, জলে
হাড় অব্দি ভিজে যায়, পান করি, আরো চাই, খাও খাও; এমন শুনেছি—
এর নাম জলসত্র, অথবা কবিতা, অথবা আতুর
মানুষের পিত্ত-কফ-নিবারণ—আমার কিছুই নয়—আমি অনেক দূরের যাত্রী,
সহজাত তেষ্টা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পথে,
        এই তৃষ্ণা, এই হারামজাদী, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না।

তিল

ঐ যে ছেলেটা দেখছ, স্থিরচিত্রে, একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে, থমকে
রয়েছে, আরো বহু মানুষজনের সঙ্গে, কিছুটা ত্যারচাভাবে,
অন্য কিছু দেখছে হয়ত, হাসছে, নাকি কিছু চিবিয়ে খাচ্ছিল,
হাতে তো ঠোঙাই দেখছি, মুঠো ভর্তি কাঁচা সূর্য, চাঁদ লঙ্কা,
নক্ষত্রের মশলা-মাখানো ঝালমুড়ি, খাচ্ছে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষুধায়
নয়, অন্য কিছু ভাবছে যেন সে—ঐ আমি, আমিত্ববিহীন,ফটো-
সাংবাদিকের ক্যামেরায় ধরে-রাখা মহাজাগতিক এক সৌরচিত্র,
তখন সকাল এগারোটা হবে বুঝি, শীত শেষ হয়ে আসছে,
বসন্ত এসেছে—বহু, বহুদিন আগে, এই বাংলায়, হাওড়ায়,
রেলের ইয়ার্ডে, জোড়া লাইন হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছে আরো
অনেকের সঙ্গে, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন, এই ফাঁকে
ওরা অন্যদিকে চলে যাবে মনে হচ্ছে।

ত্রিবলী

ফিরে এসো বাতাবিলেবুর স্বার্থে—বিকেলের রোদপোড়া বনে—
দেখে যাও প্রতিটি ফলের ত্বকের বাইরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি,
দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, রসায়নে, ভূতবিজ্ঞানের সুরে--
'তুমি অম্লকূট, তুমি আরেকটু অপেক্ষা করো, দ্রব আরেকটু ঝরুক,
তুমি বীজ, শর্করা তোমায় কেন্দ্রে টেনে নিক,
সবচেয়ে নিরাপদে তুমি থাকো, কেননা তোমার ভিতরে সহস্র গাছ নুয়ে আছে,
আছে বহু ফল, বহু বীজাতীত প্রশ্ন ও সামিয়ানা,
বাতাসে উড্ডীন ফলের উৎসব আর আমাদের কৃষিগান।'

ক্ষত

এখনো রয়েছে দাগ, সেই কবে ছুরিসুদ্ধ হাত
চেপে ধরেছিলাম, খুনোখুনি হয়ে যেত, কিন্তু তা হয়নি
বোঝাই যাচ্ছে, ইদানীং পথে দেখা হয়, দু-জনেই হাসি
অভিবাদনের মতো, শীতের শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে
যাই যে-যার দোকানে, শুধু কনুই-এর কাছে
একটু দাগ রয়ে গেছে, রক্ত পড়েছিল, সেলাই লেগেছে—

স্মৃতি ও বিস্মৃতিপ্রান্তে ঐ চিহ্ন আঁধারেই জ্বল জ্বল করে।

টিকা

স্নেহে উচাটন হয়ে থাকি। বুঝি ভোর হয়ে এল। শেষরাতে
এখনি বিমান মাটিতে নামবে। কত দেশ পার হয়ে উড়ে আসছ—
কত পাহাড়, সাগর—কত মানুষজনের ঘুমন্ত দেহের উপর দিয়ে
ভেসে এলে—তারা কিছুই জানল না—শুনেছি আমরা
মৃত্যুর পর নাকি ও-ভাবেই উড়ে যাই—সকলের অগোচরে,
অপ্রত্যক্ষে—সবাইকে একভাবে ভালোবেসে অথবা না বেসে,

সে-উড়ানে ভোর নেই, রাত্রি নেই। এইখানে সবকিছু অপেক্ষায় আছে।

কঙ্কাবতীর নাচ



প্রচ্ছদ : শুচিস্মিতা ঘটক

ভূমিকা

উড়িয়ে আনো ওদের, ওরা গুচ্ছবেলুন হাতে
দাঁড়িয়ে আছে নিদ্রাটিলায়। ঘুম না-আসা রাতে

লতা নিশ্চয়তা ত্যাগ করেছে, ঝুলে পড়েছে ঝড়ে,
ফুলের মতো জটিল-জটা অক্ষরের 'পরে—

এ কোন্ দেশি ভাষা, যে সে দুলছে দোলনায়,
আমায় বলছে পাশে বোসো। অনেক জায়গায়

সীসে দাঁতের হেন ক্ষয়সাজসে ফাটা এবং খালি,
অর্ধেক তার দাগ পড়ে না—বাকি অংশে কালি

ছিটিয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে। ওরাই কেবল পারে
পড়তে এবং সুর বসাতে। নিরক্ষরতারে

বশ্য করে, মামুলি করে, নাচতে-গাইতে শেখায়—
উড়িয়ে আনো ওদের আমার ভাবগম্ভীর লেখায়।

১
একাধিকবার এই সৈকতে এসে
বলেছি আমার মতো পুরুষকে তো কিছু
কলঙ্কের ভাগ তুমি দিতে পারো। হয়নি,
শোননি কেউ, শুধু বালিয়াড়ি ধসে
পড়েছে সাগরজলে।

স্তব্ধতা থেকে কোলাহলে
আবার যাত্রা শুরু, পাপ থেকে
পাপের স্খালনে। ঝাউবনে উড্ডীন
পতাকাবিদ্রোহ থেকে রঞ্জনরশ্মির অনলে—
চলেছি সকলে।

এই মদ কীভাবে করব পান—
বলে দাও। দাঁড়িয়ে জলের ধারে?
ছিঁড়ে-আনা এই ফুলগুলি
ঘুমন্ত খ্রিষ্টগাছে ফুটেছিল—
কীভাবে ভাসবে তারা মাতৃসমা জলে?

২
যে তমসা নদীর তীরে আমি আজ বসে আছি তার বালুকণাগুলি আমাকে
জানাতে চাইছে আমি জল থেকে কতটা পৃথক—তার ঢেউগুলি আমাকে
বোঝাতে চাইছে আমি গাছ নই, আর গাছের আড়ালে ঐ ধাঙড়বস্তির এক
মদ্যপানরত যুবক আমাকে বলতে চাইছে আমি পক্ষীরাজ, মেঘ থেকে নামলাম,
এইমাত্র, সাক্ষাৎ তারই চোখের সামনে—

হবেও-বা। তাহলে বর্ষার আঁধার সকালে আমি ডানা গুঁজে বসে থাকি। রোদ
উঠলে উড়ে যাব।

৩
দু-হাত শূন্যে তুলে কেঁদে উঠি, 'প্রভু, ওটা আমাকেই দিতে হবে।'
লোকে প্রচণ্ড আমোদ পায়—বলে, 'তোর আমড়াগাছির যেন শেষ নাই,
আবার দেখা তো দিকি ঐ খেলা', আমি আবারো দেখাই
মাঝে-মধ্যে অতিরিক্ত কিছু হাঁপ জুড়ে দিই, যথা, 'এসেছিনু ভবে'

অথবা 'নিঠুর', এ-সব গৌণ গান তুমিও গাইতে পারো;
লোক হাসে—এর চেয়ে বড় কথা আর আছে নাকি?
দিনের প্রখর রৌদ্রে বনতলে পড়ে রয় অজস্র জোনাকি
মূক ও মৃত্যুমুখী, শরীরের নীল আলো জ্বলে কারো কারো।

৪

বালক-বালিকা ও পেশীবহুল গ্রাম্য আত্মীয়-সভার কাছে আমি দাবি করি—কই হে, আমাকে একটা ঝুমঝুমি দাও, যে-কটা দিন আছি টেনে বাজাই। অসংখ্য আত্মজীবনী, দিনলিপি ও সম্পত্তি-হস্তান্তরের দলিল আমি এবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে পড়ে ফেলেছি—জানলা দিয়ে দেখেছি দূরে উড়ে-চলা ঐ শুকনো পাতাগুলো ক্রমে বহু তক্ষকে রূপান্তরিত হল এবং তারপর ঘুরতে ঘুরতে নামহীন চিত্রময় সাপ হয়ে তার মাটির অধিকতর ভিতরে মিশে গেল—অথচ তোমরা তো বলেই খালাস যে রূপের কখনো রূপান্তর হয় না, ধুলোর শরীর নাকি ধুলোতেই ফিরে যায়, পর্বতপ্রমাণ ছায়া এখানে-ওখানে পড়ে আছে দেখেও এ-কথা কেউ কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে আমাদের দেশে একদা লোকজনের বসবাস ছিল? ওরা, ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে-আসা আমার আত্মীয়-পরিজন, যখন এবারের পঞ্চায়েত উপনির্বাচনের কথা ভাবছে, তখন আমিই হঠাৎ বলে উঠি—যাই চাটুজ্জেদের বাড়ি নতুন বৌটির সঙ্গে দু-কথা কয়ে আসিগে।

৫

হাড় ও কঙ্কাল শুধু, আমি তাকে পাঁজাকোলা করে
চেয়ারে বসিয়ে দিই, অম্নিই বসে থাকে,
ঝঞ্ঝাট করে না, কখনো হেলান দিয়ে দেয়ালে
সাজিয়ে রাখি—বেশ থাকে কোনাভাঙা, চাটগাঁ-র ভাষায়
এটা-সেটা বলে, তবে কোনো দাবিদাওয়া নেই,
যেসব পুরুষদের বৌ-রা চাকরি করে তাদের মুখের দিকে
অপলক চেয়ে থাকে—ভয় পায় বিসর্জনের
ঢাক শুনে, ভাবে বুঝি তাকেও নদীর জলে ফেলে দেওয়া হবে।

৬

শ্রীচম্পা কখনো পথে কখনো-বা মেঘের সদরে ফুটে থাকে। আজ
বৃদ্ধ সমুদ্র আর লোহাজাল খাঁড়ির দেয়ালে আক্রোশে আছড়ে পড়ছে।
অতিশয় ফাটল দেখেছি। উপকূলরক্ষীদের ঘরগুলি

ছন্নছাড়া, ভগ্নদশা—শ্রাবণের কটাল-জোয়ারে থই থই।
ফিরে আসব শীতের ছুটিতে। তখন এ-তটরেখা সরে যাবে বহুদূর।
পথের দু-পাশে শ্বেত, বৃষ্টিহীন মেঘে আর পরিত্যক্ত ঘরে ঘরে
শুরু হবে ফুলের উৎসব। অনেকেই তখন আসবে।

৭

এবার যদি আমি ফিরে আসি তবে আমি নীল রঙ হয়ে ফিরে আসব।
বৃষ্টিশেষে মেঘের ফাঁক দিয়ে বাংলার আকাশে যে নীল রঙটুকু দেখা যায়
আমি তারই মতো হাল্কা কিছু বলার চেষ্টা করব—
যে-কথায় কোনও জড়তা নেই—যাকে না বুঝলে
কারো ভাতকাপড়ে টান পড়বে না—কেউ বলতে পারবে না
তোমাকে বুঝলুম না হে, তোমাকে একেবারেই বোঝা গেল না।

তখন তুমিও সাদা রঙ হয়ে ফিরে এসো।
হাতে-বোনা খদ্দরের হিংসাহীনতা হয়ে তুমি যেন আমাদের
সবার চৈতন্য ছড়িয়ে পড়তে থাকো—যে সাদা রঙ দাবি করে
'আমাকে বুলেটবিদ্ধ করো, আমাকে রক্তছাপে ভরিয়ে তোলো,
আমাকে স্বাধীনতা দাও।'

৮

জড়তা নামছে, ঋষি, এসো ভাইবোনেদের ডাকি।
পড়ার টেবিলটুকু ওখানেই পাতা থাক যাতে সহজে নাগাল পাই—
যাতে দ্রুত লিখে যেতে পারি কেমন লাগল· আজ এ-বেলার
আভ্যন্তরীণ শান্ত রক্তপাত—শ্রবণ কীভাবে নিল
দূর তরুলতাহীন শূন্য থেকে ভেসে আসা কবিদের বৃন্দগান—.
সুতোবাঁধা উপহার পেয়ে তার কেমন ভাবনা হল, মানে এই
পক্ষাঘাতগ্রস্ত জড় দেহটির। কে পাঠাল এতসব ছেঁড়া জার্সি, হাফপ্যান্ট,
ফটোর শুকনো মালা, আর স্কুলের প্রথম অক্ষরটানা খাতাটিও
এতদিন কাদের সংগ্রহে ছিল? কীভাবে বা ফিরে এল?
ভুলগুলি তেমনই রয়েছে। কেউ কেন শুধরে রাখেনি?

৯

ডাকি অন্তঃকরণবাসী কোথাও
যদি বা কেউ থেকে থাকে, খোকন ও
বৌমা ব'লে ডাকি তাঁকে—
পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
তীব্র ক্ষুধার টানে
নদীতীর মাছের সন্ধানে
ছেয়ে ফ্যালে। নমস্কার
খাদ্য ও খাদকে—যার
বোঝাপড়া সুনিশ্চিত,
সূর্যালোকে প্রীত
এ ওকে চিনেছে,
পাখি চেনে মাছে
মাছ চেনে পাখি,
নবরত্ন শাঁখী
(চৌপটির নতুন জহুরি)
আমাকে দেবতা ভাবে,
স্বীয় গ্রহের প্রভাবে
আমি নিজেকে ময়াল জানি,
বিবাহের দানপাত্রখানি
ঠোঁটে চেপে পড়ে আছি,
মোম ও গলিত মাছি
একে একে খেতে চাই—
খাব লেহ্য সিন্দুর, ছাই,
ধাতু-অলঙ্কার আর মকরকুণ্ডল,
জেনো, মনোবাসীদল,
সকলকে ডাকার আগে
এই পেটে অগ্নি জাগে,
হায়, শুরুতেই গিলে ফেলি
বেনারসি-জোড় আর বেনারসি-চেলি।

১০

যে-সৌন্দর্য মনোলোভা তাকে আর কেন
দূর থেকে দেখি! একটু এগিয়ে যাই, শালা আসামের
মাল-ভর্তি লরী সাবধানে পিছু হঠছে কালাকার স্ট্রিটের
বন্ধ গলির বাঁকে, বৃষ্টি হল সারাদিন, ফুটপাথে কাদা ও মোবিল,
আমার কাঁধের ব্যাগে মহিষপুরের সেন্টেড ধূপকাঠি, মাজার
ব্যথার জন্য জাফরানী তেল আর গর্ভপাতী পাথুরে শিকড়—
যে-সৌন্দর্য বিধুমুখী তারই জন্য এইসব সাংসারিক
খবরাখবর নিয়ে, সন্ধে হয় হয়, সদর দু-হাট দেখে
আমি টুক ক'রে বাড়িটায় ঢুকে পড়ি।

১১

যে-দেশে পৌঁছে গেছি তার নাম অলাবুভক্ষণ।
জয়মাল্য-পরা ট্রেন, কুলিরাও যথার্থ বিদুষী,
স্টেশনের বাইরে টাঙা আদর্শবাদীতার জন্য মন কেড়ে নেয়,
স্মৃতিদীপ জ্বলে না এখানে।

ভেঙে এনেছি এবার এই এতগুলি ডাল ও সবুজ পাতা,
ভিতরে গুঞ্জনসহ পতঙ্গ ও কীট—যাদের প্রবাদে জন্ম।
'তুমিই তো স্মৃতিদীপ', তারা আমাকেও শ্লেষাত্মক করে।
শোনে কথা এইসব হস্তিমূর্খদের! আমি কি জ্যোতিষ?

১২

জাতপাত মানো তো হে, নাকি আমাদেরই বোকা ভাবছ? শ্যামাপ্রসাদের গলায় মালাটা কে দিয়েছিল? পঞ্চাশের ছয়ই জুলাই? মিত্র স্কুলের সামনে? পদ্মার ওপারের সম্বন্ধীরা তখন এ-শহরে জাঁকিয়ে বসছেন—দক্ষিণের ক্ষেত-জমি বেদখল—হারামিরা, দেশ কেন ছেড়ে এলি? এলি যদি দু'চার ঘা দিয়ে আসতে কী হয়েছিল? বিধানবাবুর মায়ের অন্তর—এসো বাছা, বোসো বাছা, এ-বাংলা তো তোমাদেরই; হাঃ হাসালেন বটে, কলকাতায় ওনাদের হাইকোর্ট দেখিয়েই গুডবাই ক'রে দেওয়া ঠিক ছিল—যা, ভিটে কামড়ে পড়ে থাক্, চাকু মার্, লুঠ কর্, আগ লাগা...আর, সেসব দুঃখের কথা, দেশ তো বেহাত হল, তেনাদের গোলাভরা ধান আর পদ্মার ইলিশ ঐ পারে পড়ে রইল, এই দেশে ক্রমাগত গল্পের গরু-ছাগল গাছে উঠল, আমাদেরও শিক্ষা হল, তার ফলে আজকের এতসব অনাচার, জল ঘোলা, খোট্টাদের তাঁবেদারি, বাঙালি কোথায়?

১৩
সে-ও গেছে চলে। নিমগাছ পাতায় পাতায়
সকালবেলার পরিশ্রুত রোদ ঢালছে। আমি শুধু অনুবাদ
সাহিত্যের কথা ভাবছি—কীভাবে যে এক ভাষা থেকে
আরেক ভাষার তাঁবুর পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ব—ওঁদের রান্নার
পেঁয়াজ-রসুন নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করব!

অথচ আমাব এই লজ্জাহীন শোকতাপে অতকিছু জানাশোনা
কাদের দরকারে লাগবে? বরঞ্চ আমার কি উচিত নয় যে
ঐ নিমগাছে পিঠ ঘষা, আর তার পায়ে-পড়া, তাকে বলা—
ওকে তুমি ফিরে দাও। সে অন্তত একবার, ফিরে এসে, ঠাট্টাচ্ছলে এসব দেখুক।

১৪
আমিই পেরেছি তাকে ধরে রাখতে, কিছুদিন, সহজ হয়নি, অনেক
হিসেব দিয়ে বুঝিয়েছি। সে শুধু বলেছে গাও, গান গাও, গান—
ঝলসে উঠেছে আলো ত্রিশূলের, তীর বিঁধেছে দেয়ালে,
কুঠারপ্রমাণ ক্ষত রয়ে গেল, রয়ে গেল অনুরোধ, রক্তলেপা হাড়,
ধর্ম বলতে আজ অজ্ঞানতাকেই আমি বুঝে থাকি, এমনই সরল—
তখন গাইনি গান, জেদ ছিল, তাই কথা শেষে
সে গিয়েছে নদীপার, অগম্যগমনে, অন্ধ কুয়াশাপ্রদেশে।

১৫
শেষকালে মহান সত্যের দেখা পাওয়া গেল। আমি তো সপরিবারে (স্ত্রী ও কন্যাসহ) ওঁর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমার মেয়েটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : ওমা, এ যে জয়ন্তদের নতুন জামাই। কল্পনা বলল : ওরা সব-কটা ওরকম—সারাদিনই ছাইপাঁশ গিলছে (সে ওদের অন্যসূত্রে চেনে) যাই হোক, একটু এগিয়ে গিয়ে আমি বেশ কায়দায় দু-হাত সাইডে তুলে নমস্কার করলাম। বাকি সব নিচু হয়ে প্রণাম সারল। ফ্লাশে ঘন ঘন ছবি উঠল। উনি সুন্দর, হাসিমুখে সংস্কৃতে কী যেন বললেন! কল্পনা আমার কানে মুখ নিয়ে যেন-বা বলল : চালিয়াত।

১৬

থাকছি নিশ্চিন্ত হয়ে সারাদিন নিদ্রার জটিল বিন্যাসে—
স্বপ্নতরুর ডালে উঠে বসেছে পাড়ার কয়েকটি ছেলে,
ঐ তো রাখালকে দেখতে পাচ্ছি—ওর ছোটো ভাইটিও আছে,
সুধন্য যদিও নেই কিন্তু তাকে পাতার আড়ালে খুঁজি, পেয়ে যাই,
মন বড় খুশি হয়, যাক, এরপর গাছটি বাড়ুক, ফুল দিক, ফল দিক,
আমার আজকে তাকে কিছুই দেবার নেই, যদিও দিয়েছি
একদা কিছুটা সার—যৌগিক, সুষম ও পরীক্ষামূলক—
বাঁশবেড়া দিয়ে তার জবুথবু শৈশবকে ঘিরেও রেখেছি।

১৭

ধৃত মীনশরীর ঐ জালে-পড়া প্রাণীটির—
কে-ই বা চিনবে তাকে? ধীবর বলছে এ তো মাছ নয়,
নাবিক হাসছে—নাকি এই সেই রমণীরতন যে আমার
মৃত্যুর কারণ হতে পারতো—যার গান শুনে সে-বছর
পুবের সমুদ্রপথে ভেসে গেছি?

মেঘ অল্পক্ষণের জন্য সূর্যকে ঢেকেছে। ছায়া নামল দ্বীপে দ্বীপে।
আজ আমাদের ছুটি ফুরানোর দিনে ধরা দিল জালে, হায়,
জ্ঞাত জগতের ব্যতিক্রম, অবিশ্বাস, লঘু মিথ্যে গল্পের মতো
এ মহাপ্রাণ—কেউই চেনে না যাকে,
ঝগড়াটে কাদাখোঁচা পাখিগুলি ছাড়া।

১৮

মোমটুকু কাগজে ঘষছি আর ফুটে উঠছে ছবি এক
মেঘে ঢাকা দুপুরবেলার, চালতাবাগানে বৃষ্টি,
বৃন্দেদের সেই মেয়েটিকে এইমাত্র জলে
নেমে যেতে দেখলাম। পানা বৃত্তটুকু ঘিরে ফেলল।
ওকি হারানো বাসন খুঁজছে? নাকি অন্য পাড়ে ভেসে উঠবে?
কেউই জানে না। অন্তত আমি তো নয়। মোম ও কাগজ
অতঃপর স্থির করবে মেয়েটির উপায় কী হতে পারে।

১৯
দেখছ কি ফুলডিঙি? আমি আজো প্রত্যক্ষ করিনি—
শুধু বইতে পড়েছি। বরং তরমুজভর্তি এক ছিপ নৌকা দেখে,
বোকার মতোই, মনে হয়েছিল, ঐ বুঝি কাঙালির

জলিবোট। স্নানঘাটে সকলকে নিয়ে যাবে—
তোমাদের বিবাহ-উৎসবে। আমি তো প্রথমে উঠব, ফিটফাট,
মালা হাতে। অন্যদের এড়িয়ে বসব। এতকিছু আকাশপাতাল
ভাবনার এক ফাঁকে, দেখি ওর পাটাতন দগ্ধ ফুলে, জ্বলন্ত পাতায়
ভরে গেছে। কাঁথা পুড়ছে।
—এই দেহগুলি তা হলে কাদের?

২০
ভূতলশায়ী ঐ যাত্রীনিবাস থেকে আমি সেদিন তোমাকে বলেছিলাম ওঁদের বাড়ির দোতলার ঘরে আমি একসময় থাকতাম—কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, কেননা তখন এইখানে রেললাইন পাতা ছিল—লেবেল ক্রসিং-য়ে চায়ের দোকান ছিল—তার একটা বিদেশী নামও ছিল, মনে পড়ে—মালিক-ছেলেটিকে আমি বলেছিলাম তোমার বাবার সঙ্গেই আমাদের ছিল বেশ জানাশোনা—অল্প হেসে সে দেয়ালে একজন লোকের ফটো দেখিয়েছিল যার গলায় দুলছিল কবেকার শুক্‌নো ফুলের মালা—আমরা তখন খুব চা খেতাম—কখনো কখনো টোস্ট—জামায় যেন আজো পাঁউরুটির অবশিষ্ট লেগে আছে এইভাবে আমি হাত দিয়ে সামনেটা ঝাড়তে থাকি—ঝরে পড়ে রুটির গুঁড়ো, গোলমরিচ, মোটা দানার চিনি, কালো কালো পিঁপড়ে আর একের পর এক নব্বই সাল, আশি, উনসত্তরের শেষ কয়েকটা মাস, এপ্রিল বাষট্টি, সাতান্নর শীত ঋতু, ধুবুলিয়া উনিশশো পঞ্চাশ, রশীদ আলি দিবস, বেয়াল্লিশের ক্ষেতখামার।

নাইট স্কুল

ভূমিকা

গোল হয়ে বোস তোরা, আজকের নাইট ক্লাস অন্যরকম, সাণ্ডেলদের ছোট ছেলেটা এস্ছে তো, এই তুই এশ্চিস না এসিস নি, হাঃ হাঃ, শোনো, কথা বলে কিনা আমি এসিনি, কিন্তু তোর গলা কি আমি চিনিনে রে, আগরওয়ালাদের রোগা মেয়েটা আসবে না খবর পাঠিয়েছে, রোলকল হবে, দু-মিনিটের মধ্যে, তারপর কলা আর পাঁউরুটি, তারপর আজকের বিশেষ অতিথি যিনি কষ্ট করে এদ্দুর এশ্চেন, এখন বাথরুমে, তিনি কিছু বলবেন, তোরা গোল হয়ে বোস, কিন্তু ঝগড়া করিসনি, এই বাড়ির মালিক বটকেষ্টবাবুর মা-র বড়ো অসুখ, দোতলার ঘরে রয়েছেন, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনলে স্কুল বন্ধ করে দেবেন, না না, মা কিছু বলেননি, বলেছেন বটাবাবু, ওঁর ভাই গিরি নজর রাখছে, সে-ই গিয়ে দাদাকে লাগায়, চুক্লি কাটে, আর বাইরে, আমাদের সামনে, বড় বড় কথা, শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ, শিশুদের গড়তে হবে, আর ছাদের এই কোনাটুকু হপ্তায় তিনদিন, তা-ও সন্ধেবেলায়, ঘণ্টাখানেকের জন্য, ছেড়ে দিতে ওনার বুক ফেটে যাচ্ছে, কলার খোসা এই ঝুড়িতে, পাঁউরুটির গোড়াসুদ্ধ খাবি, অনুপস্থিত পাঁচ, উপস্থিত তের, এই সাণ্ডেল তোকে প্রেজেন্ট দোবো, না অ্যাবসেন্ট দোবো, আকাশের দিকে হাঁ ক'রে কী দেখছিস, মুখের নাল মোছ, ঐ যে উনি আসছেন, পঃ বঃ শিক্ষা আধিকারিক (সহকারী), সল্ট লেকে বসেন, সোমেনবাবু, সোমেন্দ্রনাথ সোম, প্রোমোটেড আই. এ. এস., রিটায়াবের ছ-বছর, বেলেঘাটায় বাড়ি, মেয়ে দিল্লিতে, বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে আসামের চা-বাগানে, নিজের বলতে এখন শুধু হাঁপানি আর আলসার আর ইউনিট ট্রাস্টে কয়েক লাখ, মেডিক্লেম, আর শরৎ-রচনাবলীর ডিউ ছ-টি কুপন, গিন্নির চোখের ব্যারাম, আসুন, আসুন, এই মাঝের চেয়ারটায়, হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন, এই, এগিয়ে আয় না, সার-কে এক গ্লাস জল দে, না খেলেন, টেবিলে ঢাকা থাক, চা-টা ক্লাসের পরে হলে অসুবিধে নেই তো, যদি চান তাহলে ক্লাস চলাকালীনও...

উনি বাঙালি নন

উনি লালা, অবোধ, বাঁকেবিহারী, ভরদ্বাজ, দ্বাদশবেদী, উনি নাহার (মানে নেহেরু, যুগ যুগ জিও), উনি সাগর, উনি গিরি, উনি কেন্দুপাতা, উনি লোহিত, উনি হাতিসিং, উনি বাঘনখ (আফজল-পূর্ব), উনি চিৎপাবন (গোখ্‌লে গোষ্ঠী, যুগ যুগ জিও), উনি রউনাক, উনি যাদব, উনি ঠাকুর, উনি নাম্বুদ্রি, উনি পটনায়েক,

বস্তুত উনি বাঙালি,

বা আরো বেশি, ফ্রম মাইমান্ সিনহা, পূর্বপুরুষ ছিলেন পাহাড়ে বাঙাল, ভাগচাষি, বেগুনচাষি, সম্প্রতি উনিই যুক্তাক্ষর-বর্জিত সেই বিখ্যাত বইটি লিখেছেন, ওঁর স্ত্রীর পৌনঃপুনিক মন্তব্য হক্কলের লাইগ্যা ভাইবা ভাইবা উনীরে বইখান্ লিখছেন, বই তো নয় যেন কাঁটা বেগুন, কুলি বেগুন, মাকড়া বেগুন, নুকড়ি বেগুন, মুক্তকেশী, আউশা, গোষ্ঠ (ওরফে মার্বেল) এ হল গিয়ে দাদা-ভাইয়ের দেয়ালা, গলায় ঝুলছে আমলা-রাজনীতি ও সরকারি-তেজপাতার মালা,

তা-ও লোকে বিশ্বাস করে না,

বলে কণ্ঠি কোথায়, পার্টি কার্ড দেখা, পার্টিশনের আগে না পরে।

১
পাখি তো গেল, আমিও গেলাম, ডাহুকবিলের শুকনো চড়ায় আমাদিগের অমনিতর হাঁটাহাঁটি, গম্ভীর চাল, যেন জমিদারের মাসকাবারি, ঘরে যাচ্ছে, জামাইপোকা, কীটাণুকীট, মাখোম বাছুর, নাকের সামনে কোঁচাটি ঝাড়া, মা-জননীর গুরুভক্তি, ষষ্ঠ অঙ্গে প্রাণাতিপাত, মানত ছিল, নিরামিষাশী পূর্ণিমাচাঁদ, ঝিঁঝির গান, স্বরবিতান, সন্ধে হল, সন্দেহ হয়, অনেকটা ঠিক একই রকম শুনতে লাগে, পাখি তো ওড়ে, নইলে কি আর ডানা-পালকে ফালতু বাহার, জয় জগদীশ, আমায় দিয়ে মিথ্যে কেন কাদা ঘাঁটাও, এই উপমা আর উৎপ্রেক্ষা, নরোত্তম তোমার চেয়েও বড় কবি, সবাই জানে, সবাই জানে কেবল দেখছি তুমি ছাড়া, উড়বে কবে, পাখির মতো, নাকি শুধুই কাদায় কাদায়, পদ্মপাতায় টপকে যাবে, পোকামাকড় লেপ্টে খাবে, কবি হয়েছেন, হা ভগবান!

২
কতদিন পর দেখা—ভুলে গেছি আপনি না তুমি ক'রে
বলতাম—ঐ শকটের ভাঙা চাকাটিকে হেসে বলি—
কোথায় কোথায় না ঘুরেছি তোমার সঙ্গে—তাহলে তুমিই হোক।
কুয়োর শুকনো পাড়ে শতছিন্ন দড়িটাকে সস্নেহে একত্র করি—
কতদিন তুমি যে আমার স্নানজল তুলে দিতে; ও মৃৎকলস,
সেই শৈশব থেকে তুমি এ-তৃষিতের বৃষ্টিমাতা হয়ে আছ,
আজ ফাটল ধরেছে। পুরনো বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে, ঘরে ঢুকে
মনে হল ঐ দরজাকে আপনি-ই বলা ভালো—
কেননা আমার বাল্যের ছুটোছুটি শেষ হলে সে-ই তো রুদ্ধ হত
প্রতি সন্ধ্যা, সশব্দে ও আশঙ্কায়। তাকে আজো ভয় করি।

আর সে-ও কি আমাকে, অন্তত কিছুটা, অবিশ্বাস না ক'রে পারছে!

৩

কিন্তু আমি হায়, লিখতে বসেছি নস্টালজিয়া নিয়ে। নিকটস্মৃতি সব সময়ই দূর স্মৃতিকে অবজ্ঞা করে। সে যেন খোদিত পাথর যা সময়ে ধুয়ে যাবে না। কুয়াশা মুছে ফেলে তার অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই পড়া যাবে। কেউ-না-কেউ পড়ে ফেলবে। আজ অথবা কাল কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে খেলা দূর স্মৃতির নিয়ন্ত্রণে। 'বেয়াল্লিশ বছর আগে'—হাওড়া স্টেশনে গণেশ নন্দী সেদিন আমার পিঠে হাত রেখে বলেন—'আমাদের পূর্ণ সিনেমা ব্রাঞ্চে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে এসেছিলেন। চাগ্‌রির প্রথম চেক। তিনশ একুশ টাকা সত্তর পয়সা। নাম্বার, সি দুই চার নয় সাত। সেভিংস। মনে পড়ে?' আমি চমকে উঠি। না, কিছুই মনে পড়ে না। ঐ স্মৃতি পাথরে-খোদাই অক্ষর। হয়ত পাহাড়ের মাথায়। জঙ্গলে ঢাকা। গরুছাগল চরে। কোনো রাখালদাস, একদিন নিশ্চয়ই, আমার দিক থেকে উঠে, এক-দুপুরের রোদেই সবটা পড়ে ফেলবেন। আজ হাওড়া স্টেশনপ্রান্তিক আমার বিমূঢ়তা গণেশবাবুর (রিটায়ারের পর, চন্দননগরে, গঙ্গার ধারেই, ছোট দোতলা বাড়ি, ছাদ-ঢালাইটুকু বাকি আছে, চলে আসুন না একদিন) অসীম আত্মতৃপ্তির কারণ হয়। 'গানবাজনা চলছে তো'—তিনি স্মৃতিবিনোদনে আরেকটু এগিয়ে যান।—'না না, আপনি তো লেখালেখি করতেন, আমার ছোট শালারও ও-বদভ্যেসটা ছিল, তারাশঙ্করবাবুর জামাইকে চিনত, সেবার হল কি...'

আমি, লাফ দিয়ে, জেটিতে সদ্য-সাঁটা লঞ্চে উঠে পড়ি।

ঐ দিকে বাবুঘাট।

৪

নেমেছে, সর্বত্র বৃষ্টি, সাংসদ কৃষ্ণকান্তবাবু, তাঁর ডান হাত, একান্ত সচিব, তমাল, ছাতা হাতে নেমেছে স্কুলের মাঠে, আসন্ন নির্বাচন, আজ ভোটসভা, মঞ্চের উপরে ত্রিপল, বাহান্নটা পোস্টার, প্রতীক 'ছাঁকনি', এক বালতি গঁদ, কোথায় সাঁটবে, বেনু জানে (কোন বেনু), হাতকাটা, বাজারের ছেলে, বাপ ছিল মাছের হাওলাদার, জ্যাঠা হারামির হাতবাক্স, বিষয়-সম্পত্তি

হাতিয়ে নিয়েছে, বেনু মাকে নিয়ে (বিধবা) পথবাসী, আর সময় পেলো না গা, আকাশ-উপুড় বৃষ্টি, এই জল কোথায় গড়াবে, বিরোধী পক্ষের ঢলানি হাসি, যত কেন (কেন্দ্রীয়) মন্ত্রীকে আনাও, হেলিপ্যাডে আধ হাঁটু, ম্যা গো, বৃষ্টিতে রিলিফ, খরায় অনুদান, সম্বৎসর, উচ্চচাপ-নিম্নচাপের রাজনীতি, প্যার হো গিয়া, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, (আর কি কখনো কবে), ওফ্, ভাবা যায় না, কৃষ্ণ কাদায়, তমাল ছাতায়, শ্রীরাধা প্রচারভ্যানে, ক্রমবিকাশ, এ্যাঁ!

ওদের বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েদের কাছে
আমি যথেষ্ট স্নেহের সঙ্গে দাবি ক'রে থাকি—
দ্যাখো দিকি আমায় একটু কেয়াজল এনে দিতে পারো কিনা?
আর কামাখ্যার সেই পুরনো জাঁতিটা?

ওরা আরো আনে
পান পাতা, কচ্ছি চুন আর কোঙ্কনের সবুজ সুপুরি—
আমি তপ্ত বালির উপর অজস্র
ধূসর গর্দভ দেখি যারা
রৌদ্রে শুধু পাক খাচ্ছে, সাদা বড় বড়
সৈন্ধব লবণের চাঙড়ে রাখছে মুখ
নুন চাটছে—

চাষ বহুদূরে।

৬

ইধর আও ভজনলালা, দেখো ইয়ে ক্যা হ্যায়—সত্যিই কাদার উপর প্রায় ছ-ইঞ্চি, চওড়ায় সাড়ে তিন, আপনাদের আগেই বলেছি, জায়গাটা আইডিয়াল, জল আছে, ঘন বন আছে, ওয়াচ টাওয়ারে কেউ ছিল কি, মনে পড়ে না, অফিসে গিয়ে ডিউটি-লিস্ট দেখতে হবে, দেখুন দেখুন, একটা নয় দুটো, জোড়া, মেয়েমদ্দা, কাল বৃষ্টি হয়েছিল বলেই এমনটি ফ্রেশ পাওয়া গেল, খেলা করছিল, ওরা দু-জন, মেয়ে বুঝলেন কী ক'রে, ও আমরা পাঞ্জা দেখেই বুঝতে পারি, যদি না গর্ভবতী হয়,

তাহলে হবে ব্যাটাছেলেদের মতন, চলুন, জীপে ফিরে যাই, সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে, এবার কি তাহলে ওঁদের জল খাওয়ার সময়, না, না, এই কুণ্ডে আসার লাইন আছে, প্রথম আসবে হরিণ, তারপর আরো ছোটোখাটো জানোয়ার, তারপর বনশুয়োর উইথ ফ্যামিলি, তারপর বাইসন, তারপর মানুষখেকোরা, জঙ্গলের মস্তান, আগে ফেউ ডাকবে, গাছের ডালে ডালে বাঁদর-হনুমানদের ঝটপটানি শুরু হবে, পাখি উড়বে অন্ধকার আকাশে, এই ভজন, শালে উল্লু ইসকো কভার করো, বড়কা পাত্তি লে আও, আচ্ছাসে মার্ক লাগাও, তিনমাস ব্যাটাদের খুঁজছি, এই রেঞ্জেই আছে, মানে—এসে পড়েছে, এদিকে প্রকল্পের রিপোর্ট পাঠানোর সময় হয়ে গেল, কাল ডি. এফ. ও. সদর থেকে এসে গেলে ভালো হয়, স্বচক্ষে দেখে যাবেন, ভাগ্যিস অসময়ে বৃষ্টিটা হল, ফ্রেশ, একেবারে টাটকা, সেবার ডালটনগঞ্জে, শীতের শেষদিকটায়, হল কি আমার বড় মেয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা তখন...

৭

এই যে প্রচণ্ড বায়ুর স্রোতে, বোধবুদ্ধিহীন প্রখর রৌদ্রে আমি জন্মে উঠছি আর হেঁকে বলছি, 'তোমাকেই ভালোবাসি, শুধু তোমাকেই', এর সত্যতা কারা-বা প্রমাণ করবে আজকের বাতাস, রোদ্দুর আর রাত পার-হয়ে-আসা মোহানার জলটুকু ছাড়া

—সাক্ষ্যব্যতীত কেউ কি বাঁচতে পারে?

৮

আমার ভিতর আবারো সে-প্রবণতা জেগে উঠেছে যে আমাকে ক্রমাগত পাতার ভিতর পাতা হয়ে মিশে থাকতে বলে—আর কিছু নয়—কোনো ফুল নয়, ফল নয়, শাখায় শাখায় লঘু পায়ে ভ্রাম্যমাণ পাখিটুকু নয়—শুধু পাতা, তা-ও দূরত্বে মলিন—যার সময় বড়ই অল্প—যাকে আর কিছু পরে দেখাও যাবে না। সেই মতো।

৯

এসেছে অদ্ভুত প্রেম, বলে : আমি রায়বাড়ি থেকে
দৌড়তে দৌড়তে আসছি। বলে : আমি একা নই,
কয়েকজন ভাবানুষঙ্গে আছে।
দেখি তার পিছু পিছু
ছুটে আসছে জলস্রোত, প্ল্যাস্টিকের ঘটি-বালতি,
ভাসিয়ে আনছে কাঠ, দগ্ধ বাঁশ, যেন
মনে হল দু-একটি মানুষও ভাসছে জলে,
আধপোড়া, মরে গেছে যেন—

তাহলে কি ও-বাড়ির আগুন নেভেনি আজো!

১০

আমার ব্যবসা ছিল কাচ নিয়ে, আয়নার ভাঙা টুক্‌রো নিয়ে,
ওসব কাপড়ে মুড়ে যে বিশাল চন্দ্রাতপ বানিয়েছি সে-টি আজ
আকাশের মুখোমুখি, মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে, সন্ধে হয়ে এল,
গায়ে তার নক্ষত্র ফুটেছে, আমি যেন সিংহরাশির ছায়া দেখে ফেলি,
দেখি শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখ, দেখি ইডেন উদ্যান, দেখি রাজভবনের সিঁড়ি,
ঐ ত্রিপলে গড়িয়ে পড়ছে বেকারত্ব, হকারের লাইসেন্স, তপনের শালীর গান,

আমার ব্যবসা টলে, পাক খায়, উড়ে যেতে চায়—এমনি সৃষ্টিছাড়া।

১১

আজকে আমার খুবই ঠাণ্ডা লাগছে—এদিকে ভার্গব
লণ্ঠনচোরদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত, বাজার
কখন হবে ঠিক নেই, ভাঙা কলসির টুকরোগুলো
পলাশ গাছের নীচে পড়ে আছে, হাটবারে এবারো একটি
নতুন জলের পাত্র কেনা চাই—হয়ত স্বয়ং
যাব—কিন্তু আজ, এ-মুহূর্তে, আমার
অস্বাভাবিক শীত করছে—
তপ্ত বালি-কাঁকরের স্তরে জীবাশ্মের মতো
শুয়ে থাকলে ভাল লাগত
অন্তত একটা কিছু ব'লে তো আমাকে, লক্ষ বছর পরে, চেনা যেত,
ভুল করা যেত কুকুর বেড়াল ব'লে

নামহীন পশুহাড় ব'লে—
মানুষের ভালমন্দ কিছুই আমাকে আর স্পর্শ করত না।

এইসব ভাবনায় চলে গেল শীত। জ্বর ছেড়ে গেল।
আবার অপেক্ষা।

১২

ঢালে মাটি, ঢালে বালি-কাঁকরের থান, খড়িগুঁড়ো,
ক্রমাগত অগ্নিপ্রপাতে ঢালে মিশ্র ধাতু, অম্লজান, উদজান,
স্থিতিস্থাপকতা ঢালে, রঙতামাসাও ঢালে—তবে মাপ বুঝে,
এরাই নরকবাসী, এদের সহস্র জন্ম, মৃত্যু তা-ও অগণন
যেহেতু এদের দূর থেকে গান-গাওয়া, সুরে ও বেসুরে, ঠেকা-দেওয়া,
হারমোনিয়াম বাক্স থেকে বের-করা, ধুলো-ঝাড়া, আমরা তো
দেখেও দেখি না—পাছে ভয় পাই, যদি চমকে উঠি, যদি
বুঝে ফেলি এরাই সে-দেবদূত যারা ঢেলে দেয়
মরূদ্যান, ঢালে গ্রহ ও নক্ষত্র, ঢালে মেঘ ও ইন্দ্রিয়বোধ।

১৩

সেদিন রেখেছি জল স্থির এক মৃৎপাত্রে—ঢাকা দিয়ে, জানলার
কাছাকাছি—কিন্তু পৃথিবী ঘোরে—জাগতিক চঞ্চলতা তাকেও স্পর্শ
করে—তাকে উত্তেজিত করে—পশ্চিমে, শীতের রাত্রে টেনে নিয়ে যায়—
শৈত্যে শীতল সে-জলটুকু, প্রাণোপম, হাঁড়ি ভেঙে মেঝেয় লুটিয়ে গেল—
তরঙ্গ বুঝি-বা—মৃতের মাদুর যেন—তার মানে অকস্মাৎ গ্রীষ্ম এসেছে
ফিরে।

টুসু আমার চিন্তামণি

১
কিছু মাটি ও সম্মুখবর্তী
বকযন্ত্র—আর বেলাভূমি,
স্বর্ণবিন্দুসিন্ধুতীর—
এই পাত্র, এই তৌল,
এই সূর্প,
সোনা ছেঁকে তুলি—
স্রোত চলকায়,
মেঘে জ্বলন্তউড়ান পাখিদল,
সবাই প্রণাম নাও—
কারণ তোমরা কূট ও উন্মাদ,
আমি ভালোমানুষের পুত্র,
আমি ধাঙড়মাসির ছেলে
সমুদ্রে শয়ন যার,
যার সমুদ্রেই দিন কেটে যায়—
যাকে দেখে থাকবে ঝাউবনে,
অস্থিহীন, বলবান, ওঠে, বসে, পান খায়—
যে-মানুষ নুনের পুতুল
তাকে তুমি কাছে ডাকো

—অশ্বে চড়াও।

২
ভাবি এক-একদিন পেট পুরে খাব,
বেশ বাড়াবাড়ি রকমের—
ক্ষুন্নিবৃত্তি যাকে বলে সে-জাতীয় ঘেমো চেষ্টা নয়,
মস্‌মসে বালিশে হেলান দিয়ে সোনা গামলার দিকে
বাঁকা চোখে চেয়ে রইব—আঙুরগুচ্ছের দিকে—
তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষুধার বিবেক জেগে উঠবে,
বাঈ চাইব, বলব : দাও হে ঢেলে, নাচ দাও,
এসো দাহিত মৃগের মূর্ধা, আয় পাখিমাংস
—জল চাইব

জরদ্‌গব যে-ভাবে খায় মোটামুটি সেই ভাবে
খেতে চাইছি—এই তো ব্যাপার!

৩

সে হয় না।

হয় পুরোটা পাগল হও, নয় তুমি মরে যাও।
এই মাঠ মানুষ বিক্রির মাঠ,
এইখানে তুলা ও রমণী একত্রে ওজনে ওঠে,
এইখানে সর্প ও বৃশ্চিক একত্রে অপেক্ষা করে খদ্দের আসার,
এই গৃহ জনহীন, এই দেহ ভাঙা হাট বটে—

মরে গেলে হবে? তারও পরে খরচাপাতি আছে।

তুলাক্ষেতে নেমে আমি সাব্যস্ত করেছি মাতা বড়োই কৌতুকী
প্রতিটি ফুলের মধ্যে জায়মান শ্রেয়োবোধ লুকিয়ে রেখেছে
কার্পাস কার্পাস ব'লে আশ্রম কাঁদছে যেন সন্তানের জেদি কাড়াকাড়ি

কে গায় ওই
'শিখিপাখা অতুল সম্পদ'।

৫

হরীতকী · ঐ ফলটির দিকে অপার বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, ঘোর লাগে, মাটিতেই পড়ে আছে, প্রদীপ দুপুরের রৌদ্রে জ্বলছে, যারা এসেছিল সবাই ফিরেছে ঘরে, নির্জন অশ্বত্থের উঁচু ডাল বাতাসে কাঁপছে, কিন্তু হায়, দীপ, যা এ-মুহূর্তে প্রয়োজনহীন এবং কিছুটা হাস্যকর, অনেকাংশে ঐ হরীতকী ফলের মতোই, পরিত্যক্ত, নিভিয়ে দিলেও চলে—গত পৌষের মানত সিদ্ধ হয়েছে, রুক্মিণীর বাক্‌হীন ছেলেটি আজকাল, এই গ্রীষ্মে, অনর্গল কথা কইছে।

৬

মোহান্ত মেঘের দল যজ্ঞিডুমুর গাছে—
আড়ালে কিংশুক,
রৌদ্রে বেরিয়ে পড়েছে ভাম, সাঁঝপাখি, বাদুড়, নেউল,
চায়ের দোকান ফাঁকা,
চুনভাঁটি জনহীন—

জঙ্গল দেখার আগে বৃষ্টি ভালো

ঢিবি থেকে দলে দলে বিছে ও মাকড়সা নামছে,
মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে কেন্নো, কেঁচো, মহীলতা,
জোঁক টপকে টপকে চলছে—
গেঁড়ি-গুগলি পশ্চিমবাহিনী—যমকীট কাতারে কাতার—
দাবানল পুবের পাহাড়তক। বাধা পেল তাপ্তীর ব্যারাজে।

৭
কী হবে সংগ্রাম বুঝে?
ছিঁড়ে পড়ে ঝুলা,
বৃষভানুনন্দিনী ভেঙে দেয় বাঁশি—
কী হবে শিল্প বুঝে
পরমান্ন ধুলায় গড়ায়—
সুজাতা কি গাছের আড়ালে চলে গেল?
সবার দৃষ্টি, হায়, ভুল ভাবে পড়ে,
রেখার সারল্য থেকে সরে আসে
রঙের অন্তিমে—
'আমি প্রতিফলনের মধ্যে বেঁচে থাকি,
যে-বাঁচায় হাসি-কান্না আলাদা মুখশ্রী হয়'
—ছবি বলেছিল।

৮
এই পথে জলসন্ধি নেই। হ্রদ নেই।
যতই হাঁটো না কেন—কেবলই গরিমাচূড়া।
নিজের বাইরে তুমি যত হাঁটো খুঁজে পাবে ত্যক্ত ধাতুর খনি,
নদীহীন সেতু আর বুজে-আসা কূপ।

সে-আনন্দপথ ধরে ক্রোশ ক্রোশ হাঁটো।

শুনেছ কি বাসুদেবপুরে এক খেপি এসেছিল? হয়ত এখনো আছে।
তাকে অবশ্যই দেখে এসো। তাকে জল ও পেয়ারা দিও।

বেশি ক'রে জল।

৯

ঐ আদর-সিংহাসন, মালা ও পল্লবে জোড়া, কেউ যেন ও-আসনে এখনি না বসে পড়ে, আরো কিছু কাজ বাকি—দূর দেশে যেতে হবে—জঙ্গলে, টিলার ধারে—আমার গমনপথ ঠাকরুন-আলোয় উজ্জ্বল—আমি ধর্মদাস—আমি খুঁজে আনব শালপাতা, ঝুড়ি ঝুড়ি দ্রোণ ফুল, সর্ষে ও ইঁদুরমাটি।

১০

আমার ভিতর আজ সকাল-সকাল সে-কুকুরপ্রাণ জেগে উঠেছে, মাথা উঁচু ক'রে ঘ্রাণ নিচ্ছে, হোটেলের পিছন দিকের বারান্দার কোনা থেকে সংসারী রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে, তিন নম্বরে ভাতের ফ্যানের সুবাস উথলে উঠল, ম্যানেজারের তোলা-উনোনে বসানো দুধের কড়ার দৃশ্যটাও দেখা যাচ্ছে, দুধ আগুনে গড়িয়ে পড়ছে, কাজের মেয়েটা কি ধারে-কাছে নেই, রক্তমাখা আঁশবঁটি মাংসের ছাল-চামড়ার মধ্যে কাত হয়ে আছে—এইসব রূপ-রস-গন্ধময় হাবা পৃথিবীতে আমাদের ঢুকে পড়তে হবে, কিছুটা সতর্কভাবে, যেন কিছুই জানি না ঐ মতো ভান ক'রে, আবাসিকদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, 'তোদের মানবজনম রইল পতিত' গাইতে গাইতে—

কিন্তু কুকুর ও মানুষের স্বতন্ত্র ও অনিশ্চিত অবস্থান বুঝে নিয়ে আমি বা আমরা শেষকালে ঐ হোটেল-সংসারের ভিতর না-যাওয়াই ভালো বিবেচনায় অন্য কুকুরদের সঙ্গে স্কুলমাঠের দিকে দৌড়তে থাকি।

১১

যে-তুমি পড়ছ বসে এই লেখা, কিছু পরে উঠে যাবে, ভাববে
কেউ কি দরজা খুলে চলে গেল, এ বছর শিউলি ঝরেনি কেন,
যে-তুমি বাতিকগ্রস্ত ভেবে দেখো নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছ কিনা,
বাক্স ভেঙে, জিনিস ছড়িয়ে, গ্যাসের উনোন জ্বালিয়ে রেখে।

১২

এয়োদের গান শোনো, গাছের উপর দিয়ে ভেসে আসছে গান।
কোথায় পেয়েছে তারা এই স্বর, এই স্বপ্নসম সমবেত সুর?
জানে না অদূরে যারা অপেক্ষা করছে—সেই বৈধব্য ও অকালপ্রয়াণ
নীরবে চরকা কাটে, বুনে তোলে শ্বেত থেকে শুভ্রতর সাজ,
শবের আবৃতবস্ত্র, মানুষের শেষ পরিধান—

এয়োদের গান শোনো, গাছের উপর দিয়ে ভেসে আসছে গান।

১৩
গঙ্গার প্রবাহ আর এ-শরীরে রক্তস্রোত ছুটছে সমান্তরাল।
উনি ভাটিয়ালে কথা কন—আমারটি বলে না কিছুই।
উভয়ের গতি কি সমান? নৌকোয় শুয়ে শুয়ে ভেবেছি অনেকবার।

কিন্তু কার কাছে
জানতে চাইব? শুধু এইটুকুই বলা যায়—প্রথমটি সমুদ্রে যাচ্ছেন
আর দ্বিতীয়টি টালবাহানায়।

১৪
আমি ঐ বৃদ্ধ ও বিশাল পাখিটার পেটের ভিতর
ঢুকে যেতে চাই, আহার হিসেবে, শস্যবীজের প্রায়,
নয়ত পতঙ্গ যেন, কিন্তু নিজের অটুট চৈতন্য নিয়ে,
জাগ্রত বোধ ও বুদ্ধি নিয়ে, বুঝি ব্রহ্মাণ্ড দেখার ইচ্ছা—
সেই ভাবে তার দেহের ভিতর থেকে ঘুরে এসে,
নৈমিষারণ্যে, সন্ধ্যাসমাগমে, আসীন মুনিঋষিদের কাছে
এক ভয়ঙ্কর দেশবেড়ানোর গল্প সুষ্ঠু মতো বলে যেতে চাই।

১৫
এমন মেঘলা দিনে ইচ্ছে হয় চৌর্যাপরাধে ধরা পড়ি, পথের উল্টোদিকে,
পাটজাত সৌখিন দ্রব্যের দোকানে, চাই পতিতুণ্ডবাবুর মতো শান্ত প্রকৃতির
লোক আর দশজনের সামনে আমাকে যাচ্ছেতাই গাল দিন, আমি নাটুকে
কান্নায় ভেঙে পড়ি, বুক চাপড়াই আর আকাশে আঙুল তুলে কাগা-বগা
কাউকে দেখাই, ওঁর স্ত্রী যেন দৌড়ে আসেন, পুজো ফেলে, গীতাপাঠ ছেড়ে,
ওঁর শ্বশ্রূমাতাঠাকুরানী যদি বাড়িতে থাকেন তো ভালই এবং বুড়ো
গুরুদেব থাকলে তো আরো ভালো, ছোট মেয়েটি হয়ত দোতলায় রেলিং
থেকে ঝুঁকে দেখবে, 'এখনি পুলিশে খবর দিন'—জাতীয় উক্তিও শোনা
যাবে, আমাদের আবাসনে সজ্জন ব্যক্তির কোনো অভাব তো নেই—এটাই
প্রমাণ হবে, কেবল নোটন নামে যে লম্বা ছেলেটিকে এখানে-ওখানে দেখে
থাকি, শোনা যায় মাধ্যমিকে টুকতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়েছিল, সে হয়ত
বাঁচাতে আসবে, আসতেও পারে কিংবা নাও পারে—এইসব ভাবি।

১৬

শুয়ে আছি তো শুয়েই রয়েছি—এই ঘাসবনে।
কত কাল ধ'রে যে ঘুমাচ্ছি তার গাছপাথর নেই।
এ-অঞ্চলে বাঘভালুকের নাকি উপদ্রব আছে।
আমার ভয়ের অবশ্য কোনো কারণ ঘটেনি। সঙ্গে এনেছি
ভাল্লুক-নাচের ঘুঙুর। কাজ দেবে অসময়ে। ও কি নাচবে না?
এবং বাঘের জন্য আগুনের রিং! জ্বলন্ত বৃত্তের মধ্যে দিয়ে
সে তো নিশ্চয় লাফাতে চাইবে—এধার ওধার।

১৭

লেগেছে চাঁদের গায়ে চাঁদ নয়—এক টুকরো পাখিডানা।
পাখি যাচ্ছিল পুব থেকে পশ্চিম আকাশে।
পথে এই অঘটন।

আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিনি। কাছারি বাড়ির দোতলায়,
বারান্দা-ঘরে, জানলা বন্ধ ক'রে, ঘুমাচ্ছি সেদিন। খড়খড়ি তুলে
শেষ রাতে নায়েব জানিয়ে গেল। সে-ও বটে বহুকাল গত।

১৮

ঘুম আর মোমিনপুরের মাঝামাঝি একটুকরো বারান্দা রয়েছে।
দুধ আর চা-পাতা রয়েছে—কেউ কেটলিটা বসিয়ে দেবে কি?
ফুটন্ত জলের শব্দে উঠে পড়ব—মানুষজনের গানে—
কাগজের নৌকাগুলি এইদিকে ভেসে আসছে।
        কোনো এক বিখ্যাত লোকের মৃত্যুদিন আজ।

১৯

দেশলাই কিনতে গেছি দেখি গ্রাম লাল মেঘে ছেয়ে গেল।
সেইসব পুরনো দিনের নক্সা, অস্থির, ডানামেলা—আকাশে উড়ছে।
যদিও ওদের সকলকে চেনা যায় কেউ কেউ তত স্পষ্ট নয়,
ঐ কি অনুর মুখ, সত্যেনের, হাতকাটা দেবু কুশারীর?
ঐ কি বনানী যার ছোট ভাই চিৎকার করল—
    সরে যাও, সরে যাও, হাই রোডে পুলিশ নেমেছে।

২০

থেকে গেল রাঢ়বঙ্গের এই ঢাল, এই ডাঙা ডমি, পড়ে রইল
যোগিনীর পথে পথে ঘোরার পাদুকা—
ছেঁড়া কিছু অঙ্গবস্ত্র, খঞ্জনি ও পিতলঘুঙুর,
জলের পাত্র আর মাটির থালাটি বাইরেই তোলা রইল—
হ্যাঁ, একটা বস্তামতো থলির ভিতরে তেলচিটে বালিশ-চাদর
পাওয়া গেছে এবং মেডেল এক, নামহীন, হয়ত রুপোর,
ময়লায় কালো ও বিকৃত—এইসব সৌন্দর্যের মধ্যে তার
শবদেহ পাওয়া গেছে, বয়েস অনেক, পাশ ফিরে শুয়ে ছিল,
ভ্রূণভঙ্গি নিয়ে, পা গুটিয়ে, হাতের আঙুল মুখেতে পোরা—

যেন মায়ের পেটের মধ্যে অনন্ত সাগরে ভাসছে।

২১

বায়ু আন্দোলিত
অতি তরল জল
নলিনীদলগত
কপোতচক্ষু মতো
লোহিতচঞ্চল

ঘনমেঘাবৃত
গাছে অন্ধকার ফল
দামিনীপ্রভাবিত

স্তব্ধ কোলাহল

শস্যসমাহিত
বৃষ্টি অঝোর সরল
জলমায়াশ্রিত
মাছ ধৃত ও খণ্ডিত
ক্ষুধার্তি প্রবল

বহ্নিপ্রধূমিত
পাক বাঞ্ছাকোমল
রেচকবাহিত
নিদ্রা বারিঅধ্যুষিত
স্বপ্নপিছল

হোথা আলোকিত
দূর উপকূলতল
রৌপ্যবিম্বিত
শত তরণীবাহিত
মীন শ্রাবণফসল।

২২
কেন লেখা থেমে যায়? কেন আমি লিখতেই থাকি না?
যতদিন দোয়াতে রয়েছে কালি,
ঐ শালগাছ থেকে যতদিন শুকনো পাতা উড়ে আসছে,
ঘরে ও বারান্দায়—স্বচ্ছন্দে তাদেরই উপরে লিখি
কিন্তু কত না সহজে, যেন না লিখলেও চলে,
শালগাছ আরো পাতা ঢেলে দেয়, উঠি না আসন ছেড়ে,
কত গান লেখা বাকি, কবিতা তো লিখবই—

হঠাৎ কী যেন হয়, ভাবি যাই একটু জলটল খেয়ে আসি,
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, হাটে-বাজারে ঘুরি ফিরি,

অন্য জেলায় চলে গেছি—

শালগাছ ততদিনে সবুজ পাতায় ভরে ওঠে। ওসব পাতায় কি
আর লেখা যাবে! যতদিন তারা না বিবর্ণ হচ্ছে,
ঝরে পড়ছে, ততদিন লেখা চুপ। ততদিন চারিদিকে
পাতার মর্মর।

মীনযুদ্ধ

১
শূন্য বোতলের কাছে চুপ ক'রে বসে থাকি।

মনে হয় এখানে-ওখানে বেড়াল ডাকছে।

জালিম লোশন লেখা হ্যাণ্ডবিলখানি কিছুটা পড়েছি।

সকালের কাগজ আসেনি।

বাড়ির মেয়েরা শয্যাতুলুনি ব'লে দু-শ টাকা আদায়
করেছে। নতুন জামাই খুশি মনে হাসছে দেখছি।

সূর্য কেতুর ঘরে। মীন সরে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

২
দুরাকাঙ্ক্ষা, শৌভিক, একটি রঙিন জট, লাল-নীল
সুতোয় জড়ানো, তোমার নিজের বিকলাঙ্গ ছোট বোনটি
জীবিত থাকলে সহজেই তাকে বলা যেত : ওগো, জট
খুলে দাও—সে তো কোথাও যেত না, তুমি
না সঙ্গে নিলে—শীতগ্রীষ্ম মাদুরেই বসে থাকত,
শুয়ে থাকত, সহিষ্ণুতা নামে এক ছেলেপুতুলের
সঙ্গে বিচক্ষণতা নাম্নী এক মেয়েপুতুলের বিয়ে দিয়েছিল,
আমরা গুজিয়া ব'লে সন্দেশজাতীয় মিষ্টি
সে-উৎসবে খেয়েছিলাম।

৩
মাংসখণ্ড মুখে নিয়ে কেমন সুন্দর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঘা,
সাঁকো পার হতে গিয়ে নিজেই নিজের ছবি দেখছে,
ভাবছে আরেকটি কুকুর যেন (ঠিক ঐ মতো) মাংসখণ্ড
মুখে নিয়ে জলে ভাসছে—

তার ঊর্ধ্বে আমি (যে বাকি গল্প জানে) সিগারেট টানছি
আর ঝুঁকে পড়ে বইয়ের ছবিটা দেখছি—

তার আরেকটু উপরে, চিন্তিত পাঠক, তুমি, যে সিগারেট টানছ
আর বেশ তাড়াতাড়ি এই ছোট্ট লেখাটা পড়ে ফেললে,
ভাবছ—আরেকবার প্রথম থেকে পড়ে দেখা যাক,
বাংলা কবিতার হল-টা কী?

৪
আলোক ও আলোপাতার চোখরাঙানি,

রেখদেউলের প্রতি ভালোবাসা ছিল ও থাকবে,

ভোরের দয়েলপাখি—বাক্যবন্ধটি পাঠে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হবেন,

রাখী রায়কে শেষ হাওড়া স্টেশনে তার কাকা দেখেছিল,

কলকাতা ক'য়ের অনুষ্ঠান যান্ত্রিক গোলযোগে বিকল,

মেসবাড়ির দরজার চাবিটা হারিয়ে গেছে,

ফলে সদর বন্ধ এবং ঠিকে ঝি-রা ফেরত যাওয়ায়
কলতলায় রাতের এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে,

চায়ের ব্যবস্থাটা অন্তত ক'রে ফেলুন--দোতলায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে
নইলে আমরা বাথরুমে যেতে পারছি না।

৫
জেগে উঠব ফলের খামারে—আপেল, আঙুর ক্ষেতে।
ডেকে ডেকে সকলকে প্রশ্ন করব কেন শুধু
সত্যেরই জয় হবে, মিথ্যার নয়?

এই দেশে ও-প্রশ্নের জবাব পাবো না। সেরকম মনে হচ্ছে।

রাজপুরুষের ছায়া লম্বা হয়ে দেয়ালে পড়েছে।

দরজায় কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে—ভেবে হুড়কো নামিয়ে দেখি
পাড়ার পিয়ন আমাকেই খুঁজছেন,
বললেন—নুরপুর থেকে আপনার একটা রেজিস্ট্রি এসেছে,
ভুল ঠিকানায়, দিতে অনর্থক দেরি হল,
কোথায় থাকেন মশায় সারাদিন?

৬

খেলা ভালো লাগে।

যখন যা-নিয়ে খেলি তারই মোহে পড়ে যাই।
কী গভীর সেই টান তাকি আমি বোঝাতে পারব?
একদিন গান গাইতাম আর দূর দূর থেকে যারা
উড়ে আসত তারা কত খুশি হত—
বয়ে আনত ফুলের পরাগ আর জঙ্গলের মধু
—খেলা ছিল—
বিশ্বাস না যদি হয় জেনে নাও, জিজ্ঞেস করো,
ঐ তো দেয়ালে ঝুলছে ওরা
ফ্রেমে বাঁধা, পিন-য়ে গাঁথা, কাচের আড়ালে।

৭

ব্যবহৃত খাম। আমি তার পিঠের ওদিকে
সামান্য কয়েক ছত্র লেখার মতো
স্থান পেয়ে যাই—আঁকিবুকি কিছুটা টেনেছি,
তবু ফাঁক থাকে, যত লিখি ততই শূন্যতা জন্মে,
ভেসে ওঠে গ্রীষ্মের কোলিয়ারি—
সখা-মরীচিকা, দুপুরের তাপে ঝলোমলো
তৃষ্ণা ও তৃষিতের মাঝামাঝি
এত সব লেখালেখি কেন টেনে আনো?

৮

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। তারপর উঠে যাব। এই ভেবে বসেছি পাথরে। শুনি, উপরের গাছটি আমাকে এখানেই থাকতে বলছে। ঢেলে দিচ্ছে প্রাণবায়ু, গ্রীষ্ম-সকালের ছায়া। আমি যা বর্জন করেছি সে-প্রশ্বাস নিজেই শোধন করছে। রাঙা ফল খেতে বলছে। বল্কলের জামা দিতে চায়। বলে, তুমি আকাশেও উড়ে যেতে পারো—কিন্তু তোমরা

তো জানো, আমি এক চতুর মানুষ এবং আমার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নাই। আমি, ওর কথা, শুনে চলব কেন?

৯

ঐ যে পড়েছে ভুঁয়ে যূথী, জাতি, তাপিত টগর—দীর্ঘ নিদাঘ শেষে, গত বিকেলের ঝড়ে, সকলেই নিজ নিজ ইতিহাসে গরীয়ান, যেন-বা লৌকিক গানে, নয়ত পয়ারে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে অথবা কীর্তিতেই বাস করবে এমন প্রমাদে—কিন্তু ঝড় হল, এই আরণ্যক গ্রন্থাগার আজ আদিগন্ত তোলপাড়, আমি যে-বইটি চাইছি সেটি খুঁজে পেতে দেরি হবে, অন্তত কিছুকাল অপেক্ষা তো করতে হবেই—মালিনী বলেছে।

১০

যতই বয়েস বাড়ে ততই গোপন কথা জমে ওঠে।

গাড়িবারান্দার ছাদে ছোটদের ভিড়। নীচ দিয়ে
শোভাযাত্রা যাবে তাই দেখতে এসেছে। একদিন এই পথে
গিয়েছিল বটে ধর্মীয় মিছিল আর সভা শেষে
হাজার মানুষ। ইদানীং এ-অঞ্চলে নির্জনতা বেড়েছে দেখছি।
তবু দুপুরের দিকে দু-একজন ফুটপাতে জল থালা নিয়ে বসে,
ছাতু মেখে খায়, নিমপাতা উড়ে এসে তাদের খাদ্যে পড়ে,
কেউ কেউ দাঁতে কাটে আর অন্যরা নীরবে হাসে—

আমিও অনেক কিছু জানি আর হাসি পায়। কিন্তু
সে-সব কথা কাউকে কি বলা যাবে? যতদিন না পারছি
ততদিন ঝুলে থাকি, একা একা, ফ্যান থেকে, শাড়ির বাঁধনে।

১১

সহজে এসেছে মৃত্যু, প্রায় বেড়ালের মতো, চট ক'রে
পর্দার আড়ালে সরে গেছে, তাক বেয়ে কিছুটা উঠেছে,
কোনাকুনি মেঝে পার হল, নির্ভয়ে, যেন এটাই তো
স্বাভাবিক, হয়ত হেঁসেলে ঢুকবে, রোগীর শিয়রে যাবে তারপর,
এমতাবস্থায় আমাদের কাজের মেয়েটি ঝাঁটা হাতে তার মুখোমুখি,
'দাঁড়া তো রে, মরণ আমার'—এই ক্ষিপ্ত সম্ভাষণে
দক্ষিণের জানলা দিয়ে দুজনই উড়ে যেতে দেখি—

প্রায় ওড়া, প্রায় বেড়ালের হাসি, প্রায় রোগমুক্তি যেন।

১২

তুমি তো হে বাঘ নও—শুধু বাঘের চামড়া—হায় সুধাকান্ত
সিংহের হাল্কা লেদার চটি—পুরনো দিনের—প্রায় শ'খানেক
বছরের পুরনো—তার লোমে লোমে ঘুরছে ও পাক খাচ্ছে
একালের পোকামাকড়, উকুন ও চ্যাপ্টা কীট—এই নাকি
বাঘ, হ্যাঁ—তারা হাসাহাসি করছে ও বাবুকেই গাল দিচ্ছে—
মেয়ে পোকারাও বলছে যেমন বাঘ তার তেমন সিংগি—আমাদের
হাসি পাওয়া দরকার কিন্তু ভয় হয়, রাত্রে ঘুমাতে পারি না—
শুধু কীটনাশকের শিশিটাই কিছুটা স্বস্তি আনে—শ্মশানবৈরাগ্য
নিয়ে কোনো ভাবে, দূরে দূরে বেঁচে আছি।

১৩

আরে, তুমি নাকি অগঠিত? তাহলে এখনি
যে-কোনো প্রকার মানব বা মানবীরূপে অবতীর্ণ হও।

এই যে বনের পথ একি গান ভালোবাসে?
তাহলে সংগীত হও—কণিকার গানের মাস্টার হও।

সমস্ত আকাশ জুড়ে উড়ে আসে মেঘ, তার অগঠন।
কিছুই হবে না জানি। কিছু তার হয়ে-ওঠা দূরপরাহত।

শুধু বৃষ্টি পড়ে। সেই রূপে চারদিক ধুইয়ে দিচ্ছে।

১৪

ও তমাল গাছ, ওগো বায়ুসেনাদল, দ্যাখো আমি
পিঁপড়ের ডিমের সন্ধানে একদূর এসে গেছি। এসে অস্থির হয়েছি।

কোথাও সিংহ বিচরণ করছে। কোথাও তোড়াবাঁধা ফুল ঝরে পড়ছে।

ওগুলি এবারের মরসুমে অবিক্রিত রয়ে গেল।

অথচ সামনে তো আরও অনেক বিয়ের তারিখ ঝুলছে।

বিয়ের পুরিয়া কেনার ঝলমলে সময়ে তাহলে এমনটাই হয়ে থাকে।
আমি যে-কোনও উৎসবের জন্য প্রস্তুত।

অবহেলায় পড়ে রয়েছে মাস-মাইনে খরচ করে কেনা হুইলসুতো,
ভাঁজ-করা আসন আর মাছের থলিটা—

যে তমাল গাছের ছায়ায় সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থাকব ভেবেছিলাম
তারই ডালপালার ফাঁক দিয়ে উড়ছে বোমারু বিমান—
নীচে সিংহ যাতায়াতের পথ আর আমার অস্থিরতা।

বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে

ভূমিকা

কত গল্পে নেমে গেছি—কত না গাথায়—
ভাঙা ধ্বস্ত সিঁড়ি বেয়ে, দু-চার ধাপ টপকে গেছি,
পড়তে পড়তে বেঁচে যাই, ঐ ভাবে বোকার মতন বাঁচি—
মহাভারতের মাঠে, হোমরের উপকূলে, এজিদ-কান্তারে, দেখি
যুদ্ধ শুরু হল, শেষ হল, নায়ক নিহত, রাজ্য শ্মশান—
প্রতি গল্প বিশ্বরূপ, মাথামুণ্ডু না বুঝেই কাঁদি,
হায়, অবিদ্যায় ঢাকা থাকল ঋজু পাঠ—যেন তারা
হিমের কুটুম, ঐ অস্বচ্ছ মানুষজন, গাছপালা, রণক্ষেত্র—
কেন, এর বেশি, সবটা বুঝিনি?

১
রেখেছ রঙিন পাতা, শব্দটুকু রঙিনে রেখেছ—
সাপের চলার পথ।

মাথার উপরে সূর্য, নীলকান্ত, সকলেই হারানো শিশুকে
তার নিজের বাড়ির কথা প্রশ্ন করে, নাম বলো, বাপ-মা কোথায়,
কোথায় নিজের দেশ,
জানে না সে কার সঙ্গে এখানে এসেছে—
শুধু মনে পড়ে সাপের চলার শব্দ
জন্মাবধি। শুধু এটুকুই মনে আছে। বর্ণময়, তা-ও সে ভোলেনি।
বাকি সব অবান্তর, অন্ধকার, পরম্পরাচ্যুত।

২
শুষ্কনয়ান বোধে
হাত দিয়ে চোখে
দেখি, ও মা—
এ যে জলে ভেসে যায়।

এই তবে অক্ষরহীনতা—
পাঠরোধ, ভুল লেখাপড়া,
স্কুলভীতি, আতঙ্ক বিজ্ঞান,
বিফল গণিত।

গল্পে ও নক্ষত্রে কীর্ণ
আজ এক মহাজাগতিক ত্বক—প্রসারিত—স্পর্শাতুর
সেকি চায় কেউ এসে চুলটা আঁচড়ে দিক?
তাই জেগে আছে মাতৃভাষা

আর অতি দীন কাঠের চিরুনি আর
স্নানশেষে এক মাথা ভিজে চুল—
বাংলা ভাষাই এসে গল্প বলে,
মুখ আদরে মোছায়, সিঁথি কেটে দেয়।

৩
ওড়ে হাল্কা মেঘের দিন, যেন প্রেম, যেন খতিয়ান।

চিন্তার জাল আমি গুটিয়ে নিয়েছি।
দৃষ্টির জালখানি রৌদ্রে শুকায়।

যারা গান গেয়ে থাকে তারা কই এখনও এল না?

এ-জীবন ক্ষতদের, এ-জীবন রক্তগ্রন্থির।

আরেকটু সময় দাও, আর কয়েক মিনিট।
কতদিন সমুদ্রে নামিনি।

৪
এখন আমার কোনো দায় নেই। শুধু লেখার খাতাটি নিয়ে
সমুদ্র ও বনের দিকে চলে-যাওয়া ছাড়া। ঢেউ গোনা ছাড়া কোনো
দরকারি কাজ নেই। নির্জনতা আছে।

প্রকৃতির বিমূঢ় কারণে জল ক্রমে বাষ্প হয়। শীত ফিরে
আসে। জটার বিনুনি খুলে চুল ক্রমে আকাশে ছড়ায়।
যেন সন্ধ্যা হয়। যেন নীরবতা।

শুনেছি মানুষজন পাখি দেখে মাঠের আড়ালে
ওড়াউড়ি করে থাকে। শূন্য থেকে লাফ দেয়। আবার গাছেও চড়ে।
ফল-মূলে ঠোকরায়।

আমার সাশ্রয় এই সৈকত মাপবার যন্ত্রখানি---এই খাতা---এই বোঝাপড়া।

৫
শুন কন্যা, এ-আখ্যান আরবদেশের—
যুগপৎ ভ্রমণ ও বিলাস গল্প,
নীল অববাহিকার তৃণ ও ত্যাগের গান।

এ-সংসার মাটির জ্যামিতি,
জলে-ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত—পরিখায়
ভাসমাস প্রেতশিলা।

চাই উর্ধ্ব-অধে. যত শ্বাস নিই
ততই দূরত্ব বাড়ে, বাড়ে ক্ষোভ, বাড়ে ভৌগোলিক নাশকতা,
দুই-তিন ক্রোশ জুড়ে চার-পাঁচ গ্রহের দূরত্ব।

আরো বলি : এ-বছর শস্যের বাজারে
আমি শেখাতে এসেছি গান, ধর্ম ও অর্ধমের নীতিকথা,
নতুন উপায়ে পশুবধ।

ডুবন্ত সূর্যকে কেউ আড়ালে রেখেছে—আগুনে পুড়িয়ে
ধাতু ও চামড়া স্বচ্ছ করেছে ওরা;
এবারের বাদ্যযন্ত্র অভিনব—সুরবালা অন্য প্রদেশের
সুরধুনী ভারতবর্ষের।

৬
থামাও, থামাও ওকে, ও যে দৌড়েই চলেছে।

চাঁদ পাড়ো, চাঁদ খাই। ওগো রাত্রিওলা, এ-ভাবে যাবে কি দিন?
দিন মানে আয়ু ও বছরকাল।

যে-অর্থে গ্রীষ্মতাপ গায়ে লাগে, সেই মতো
মৃত্যুসংবাদ এসে আড়ছিয়ে পড়ে এই দেহে, এই স্নায়ুপ্রসারণে।

কী হবে নক্ষত্র চিনে? কী হবে ওদের সঙ্কেতচিহ্ন পাঠে?

বরং ভাবনা হল যে-ভাবে রাঁধলে এই অতুলনীয় পদগুলি
মুহূর্তকালের মধ্যে।
খাবার আসনে বসে, স্তব্ধ হয়ে, ভাবি
আর খেতে যেন মনই ওঠে না।

৭

ভোরবেলাকার গানে কে আর জাগবে বলো?

ডাকি নিরুপায় হয়ে—ও সুন্দর, কিছু একটা বিহিত তো করো।

লতায় পাতায় জড়ানো এই সীমান্ত-রেলের টাইমটেবিল।
কোথায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম। লিখে রাখি।

প্রতিমা, তক্ষণশিল্প, ঐ ঊর্ধ্বে শকুন উড়ছে,
বেলা পড়ে আসে বিদায়বেলার রোদে।

৮

ক্ষুব্ধ জল। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।
বলেছি, 'তোমাকে শান্ত করার মন্ত্র আমিই জানি—
আর কেউ নয়।'

জল শান্ত হয়েছে। সে আমাকে চেনে।
আমি রাজু। কাশজঙ্গলের ছেলে। হস্টেলে কাজ করি।
ফাই-ফরমাস খাটি। বেশি কথা বলি।

৯

যে-সৌন্দর্য অবলুপ্ত তাকে আমি যত্রতত্র দেখি।
সে-ও হাত পেতে ভিক্ষে করছে আর দশটা ভিখিরির মতো।
উৎসব-বাড়ির উচ্ছিষ্টের ভাগ চাইছে কুকুরের কাছে,
অনেক, অনেক রাত্রে তাকে আমি উড়াল পুলের নীচে শুয়ে থাকতে দেখি,
দোকানের সিঁড়িতেও বসে থাকে কখনো কখনো—
'তোমাকে চিনেছি'--বলি আমি : 'তুমি সুরসুন্দরীদের একজন,
শেষ দেখা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, দেব নরসিংহদেবের
পাথর-খাদানে, কোণার্কের ধারেপাশে? 'এবার অন্ধ হও'—
সে আমাকে উপদেশ দেয়।

১০

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সবুজ জবার সঙ্গে দেখা হয়।
'আমাকে মনে কি পড়ে, আমি রমণীবাবুর রেল-কোয়ার্টারে
ফুটে থাকি?' তারপর ম্যাগনোলিয়া নামে অদ্ভুতদর্শন এক
ফুল এসে প্রশ্ন করে 'আমাকে নিশ্চয়ই মনে পড়বে, আমি
পাহাড়ের সানুদেশে ফুটেছিলাম, অল্প গন্ধ ছিল।' তারপর
সেগুনমঞ্জরী, সে-ও ম্লান হেসে প্রশ্ন করে 'আমি হয়ত সঠিক
ফুল নই, তবু জানি আমাকে ভোলোনি?' এইভাবে একে একে
প্রশ্নোত্তর পার হলে, পাশ হলে, ডিগ্রি পাবে কাগজসমেত,
তাতে টানা টানা অক্ষরে লেখা থাকে ইনি যথার্থই মৃত;
নীচে হিজিবিজি সইসহ ছাপ থাকে সরকারি পরিদর্শকের।

১১

কত কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। প্রায় প্রতিটি কর্মই
ভেঙে টুকরো হয়ে গেল এই হাতে—মাটির বাসন যেন,
সূচ পড়ে রইল সুতোহীন, কর্কট মাংসপিণ্ড ঝুলে থাকল,
সাঁই, এ-হাড়ে বাতাস লাগছে—যাকে বলে মলয়পবন,
ও-পাহাড় নীলগিরি, ট্রেন দক্ষিণবাহিনী—বালুবর্তে
খরগোস ছানার মতো সারিবদ্ধ, ধীরগতি, কিন্তু আমাকে তো
দ্রুত এগিয়ে যেতেই হবে—রিক্সা ও গ্রামের বাস পিছু ফেলে
উড়ে যেতে হবে বিমানপুঞ্জের আগে, সব কিছু ভেঙে খণ্ড হয়ে,
ধুলো হয়ে, মিলিয়ে যাবার বহু আগে আমাকে তো পৌঁছে যেতে হবে
সেই দেশে যেখানে সকলে অটুট থাকি, সব সুরক্ষিত থাকে—শত শত
যাদুঘরে, নানা নিলামবাজারে, বহু সংগ্রহউদ্যানে।

১২

পদ্মপাতা উল্টে যাচ্ছে জলে।
তুমি আমার অধিক-কথা-বলা
মায়ের মতো নেমেছ পল্বলে—
সারা জগৎ তোমার কথাই বলে।

উৎকেন্দ্রিক কাব্যে যাবে পাওয়া
পুকুরঘাট, ভিজে বনের তলা,
দুপুরবেলার ব্যবস্থাহীন খাওয়া,
পদ্মসায়র উল্টে-দেওয়া হাওয়া।

মহাজীবন, তুমি ওদের খাতা
ওই পিঁপড়েদের, পতঙ্গদের চলা,
পায়ের ছাপে ভরিয়ে-তোলা পাতা—
মলমূত্রের বিন্দুবিসর্গতা।

আজ বৃষ্টিজলে ধুয়ে যাচ্ছে বন.
শুনতে পাই মানুষজনের গলা—
আকাশজুড়ে মেঘের গর্জন,
স্মরণাতীত, তুমি আমার স্মরণ।

১৩

লাটুবাবু এয়েচেন, সাঁটুবাবু এয়েচেন, কুমারবাবু বিন্ধ্যেশ্বরীজির সঙ্গে এই ফাঁকে দুটো কথা কয়ে নিচ্ছেন—হাঁ, সেই কেসটার কী হল, এখনও লোকে মনে রেখেছে দেখছি, ছায়ানট, সুরফাক্তা, ইধার কা মাল উধার, ঝাড়-সাফাইওয়ালার বৈকালিক আবদার সাবুন দিজিয়ে, মেরা লাল, ফিনাইল লাগাও আর গন্দা উঠাও, বাতব্যাধি, কলুষকামড়, বাংলা কবিতায়োঁ কি অন্দর মে, তুমি যা চাইছো তা তো পাবেক নাই, তবলচির গালে ঠোনা মেরে নৌটাঙ্গি বলছে আ মরণ, কে যেন বলেছিল তার কবিতা সর্বত্রগামী হয়নিকো, ম্যাস্টার পুরনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করছেন বাবুর নামটা কী হচ্ছে, দুয়ারে বাঁধা হাতি, থোড় চিবুচ্ছে, সবাই কার-য়ে এয়েচেন, কেবল দুলারী মাই গজবাহনে, কুকুর ডাকছে, জলসা শুরু হতে হতে সেই মাঝরাত্তির।

১৪

রক্তসমুদ্র থেকে মেঘরূপী জল উঠে আসে। বৃষ্টি হয়। বাষ্প হয়। তারা বলে—'তোমায় চিনেছি। তুমি অগ্নি ও মৃত্তিকার সহোদর। প্রায় আমাদেরই মতো তবে নষ্টনিধি আবাসিক। দুরারোগ্য অসুখে ভুগছো।' 'আমার তাহলে উপায় কী হতে পারে'—আমি জানতে চেয়েছি। 'এই কবচ ধারণ করো'—বলে তারা আমার বাহুতে যে বস্তুটি বেঁধে যায় তাতে সহজ বাংলা লেখা। লেখা আছে—'হে সত্যবাদিন, ওগো মরুভূমি, তুমি পুরস্কৃত হতে থাকো, মান্য হও, লোকে তোমাকে দেখেই আসন এগিয়ে দিক, বলুক নৈশভোজে যোগ দিতে; এই পৃথিবীতে, এই জলবায়ুমৃত্তিকায় ওতপ্রোত কুৎসিত প্রাণীর মতো তুমি থেকে যাও, বংশবৃদ্ধি করো।

১৫
এ-বছর শুনিনি শূদ্রের গান, শুনিনিকো পশুচারণের গীত
অথচ ওদেব পিছু পিছু হেঁটে গেছি, রাজমহলের দিকে, গঙ্গার অববাহিকায়
পাথর কেটেছে ওরা, লোম দিয়ে কম্বল বুনেছে
মুখে কাপাশের পাটি, সাদা ধুলো শরীরে মেখেছে--ভেবেছি, তবে কি
ওরা আমাকেই গাইতে বলছে। কী হবে আমার গানে—
এই বধিরের গানে, এই বোকা আমিত্বের গানে
প্রচেষ্টাই হাস্যকর—মাঝে মাঝে, বলা ভাল, হাততালি পেয়ে থাকি,
সে অবশ্য দেহবিকৃতির জন্য, জড় উচ্চারণ হেতু।

১৬
কোথাও নেমেছে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে কোতোয়ালি থানার গভীরে।
আর কি ফিরতে পারব পথে পথে মূঢ় মানবজন্মের
কানা গান গেয়ে?

ঐ রেলগুমটির ঘর, ঐ লোকোশেড, ঐ রুটি-কারখানার ছাদ
আমাকে ভাবায়—

যতদূর সম্ভব পরিত্যক্ত হয়ে থাকি।
একদা ছিলাম।

খিলান, জগতগ্রন্থি, মা-হারা মাতাল যেন ধায় ছিন্নবেশে,
শেয়াল, উজানসিন্ধু, তাহলে বাসায় ফিরি, আমি নাগরিক,
ক্ষতচিহ্নবহ বীর অফিস-ফেরত—

তুমি সত্যিকথা--তাই তোমাকেই এত সব বলি।

১৭
পেয়েছ মানবজন্ম। অন্য কিছু হলেও তো হতে পারতে।
এই ধরো আমার মতন পাকচক্রে জায়ফল, হলুদ ও ধনেবাটা,
কাসুন্দি ও ফুলবড়ি—এই কবিতার স্তবকের ফাঁকে ফাঁকে ঝর্নার
জলপতনের শব্দ।

পেয়েছ মানবজন্ম। কুকুরছানাও হতে পারতে। শীতরাতে
তোলা-উনোনের পাশে শুয়ে থাকতে, কোন্ ভোরে বেরিয়ে আসতে,
গা ফুলিয়ে ছাই ঝাড়তে—বুঝি আমিই আগুন, তাপ,
কেরোসিন, ফুঁ দেবার বাঁশের সরল শাখা, একনিষ্ঠ, মূক ও কর্মঠ।

পেয়েছ মানবজন্ম। বশিষ্ঠের কাছাকাছি অরুন্ধতী হতে পারতে।
সপ্ত কবিদের থেকে ব্যবধানে, দাওয়ার সুদূর প্রান্তে তারার আলোয়
বসে-থাকা বেদেনীর শিশু যেন—গৃহহীন, উলঙ্গ, অবোধ।
অন্তত আমার মতো ভাঙা কুলো হতে পারতে—পরিচ্ছন্নতার ভূত।

পেয়েছ মানবজন্ম। পেলে প্রেমসুধাসিন্ধু থেকে এক আঁজলা জল।
ক্রোধরত্নমালা থেকে ছিঁড়ে-পড়া দ্যুতিময় মাণিক্য কঠিন।
কিছু লেখাপড়া ভ্রষ্ট হয়েছে, কিছু লিপিকুশলতা—ওগো ভ্রাম্যমাণ,
কেন হলে না আমার মতো হিমালয়ে উদাসীন, সাগরেও সমান হতাশ?

শুধু মানুষই মানুষকে ধন্যবাদ দেয়। কৃতজ্ঞতাবোধে তার দুই চোখ
জলে ভরে ওঠে। তারা ইহলোক সৌন্দর্যে কাটায়—ব্যয়ে ও অর্জনে।
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর নামকরণেই কত কাল নষ্ট করে। বলে :
'এদের জেনেছি'। আমরা, বাইরে যারা, অতি কষ্টে হাসি চেপে থাকি।

১৮
যাই, শিহরিত ছত্রাক তোমার, যে পথ নির্দেশ করে
সেই পথে যাই

জলে নেমে মাছেদের গায়ে ধাক্কা লাগে, দ্রুত উঠে আসি—

শৈবাল স্রোতের দিক নির্দেশ দেয়, গুণটানা মানুষের
ক্ষয়ক্ষতি নৌকাবাহিত—

ঘুমাও, ঘুমাও, পুত্র : মাঝি গান গায়।
আমি জলভীতু, জলে প্রেতের নিবাস,
প্রেতমাছ, পাড় থেকে নমস্কার করি, বাঁশ নাড়ি
—এই বিবেচনা।

১৯

সুন্দর আমাকে যদি ভুল বোঝে আমি তার কী করতে পারি?

শুষ্ক গাছ, তার নীচে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে থাকি—
টিকিটঘরের দিকে আজকাল কেউ আর যেতে চাইছে না,
এখানেই পয়সা নিই, লাল-নীল কুপন এগিয়ে দিই,
কেউ সযত্নে পকেটে রাখে, দু-একজন ছুঁড়ে ফ্যালে জলে,
এইভাবে উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণের দিকে—
নক্ষত্রের দেশে আর সূর্যের খামারে
মানুষ বেড়াতে যায়, ছেলেপুলে নিয়ে, কেউ কেউ বাবা-মাকে সঙ্গে নেয়।

২০

রাত্রে যখন তুমি
চাদর জড়িয়ে, বালিশে মাথা রেখে, জ্বরের ঘোরে
ওষুধে ঘুমিয়ে পড়লে—
তখন একটা উল্কা তীরের মতো ছুটে এল
আকাশের একদিক থেকে,
তারপর মিলিয়ে গেল
ঐ বহুতল বাড়ির আড়ালে;
এখন তুমিও চাদর টেনে, গলা ঢেকে
আরো কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারো,
কিছুটা সময় আমিও মাথার কাছে চুপচাপ বসে থাকতে পারি।

২১

এই দীর্ঘ গ্রীষ্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি
এবার সীমান্তচৌকি পার হতে হবে।
এমন কিছু কি আছে যা আমাকে অন্যে দেয়নি
—জামা, জুতো, তাসের প্যাকেট,
জাল কুপনের গোছা,
এমনকি টিকিটবাবুর কালো কোট, যদিও পুরনো,
তালপুকুরের জল ফেলে-দেওয়া প্ল্যাস্টিক বোতলে।

এই দীর্ঘ গ্রীষ্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি—
দূর থেকে ভেসে আসা গান ভালো লাগে,
কাছ থেকে নয়।
যা অন্যের পরিত্যক্ত, প্রয়োজনহীন, অন্তঃসারশূন্যতা যাদের
মহীয়ান করে থাকে—তাদেরই ছায়ায় বসি, শুয়ে থাকি, শ্বাস নিই,
মাঝে মাঝে দূর দেশে যাই বটে,
তবে সে তো তাৎক্ষণিক দেশ-দেশান্তর।

২২

পরমা, আহত-গতি, ছিন্ন মিথ্যা ও প্রত্যয়ে
উদার গম্ভীর খাদ্যে, উচ্ছিষ্টে ও জয়পরাজয়ে—
কিছু ছিল পথচলা, কিছু ছিল বনস্থলী রীতি;
ধানুকীর ধৈর্যহীন নিকষ আকৃতি
সহসা চিত্র পায় যেন এক গাছের উড়ানে
পাখিদের পিছু পিছু—গাছ ওড়ে পাখির বাঁধনে
জালসুদ্ধ, লতাসুদ্ধ, এমন কি প্রকৃতিও ওড়ে
সামুদ্রিক, ভূতে-পাওয়া, মরুচর উড়ন্ত অক্ষরে,

বাংলা কবিতা ওরা নীল নভে ভাসমান থাকে--
অবাক শবর তুমি, ভাষা পরিত্যাগ করেছে তোমাকে।

অ গ্র ন্থি ত ক বি তা

স্মরণ, সন্দীপন

উড়ে যাও গভীর উদ্যানে, উপবনে, নদীর কিনারে,
যেন সৃষ্টিছাড়া প্রাণ, মানুষের, গবাদি পশুর,
কীটপতঙ্গের ছায়া, যারা সদ্য উড়তে শিখেছে,
যারা মূক ও বিমূঢ়, যারা অনায়াসে উড্ডীয়মান
হতে পারত বহুদিন—ধু ধু সন্দেহে কেঁপেছে
বুঝি পড়ে যাব, বুঝি ভেঙে যাবে মাথা ও বুকের জোড়,
গায়ে যদি মেঘ লাগে, যদি ভিজে যাই,
এই সব ভাবতে ভাবতে তারা শীতার্ত হয়েছে—

মৃত্যুর পরে আর উড়ে যেতে বিঘ্ন কোথায়?
বিশাল আকাশ আছে, আছে নীল রৌদ্ররেখা বিষুবের,
আছে স্থাপত্য ও রাজপুরুষের মূর্তি, অঙ্গুলিনির্দেশকারী,
স্তম্ভিত মরণ, ঐ দিকে যাওয়া যেতে পারে, ঐ সম্ভাবনা
নতুন বিহগ-পথ খুলে দেয় যা আসলে আকৃতির,
আহ্লাদের, পুনরুজ্জীবনের।

বারাণসী

তাঁর আঁকা ছবির সামনে চুপচাপ বসে থাকি, দেখি ভাঙছে
বারাণসী, দেখি নদী, তার ঘাট মণিকর্ণিকার, দেখি ছায়াচ্ছন্ন
মানুষের আকারপ্রকার, জলে স্নানেও নামেনি কেউ, যা অসম্ভব
মনে হয়, তাহলে কি ছবির আড়ালে নিভৃত বার্তা আছে ধ্বংসের,
ধসে-পড়া সিঁড়ি-দালানের—স্রোতহীন, নৌকাহীন নগরলেখায়
দু-একটি বানর দেখেছি, হয়ত-বা গবাদিপশুর গমনপথ—শুনি গান,
শুনি সানাইবাদন, বিসমিল্লা খান নামে এক দেবদূত যন্ত্র হাতে
তুলে নিয়েছেন, আমাদের বলছেন—আমি আমেরিকাতেও চলে
যেতে পারি, কিন্তু এই বৃদ্ধা গঙ্গা কি সঙ্গে যাবেন, নিয়ে যেতে
পারব কি ঐ গাছ যার নীচে সূর্যাস্তে ও উষাকালে রোজ বসে থাকি,
আর ঐ কয়েকজন অতিথি-ভিখারি, তাদের নিত্য আহার যোগাবে কে,
কোন প্রেসিডেন্ট, কোন রাষ্ট্রনেতা—

ভাবি এ-সব প্রশ্নের জবাব চিত্রকর গণেশ হালুই জানতেও পারেন।

ছায়াপথ

১

যে-পাখি ডাকল আজ ভোরবেলা, অনিশ্চিত ভাবে,
সে-ও জানে আমার যাত্রা শুধু নিরক্ষরতার দিকে—
পড়ে রইল ভাঙা চশমা, ছেঁড়া খাতা, দু-টুকরো পেনসিল,
আর ফাটা শ্লেট, খড়িগুঁড়ো, উলটানো দোয়াতের কালি,
যেন রাক্ষস নেমেছে পথে
যেন দৈত্যের কালো চুল ঢেকে ফেলছে চতুর্দিক—
সবিতা কোথায়?

২

প্রতিটি স্বপ্ন আজ উদ্বেগের, ভয়াবহতার।
গভীর ঘুমের মধ্যে কেটে গেল রাত। বৃষ্টি হয়েছিল।
তবু সে-ঘুম ভাঙেনি।
পথে পথে কুকুর ডেকেছে আর সৈন্যরা ঢুকেছে স্বপ্নে
ত্রাস ও হিংসা হয়ে—
খুঁড়ে ফেলেছে ক্ষেত, জমি, মরুপথ, গ্রামের কবর,
খুঁজে ফিরছে সুপ্ত হাড়, মৃত মাংস, মুক্তির বাসনা
আজকের, বহু পলাতক প্রাণের

৩

ওদের চিনেছি।
ঐ স্মৃতি, ঐ মনে-পড়া, ঐ বিস্মরণ-স্মরণের মুখাবয়ব,
এত লজ্জার কথা, এত হতাশার অশ্রু, এত ধূর্ত প্রতারণা,
ব্যক্তি ও প্রতিপুরুষের প্রাণ, তার হাহাকার, তার অমর ইশারা,
স্বপ্নের প্রান্ত জুড়ে শ্বাপদের নখে উপড়ানো
রক্ষীর পায়ের শব্দে, নিদ্রাহীন তালা ও চাবির আর্তনাদে—

৪

কোথাও নেমেছে বৃষ্টি
কাল রাতে, এই দেশে নয়, আমরা তো লোভের শিকার,
মাটি-পৃথিবীর নর, ভূকম্পিত প্রকৃতির নারী, তবু পরাধীন নই, নই
ঋণগ্রস্ত, দায়দাস, বাতাস বইছে দূর লোকালয়ে জলকণাবাহী,
আজ প্রাচীরে দ্বারস্থ আমরা, আমাদের প্রবেশের অনুমতি নেই,
ঐ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষজনের মধ্যে আমিও আছি
ওখানেই অস্তিত্ব আমার—

৫

একদিন ছিল বিচরণ
কোমল আলোর দেশে, গোধূলিবেলায়,
চাঁদ ছিল সারারাত, ভ্রূণরূপী সূর্য ছিল ঊষাকালে,
শস্যের সুবাতাস ছিল, ছিল সব্‌জির স্বাধীনতা, ছিল জলে-ভরা হ্রদ,
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ, মরু-উদ্যানের কলোচ্ছ্বাস, দিন মানে কাজ,
রাত্রি মানে বিশ্রাম, যূথগান, বাহুবদ্ধ নাচের শৃঙ্খলা,
বাজারে, পাহাড়প্রান্তে, বাড়ির অঙ্গনে—

৬

হায়, দিন কাটে জ্বরের তাড়সে,
বন্দীশালার দ্বারে, দুরারোগ্য অসুখে মানুষ যেন-বা প্রতিটি
অষুধে আস্থা পায়, সব অনুপান সহজে গ্রহণ করে, ভাবে
এ-ভাবেই ব্যাধিমুক্তি, রক্ষীদল প্রযুক্তির হাভাতে সন্তান, আমিও কি বিপরীত
মূর্খের মিছিলে স্বেচ্ছায় নামিনি, উপলব্ধিহীন চিৎকারে
নাগরিক ঘরে ঘরে ভয়ের সংক্রমণ
নির্দ্বিধায় বিস্তার করিনি—

৭

ক্রমে মূক চৈতন্যের
মুখোমুখি আর এক চৈতন্যোদয় হতে থাকে,
তাই আশা, তাই ঐ ভূয়োদর্শী পাখিটির স্বর, সে-ও জানে

প্রতিটি পুস্তকে আজ বিষের ছত্রাক, প্রতিটি গ্রন্থাগার
শ্বাপদসঙ্কুল, তত্ত্বের গভীরে ত্রাস, জ্ঞানের পিছনে মিথ্যা,
বিদ্যার আড়ালে বিকার, সবিতা কোথায়, সবাই খুঁজছে তাকে অন্ধকারে,
বুঝি ভোর হয়ে এল, বুঝি আলো দেখা যায়,
তাই আশা—

৮

চাই চিকিৎসা যা নিরঞ্জন,
রোগ যেন কেটে যায়, মেঘ আসে, ছায়া নিয়ে আসে, আলো আসে
রামধনু নিয়ে, বর্ণালীর সাত রং ইরাক ও আফগানিস্তান প্লুত করে,
শুনি সহাস্য শিশুর কণ্ঠ, মায়ের অমৃত গান, রাক্ষসের বিরুদ্ধে পুরুষ
দানবের সম্মুখে কিশোর, যুদ্ধবাজ সৈন্যের সামনে বালিকা,

এই ভালো হয়ে-ওঠা, এই আরোগ্যদর্পণে
কবিতার আশ্চর্য উদ্ভাস।

খালপাড়ে

সাহাপুরে চেষ্টা করে দেখো
নাহয় তো মল্লিক বাজারে।
পুরনো গাড়ির পার্টস এখানেও পাবে
দক্ষিণের উঁচু খালপাড়ে

প্রত্যেকের খবর প্রত্যেকে রাখে—
এই দেশে মেয়েদের এক নাম : হাসি
বুড়িদেরও সকলের এক নাম
সকলেই : সিন্ধুবালা দাসী।

ঐ আছে বিপিনের বিদ্যুৎবিপণি
সুরলহরীর মতো দখলী দোকান,
শোনা যায় দিকে দিকে নিশি-জাগরূক
পুলিশ ও নেতাদের আঞ্চলিক গান।

পাবে পুকুর ভরাট-করা আবাসন
উচ্ছেদের ধাতব গণিত—
গাড়ির চোরাই মাল, ডিজেল, মোবিল,
রাত্রির কবিতার হিত ও অহিত।

দ্বন্দ্ব অহর্নিশ

উষ্মা প্রকাশ পায়। রেগে কাঁই—সাহিত্যে পড়েছি।
ফুটন্ত তেলের মধ্যে শীতল বেগুন—যাকে বলে কিনা
তেলে ও বেগুনে। অগ্নিশর্মা—অফিসের গদাবাবু
লেট করে পৌঁছলে যা হয়ে থাকেন। এদিকেও হুলুস্থুল।
চোখ লাল। কপালে ভ্রূকুটি। গলা চড়ালেই
হেসে ফেলি—এই তুমি আবার খেপেছ। তাতেই
বরফ গলে। আঁচলে জলের ঝাপটা। পাহাড়ে
বসন্তবায়ু। কুয়াশায়, মাথার উপর দিয়ে, উড়ে-যাওয়া
বিমানের মিলিয়ে যাওয়ার শব্দ।

উনি

এই বাংলায় শরীর নিয়েই এসে পড়লাম একদিন—শুকনো চামড়া
নিয়ে, বায়ুবৎ, পিত্ত-কফ সঙ্গে নিয়ে, দু-একটি ব্রণ-ফুস্কুরি-আব ফুটে
উঠল, দেহ ছেয়ে গেল রাঙা তিল-আঁচিলের সমারোহে, গায়ে খড়ি উড়ল,
চুলে খুস্কি নাম্নী এক পরাবাস্তবতা দেখা দিল, ভিক্ষাপাত্র পড়ে রইল
অগ্নিহীন, যেহেতু চাইনি কিছু পেলাম না পণ্যের স্বীকৃতি, শুধু মন ভরে গেল
বসে থেকে পথের নির্জনে, শরীর কোথায়, অধিকন্তু আর কী লিখিব,
উনি জানালেন, এই বাংলায়, পত্রবাহকের হাতে লাল-নীল চিঠি ছিল,
তবে সে-সব অন্যের নামে, অন্য ক্রোধ, অন্য হিংসা ও আহ্লাদের
কথোপকথন, গঙ্গায় কত জল বয়ে গেল, কত পশু-পাখি কসাইখানার
দিকে নিয়ে-যাওয়া হল, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এই অনুরোধ স্বীকার করেই
তাঁর আঙিনায় শুয়ে-থাকা, জলসত্রে তৃষ্ণানিবারণ।

ডাকপাখি

ঐ গাছে ছিল তাঁর বাস,
ঐ হ্রদে ছিল তাঁর স্নান,
লোকে বলে ঐ পাখি ছিল
মহতের চেয়ে মহীয়ান—

নমস্কার যখনই বলেছি
উনি সহাস্য হতেন—
ধান কেনাবেচা নিয়ে তাঁকে
রুষ্ট হতে দেখে থাকবেন

আপনারা যাঁরা নিয়মিত
হাঁটা পথে গ্রামান্তরে যান—
দৈনন্দিন, কর্মব্যপদেশে,
ডাকঘরে পত্রের সন্ধান

কেউ কেউ নিশ্চয় করেন—
ঐ পাখি ডাকপাখি, শুনি
ঐ গাছ বনবিভাগের,
মর্মবে অতীতের খুনি

ও বন্দীর সমবেত হাসি বেজে ওঠে,
যা আসলে হাহাকাব, উল্লাস, প্রার্থনা—
পাখি জানে, পাখি জেনেছিল,
ঐ তার শবদেহ, ঐ তার শতছিন্ন ডানা।

দুঃখী মানুষ

দুঃখী মানুষই বোঝে দুঃখিত মানুষের কথা, তারা
আপন ভাষায় বাক্যালাপ করে, হাসে, কাঁদে, পরস্পরে
সাহস যোগায়, মেঘলা আজ সকালবেলায় তেমনই এক
ব্যক্তির দেখা পাই, অফিস যাওয়ার পথে, সে আমাকে
কিছু যেন বলবার চেষ্টা করে, আমি না-বুঝেই সব কিছু
বুঝলাম এ-রকম ভান করি, দু-একটা উপদেশও না দিয়ে
পারি না, সে-ও শোনে, ম্লান হয়ে থাকে, জানি আমার
ভাষাই তাকে জব্দ করে, প্রতারণা করে।

এই বাংলায়

বিদ্বজ্জনের কাছে চুপচাপ বসে থাকি, তারা তর্কাতর্কি করে,
হাওড়ায় পৌঁছেই তারা ট্যাক্সি পাবে কিনা তা-নিয়ে বিবাদ,
পুলিশকে গালমন্দ, ট্রেন দেরিতে চলছে, রাতও অনেক হল,
বহু ঘুমন্ত স্টেশন পার হয়ে চলে যাচ্ছি, বহু গ্রাম, জনপদ,
পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে, এই বাংলায়, একদিন তাদেরও
সুখ্যাতি ছিল, ন্যায়-বিতর্কের জন্য প্রাণপাত ছিল, মধ্যযুগে, চৈতন্য
জন্মের আগে, সামান্য প্রসঙ্গ নিয়ে বাক্যের জটাজাল বিস্তারিত হত,
দেবদত্ত অনশনে আছে তবু তার স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটছে কী ভাবে,
এতে কি বলতে পারি সে-যুবক লুকিয়ে আহার করে, এই কি প্রমাণ,
নাকি অনুমান, তার সিদ্ধান্ত কী ভাবে হবে, আগে ঠিক হোক
শেষ কথা কার বুদ্ধি-পেটিকায় আছে,

ট্রেন বেলুড়ে ঢুকল।

আলোছায়া দোলে

সব শেষে পড়ে থাকে আলো, ভূলুণ্ঠিত, অথচ উন্মাদ,
এলোমেলো কত কিছু সে যেন বলতে চায় এ-সুযোগে, যখন
মঞ্চে নেই নট-নটী, বিদ্যা ও বিদূষক, সুরকার-গীতিকার
এমনকি কলাকুশলীরা অব্দি চায়ের সন্ধানে গেছে হল-য়ের বাইরে,
আমাকে চেয়ার দাও, এই তার দাবী ও হুঙ্কার, আমাকে বসতে
দাও, তারপর যা বলার নিশ্চয় বলব, আলো সরে আসে মাঝখানে,
ফাঁকা আসনের খোঁজে, কোথায় বসবে, শুধু শতরঞ্চি পাতা আছে,
এতক্ষণ নজরে পড়েনি ঐ কোণে পরিচালকের চেয়ারের মতো
কিছু, ভাঙা ছায়া, যেন পড়ে ছিল, সে-পাগলও ধীরে ধীরে
সামনে দাঁড়ায়, আয় দেখি, কেমন বাপের ব্যাটা, বোস দেখি,
আলো লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর ধুন্ধুমার, আলো ও ছায়ায়,
খুনোখুনি হয়ে যাবে মনে হল, একজন বসার আসন চান, আলো
তিনি, আরেকজন সরে যান চোখের পলকে, ছায়া তিনি, মঞ্চ জুড়ে
ছুটোছুটি দু-জনের, লাফালাফি, আলো আক্রমণাত্মক, ছায়াও কি
স্থির থাকে, এগিয়ে আসছে, আবার ঝাপটাঝাপটি, আমি একা
হাততালি দিতে থাকি।

নরক

মৃত রমণীর সঙ্গে হাঁটি,
প্রকাশ্যে, দ্রুত পদচারণায়,
ফলের বাগানে, পশ্ব কাননে,
যে-ভাবে হাঁটলে আমাকে মানায়।

যমালয়বাসী, দগ্ধ মানবী,
আধপোড়া শব, হেঁটে-চলা দেহ,
এই কি নরক? মরণোত্তর
ভুলে-যাওয়া প্রেম? মারী সন্দেহ?

ব্যথাবেদনার অস্ত অচলে
কাকে পাবো আজ? কে দেবে পাহারা?
গ্রন্থগুলিই পিছু ধেয়ে আসে,
যা বলাতে চাই তাই বলে তারা।

এসো বায়ুভুক, এসো হে মণীষা,
গৃহশিক্ষিকা, ভাষা-বল্কলে
যারা পরিয়েছো অক্ষরজ্ঞান।
মৃত্যুঞ্জয়, শ্লেট-ধোয়া জলে

ভেবেছি কবেই মুছে গেছে সব,
হায় হতবাক, হারায়নি কেউ,
অর্থহীনতা থেকে নিশিদিন
মানে খুঁজে ফেরে দু-কূলের ঢেউ।

বিকট স্বপ্ন

সমস্ত জড়িয়ে যায়, যেন লাল-কালো সুতোর কুণ্ডলি, চাকরির
দরখাস্ত, বাবার অসুখ আর মায়ের মানত, ছোটো বোন
শন্না দিয়ে খোলে গিঁট, চেষ্টা করে, সে তো প্রায় অসম্ভব,
সমগ্রে জড়িয়ে থাকে, ট্রামের টিকিট আর লটারীর কুপন,
বাস্তব-কাল্পনিক, বিমানবন্দর আর রেলপথ, তৃণমূল-কংগ্রেস,
জড়িত বলের মতো সবকিছু, তালেগোলে অক্লেশে গড়িয়ে চলে
ঢালু দিয়ে, বাজারে ও সংসারে, জামাকাপড়ের স্তূপে, পুরনো
কাগজপত্রে—
শুধু রাত্রির অন্ধকারে, নিজে নিজে, খুলে যায় গ্রহনক্ষত্রের গ্রন্থি,
বাতাস ও সৌর লতা, ধাঙড়পাড়ার গান, মাতালের অট্টহাসি।

শৈলমালা

সারাদিন মেঘের আশ্লেষে
বসে থাকি। শৈলমালা যেন।
বর্ষা-আশ্রিত প্রাণ বাদলের গান গায়।
শীত ও বসন্তে সুরের বিস্তার ছিল—প্রেম-আরোপিত
কথ্য ভাষায় কিছু অতীতের বাংলা গান মনে পড়ে।
সে-সব কৈশোরে শোনা, বাহুল্যবোধে যৌবন তাদের ছেড়ে
এগিয়ে এসেছে, ফেলে এসেছে পুরনো বাড়ির ভাঙা আসবাব হেন।
দেনা ছিল, সব দায় মিটিয়ে দিয়েছি গান গেয়ে, গানের
কাহিনী বলে, ট্রেনে ও স্টেশনে কত অসুখের সঙ্গীত গেয়েছিলাম,
সেরে-ওঠার ভক্তিমূলকে কত নাস্তিক-আস্তিক পার পেয়ে গেল।
আজ, শুধু মেঘের চাদরে, ঢাকা থাকল ইতিহাস
যেভাবে আবৃত থাকে পাহাড় ও গিরিপথ, ঝর্না ও বনাঞ্চল।

অতিজাগতিক

আমার প্রতিটি কাজ আমাকেই কোনো এক জাগতিক অবস্থানে
চিহ্নিত করেছে, তার দেশকাল আছে, গতিরেখা বরাবর মানুষ-
জনের ছুটোছুটি আছে, সোরা-বারুদের ঘ্রাণে বাতাস মথিত হল,
হয়ত-বা আমি মৌলবাদী, মানচিত্রে আমাকে মানায়, সন্ত্রাসবাদ—
এই কালো জামাখানি আদরে পরেছি, বিবাহ ও নানাবিধ লৌকিক
উৎসবে আমি ও-ভাবেই সেজে যাই, ভাল লাগে, অথবা লাগতো
এতদিন, আজ দূর থেকে নিশানা লক্ষ্য করি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যেন,
সে-ভাবেই গুলি ছুঁড়ি, অকাতরে, নির্দ্বিধায়, ধর্মময় এই রক্তপাত,
সত্যান্বেষী এই ছিন্ন দেহ, এর কোনো বিকল্প আছে কি, নিশ্চয়ই
নয়, নিশ্চয়ই নয়।

রাত্রির আকাশ

অন্ধকার না-হতেই সমস্ত আকাশ জুড়ে একদল অন্ধ
মানুষের যাতায়াত শুরু হল। তাদের লাঠির চাপে ফুটে
উঠল শত-সহস্র নক্ষত্র ও গ্রহরাজি। তারা, উদভ্রান্তের
মতো, অথচ সাবধানে ঘোরাঘুরি করে। কী চাইছে কে
জানে? বোধহয় রাত্রির আহার, চরিতার্থ কাম আর নবম
বিছানা। সে-সব কোথায় পাবে? ছ-নম্বর দেওদার বাগানে
ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। তবে এত রাতে কিছু কি আর
খোলা আছে? শিয়ালদায় চেষ্টা করে দেখতে পারে।
দু-একটা ফোন করুক। এই সব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে, দেখি
তাদের লাঠির চিহ্নগুলি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। বুঝি ভোর হল।
তারা কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেয়ে গেছে, মনে হয়।

দিনান্ত

নৃত্যপরবশ, আমি জানি বহু দূরে কোনো স্থাপত্যে বা
চষা মাঠে তুমি নৃত্যরতা। পায়ের আঘাতে শিলা ভেঙে
পড়ছে, ধুলো উড়ছে, লাঙলের ফালে মাটি গুঁড়ো হচ্ছে,
আমি জানি এ-সবই বিভেদ-কথা, শিল্পের কাছাকাছি, শস্যের
আয়তক্ষেত্রে খাদ্য ও পরমা-প্রকৃতি পরস্পর মুখোমুখি, উড্ডীন
পতাকা সব কেড়ে নেবে মনে হয়, আর্তির অভিবাদন কেউ তো
বুঝেছে, পথে যেতে যেতে, খোলা জানালায়, মধ্য রাতে বাঁশির
জাড্য ভেঙে জেগে-ওঠা গীতধ্বনি সবাই শুনেছে—তবু কেন নয়
নীরবতা মধ্যাহ্নের, কেন নয় নৃত্যের বিরাম দুপুরের ধু ধু রৌদ্রে,
দাও চাষের স্থগিতাদেশ বিকেলের লঘু সূর্যে—ছুটি করো,
সকলকে বেলাবেলি ছুটি দিয়ে দাও।

প রি শি ষ্ট

১
"...কবিতা আমরা জানি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা, পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতি-কেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরি হয়েছে। অপরদিকে, প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়। কবিতায় আমরা প্রায়শ শ্বসিত বস্তু বা 'অরগ্যানিক' অস্তিত্বের চিহ্ন দেখে থাকি। এই দুই কেন্দ্র অর্থাৎ বস্তু ও প্রাণ, ব্যাকরণ ও বিদ্রোহ, শৈলী ও প্রথামুক্তিকে জুড়ে রয়েছে এক সেতু যার নাম নশ্বরতা। কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত, উপদেশ ও কলাকৈবল্য...।"

২
"...জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হওয়ার দাবি এবং প্রয়োজন থাকে। 'পর্নোগ্রাফি অফ সাকসেস'-এর সঙ্গেও আমাদের প্রত্যহ দেখাশোনা হয় সমাজে, সংসারে, রাজনীতিতে, পারিবারিক মণ্ডলে। কিন্তু কবিতা এ-সবকে তুচ্ছ করে ব'লে এর আদিঅন্তহীন রহস্যের সামনে আমাদের চুপ ক'রে থাকতে হয়। হয়ত নীরবতাই এর সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক-স্থাপনের অভিজ্ঞান, কবির সঙ্গে পাঠকের, এক মানব-সত্তার সঙ্গে আরেক মানব-মনের পরিচিতির শীলমোহর।

হয়ত কবিতা নিজেকে ঘিরে যে অস্তিত্ব-জটিল বাস্তবতা তৈরি করে তাকে আমরা প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন, ছায়াপাত ব'লে স্বীকার করে নিলে খানিকটা স্বস্তি পাবো। কেননা আমাদের জানতে বাকি নেই যে সামান্য বাতাসে, জলবাসী প্রাণীদের সামান্য নড়া-চড়ায়, ঐ সুখী, স্থির কুকুরের ছবিটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কবিতার বাস্তবতা যেন ভেঙে-পড়ার জন্যেই সৃষ্ট হয়। আবার প্রতিফলনেই সে নিজেকে পুনর্গঠিত করে আরেক বাস্তবতা সৃষ্ট হয়। তখন হয়ত সূর্য আরেকটু হেলে পড়েছে, বাতাস বাঁক নিয়েছে এবং জলজ প্রাণ আরও গভীর স্তরে অন্তর্হিত হয়েছে। অথবা, রূঢ়ভাবে বলা যায়—জল শুকিয়ে গেছে, শুকনো পাতা উড়ছে, শকটের চাকা ফেটে দু-খান হয়ে প'ড়ে আছে। আর স্মৃতিবিভ্রম তৈরি করছে কবিতা। ঐ দৃশ্যের উপর দিয়ে, গ্রীষ্মের দগ্ধ অরণ্যে লুকিয়ে-পড়া এবং ধরা-পড়ে যাওয়া মানবমানবীর আর্ত চিৎকারের মতো, পাগল হাসির মতো, যে শব্দ-উপমা-অলংকারের ধ্বনি বাতাসে ভেসে চলেছে—তাই কবিতা।

এর কার্যকরণ, রীতিনীতি আমি জানি না..."

৩

"...কিন্তু আমি সেই আয়না দেখেছি যার ভিতর থেকে পাকা গমের বর্ণের মতো স্বর্ণাভ-হলুদ ছটা ঠিকরে বেরোচ্ছে। সেই দেশে ঘুরে এসেছি সেখানে জমির রঙ প্রাচীন খড়ের মতো পাটল-ধূসর। প্রান্তরে বহু নাসপাতি গাছ দেখেছি যাদের শাখায় শাখায় সুঠাম, উত্তপ্ত ফল দুলছে। অদূরে নীল আঙুরের বন। আরো দূরে, কামানবাহী নৌবহরের ধার ঘেঁসে, জেটির দেয়ালের পাশে, কাফেটেরিয়ার চেয়ার-টেবিল সদ্য পাতা হয়েছে। সৌখিন, মানুষপ্রমাণ মশাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। রাতের উৎসবে জ্বলবে। সেঁকা মাংসের গন্ধ। গোলমরিচের ঘ্রাণ। জাহাজের ভোঁ বাজল। বেলা পড়ে এল।

তাহলে আমি কি সৃষ্ট পৃথিবীরই গান গাইছি?..."

৪

"...চল্লিশ বছর আগে, এমনই মাঘ-ফাল্গুনে, ছাপা হয়েছিল আমার প্রথম বই। এই আবিষ্কার যেন, আজ সকালে, ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তারপর কী কী করলে—নিজেকেই প্রশ্ন করি। ম্লান হেসে বলতে হয়—তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি।

আসলে, ভুলে গেছি! কেন স্মৃতি পুনরুদ্ধারে আমি দক্ষ নই? এ-নিয়ে অল্প-বিস্তর ভেবেছি। আমার মন হয়ত নিখুঁতভাবে, ক্রম-অনুসারে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে সাজিয়ে রাখে না। বরঞ্চ জড়িয়ে-মড়িয়ে, এক বিশাল অবিন্যস্ত ভাঁড়ার-ঘরের মতই, এলোমেলো তাকে-আলমারিতে, বাসনে-বোয়েমে, হাঁড়ি-কলসিতে সংগ্রহ করে রাখে জীবনের যা কিছু স্মৃতি-সম্পদ। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঘোরে ক্ষুধার্ত ইঁদুর, কালজয়ী আরশোলা আর কোনে দাঁড় করিয়ে-রাখা ভাঙা কুলোটাকে অগ্রাহ্যই বা কীভাবে করি? ছাই ফেলতে ওটা যদি লাগে!

দেয়ালে টাঙানো মলিন ম্যাপের কথা স্মরণে আসে। ঝুলছে ছবির ক্যালেণ্ডার। পাতা ছেঁড়া। বহু পুরনো বছরের। এবং আছে স্থিরচিত্র। উনোনের ধোঁয়া কালো দেওয়ালে কাচ-বাঁধাই কাঠের ফ্রেম। গোল চাকার মতো বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত, তারপর একে একে ছোট হয়ে-আসা, ঘন এবং ধূসর হতে-থাকা, বালি কাগজের সঙ্গে একাত্ম আলেখ্য—কাশী বিশ্বনাথ, জগন্নাথদেব, শ্রীদ্বারকা, মক্কার কালো পাথর, শশিভূষণ তাজমহল, দূরে আকাশের কোনা ঘেঁসে উর্দু বাক্য, সংস্কৃত সুভাষিত, অক্ষরের শস্য, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, হিমালয়ের সুপ্রভাত, বিন্ধ্যের সূর্যাস্ত, মরুভূমির নিদ্রাহীনতা।

ঐ সবই কি আমার প্রথম বই নয়? লিপিকার হয়ে-ওঠার প্রথম সংস্করণ কি ঐসব অনুশীলনী নয়?...'